গন্ধরাজ

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

'বনফুল'

আনন্দধারা প্রকাশন

উৎসর্গ

শ্রীমতী সুধারাণী দাস
বন্ধুজায়াসু

সুধা বৌদি,

সজনী এখন নেই। কিন্তু আপনার সঙ্গে আমাদের প্রাণের সম্পর্ক এখনও তেমনি অটুট, তেমনি মধুর আছে। এই কথাটি স্মরণ করে' আপনার নামের সঙ্গে এই বইটিকে যুক্ত করলাম।

বলাই ঠাকুরপো

৬।৭।৬৬
কলিকাতা

এক

ভারতবর্ষের মানচিত্র থেকে পৌরাণিক রাজ্য গর্জনগ্রামের নাম লুপ্ত হ'য়ে গেছে। গর্জনগ্রাম ছোট স্বাধীন রাজ্য ছিল। আয়তনে ছোট হলেও প্রতাপে সে নাকি ছোট ছিল না। গর্জনগ্রামের গর্জনে পার্শ্ববর্তী রাজ্যরা ভয়ে কাঁপত। হিমালয়ের পাদদেশে তখন যে সব রাজারা রাজত্ব করতেন তাঁরা গর্জনগ্রামের সঙ্গে শত্রুতা করা নিরাপদ বিবেচনা করতেন না। সে যুগের ইতিহাসে গর্জনগ্রাম তার মহিমময় স্বাক্ষর রেখে গেছে। কিন্তু সে যুগও আর নেই, সে স্বাক্ষরও নিশ্চিহ্ন। ইতিহাসের কোন্ পর্বে এসব ঘটেছিল তা-ও জানা নেই। বহুকাল আগে ও রাজ্যের উত্থান এবং পতন হ'য়ে শেষ হ'য়ে গেছে সব। কিম্বদন্তী এইটুকু মাত্র শুধু বলে যে গর্জনগ্রামের রাজারা নাকি লিচ্ছবি বংশের লোক ছিলেন, যে লিচ্ছবি বংশ ইতিহাসে আলো-ছায়া-ময় অনেক কাহিনী রচনা করেছে।

মনোরম রাজ্য ছিল অরণ্যপরিবৃত পার্বত্য গর্জনগ্রাম। অনেক নদী অনেক নির্ঝরের উৎস, অনেক বৃক্ষলতাগুল্মশোভিত, নানাবিধ পার্বত্য পুষ্পে সজ্জিত, অনেক আশ্চর্য উপত্যকা-পর্বতশিখরে-সমৃদ্ধ এই জনপদ তদানীন্তন সভ্যতারও প্রতীক ছিল। অসভ্য ছিল না গর্জনগ্রামের অধিবাসীরা। সেকালেও নদী-নির্ঝরের সহায়তায় মিল চালাতো তারা। করাত দিয়ে পাহাড়ী গাছ চিরে তক্তা বানিয়ে ব্যবসা করত। নগরের নাম ছিল পার্বতী, আর তাকে কেন্দ্র করে' বাদামী রঙের কাঠের-তৈরী বাড়ি থাকে থাকে গড়ে' উঠেছিল পর্বতের স্তরে স্তরে ছোট ছোট পাহাড়ী গ্রামগুলিতে। ঠিক যেন ছবির মতো দেখাতো। গভীর উপত্যকার নিম্নভূমি থেকে এই সব কাঠের-তৈরী বাড়ির ছাদের সহায়তায় এবং বেগবতী বড় বড় পাহাড়ী নদীর উপর আচ্ছাদিত সেতুর উপর দিয়ে গ্রামবাসীরা নীচের

গ্রাম থেকে উপরের গ্রামে যাতায়াত করত। মিলের গুরু-গুরু শব্দ, নদীর কলকলধ্বনি, দেওদারগছের তীব্র মধুর গন্ধ, আরণ্যবৃক্ষের শাখা-প্রশাখায় স্বচ্ছন্দপ্রবাহিত বাতাসের স্বনন, শিকারীদের আগ্নেয়াস্ত্রের কচিৎ বিস্ফোরণ, কাঠুরেদের কাঠ-কাটার আওয়াজ, দুরারোহ দুর্গম পথ, পথের পাশে পরিচ্ছন্ন শরাইখানায় টাটকা মাছ-ভাজার গন্ধ, নানারকম পাখীর গান আর গ্রামবাসীদের আনন্দ-গুঞ্জন—এই সবই ছিল গর্জনগ্রামের বৈশিষ্ট্য। যাঁরা গর্জনগ্রামে বেড়াতে যেতেন এই সবেরই স্মৃতি আঁকা থাকত তাঁদের মানসপটে।

গর্জনগ্রামের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত ঢেউ-খেলানো পর্বতমালার রেখা ধরে' নেমে এসেছিল এক বিরাট সমতল প্রান্তরে। এই প্রান্তরের সীমায় অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্য ছিল। অধুনা-লুপ্ত ভৈরঙ্গী ছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। গর্জনগ্রামের দক্ষিণ সীমায় ছিল রোহিণীপ্রস্থ। ক্ষমতাশালী বলে' খ্যাতি ছিল এ রাজ্যটির। আরও নানা অদ্ভুত ব্যাপারে খ্যাতি ছিল এর। এ রাজ্যের লোকেরা নাকি অতি সরল, অতি কোমল-হৃদয়, অত্যন্ত ভাবপ্রবণ। এ রাজ্যের ফুল নাকি বিস্ময়কর। আরও বিস্ময়কর নাকি এ রাজ্যের পাহাড়ী ভালুক। বহু শতাব্দী ধরে' গর্জনগ্রাম আর রোহিণীপ্রস্থের রাজবংশ বিবাহ-বন্ধনে পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ ছিলেন। গর্জনগ্রামের শেষ রাজপুত্র, যাঁর কাহিনী আমরা এই আখ্যায়িকায় বলব, তিনি ছিলেন রোহিণীপ্রস্থের রাজা কোকনন্দকুমারের একমাত্র কন্যা স্বর্ণাঙ্গিনীর পুত্র। কোমল-হৃদয় ভাব-প্রবণ রোহিণী-রাজবংশের সঙ্গে গর্জনগ্রামের রাজবংশের এই বৈবাহিক যোগাযোগ গর্জনগ্রামের প্রজারা খুব সুচক্ষে দেখত না। তারা মনে করত গর্জনগ্রামের প্রাচীন রাজাদের রুক্ষ পরুষ চরিত্র ওই রোহিণীবংশের সংস্পর্শে এসে যেন একটু মোলায়েম মেয়েলী গোছের হ'য়ে গেছে। গর্জনগ্রামের কয়লাওলারা, পাহাড়ী বলিষ্ঠ করাত চালিয়ে ছুতোররা, দেওদার-অরণ্য-নিবাসী বৃহৎ কুঠার-চালক কাঠুরেরা তাদের প্রবল পৌরুষকেই শ্রদ্ধা করত।

তাদের রুক্ষ হাত, বলিষ্ঠ বাহু, তাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন অজ্ঞতা, তাদের বীরত্বময় প্রাচীন ঐতিহ্য-উপকথা—এই সবই গর্বের বস্তু ছিল তাদের। রাজবংশের কোমল নমনীয়তা মোটেই পছন্দ করত না তারা।

ঠিক কোন বছরে কোন তারিখে এ গল্পের আরম্ভ তা পাঠক-পাঠিকারাই আন্দাজ করে' নিন। কিন্তু কোন সময়ে, অর্থাৎ কোন ঋতুতে এ নাটকের যবনিকা উঠেছিল সেটা না বললে অশোভন হবে। ঋতুরাজ বসন্ত তখন মহাসমারোহে এসে গেছেন। গর্জনগ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বেজে উঠেছে শিকারীদের তূরী-ভেরী। সকলে জেনে গেছে রাজপুত্র মৃগয়ায় বেরিয়েছেন। শরৎকাল না আসা পর্যন্ত এ মৃগয়া চলবে।

এই স্থানে গর্জনগ্রামের সীমান্তরেখাটা অমসৃণ। সোজা খাড়া নেমে গেছে অনেক নীচে, মাঝে মাঝে এবড়ো-খাবড়ো পাথরের চাঙড় দুর্গম করে' রেখেছে জায়গাটাকে। এই উদ্ধত নিষেধের মতো বন্ধুর জটিল পর্বতের ঠিক নীচেই শ্যামল সমতল শস্যক্ষেত্র। সে সময় এখানে দুটি মাত্র পথ ছিল। যেটি রাজপথ সেটি ভৈরঙ্গী রাজ্যের রুদ্রার দিকে তির্যকভাবে নেমে এসেছিল অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য ঢালু পর্বতগাত্র বেয়ে। আর দ্বিতীয় পথটি পাহাড়ের ললাটে একটি সরু ফিতার মতো দেখা দিয়েই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল দুর্গম গিরিসঙ্কটের নিবিড় গহনে। ছোট ছোট পাহাড়ী ঝরণার জলকণায় আপ্লুত হ'য়ে তা এগিয়ে গিয়েছিল গহনতর অরণ্যে। আরও কিছুদূর গিয়ে তা এসে সেই দুর্গের পাশে হাজির হয়েছিল যা ও অঞ্চলে একটি উল্লেখযোগ্য দৃশ্য। দুর্গের নাম শূলপাণি। বিরাট পর্বতের শিখরে নির্মিত আকাশচুম্বী শূলপাণি থেকে গর্জনগ্রামের পার্বত্য সীমান্ত এবং ভৈরঙ্গীর জন-সমাকীর্ণ সমতলভূমি স্পষ্ট দেখা যেত। নানাভাবে ব্যবহৃত হ'ত এই দুর্গ। কখনও কারাগার, কখনও মৃগয়া-বিহার, কখনও বা আরও কিছু। অদ্ভুত মনে হ'ত দুর্গটাকে।

একক বলিষ্ঠ প্রহরী যেন আকাশে মাথা উঁচু করে' দাঁড়িয়ে আছে যুগযুগান্ত ধরে'। রুদ্রার অধিবাসীরা পাহাড়ের গায়ে লেবু চাষ করত। তাদের কেউ কেউ কপালের উপর হাত রেখে লেবুগাছের ফাঁকে দাঁড়িয়ে দেখত—শূলপাণির গায়ে কটা জানলা রয়েছে। মনে হ'ত যেন আকাশের গায়েই রয়েছে জানলাগুলো।

এই দুই পথের মাঝে ঘন অরণ্য। এই অরণ্যেই তুরী-ভেরীর নিনাদ উঠছিল থেকে থেকে। অবশেষে সূর্য যখন অস্তাচলচূড়াবলম্বী তখন তুমুল একটা হর্ষ-ধ্বনি উঠল। বোঝা গেল ঈপ্সিত শিকার মারা পড়েছে। প্রথম এবং দ্বিতীয় শিকারী একটু বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়েছিলেন দল থেকে। একটা গিরিশৃঙ্গে দাঁড়িয়ে তাঁরা চেয়ে দেখছিলেন নীচের দিকে। একটা ঢালু পাহাড়ের অংশ আর শস্য-শ্যামল সমতলভূমি দেখতে পাচ্ছিলেন তাঁরা। সূর্যের কিরণ চোখে পড়ছিল বলে' হাত দিয়ে চোখ ঢেকে রেখেছিলেন তাঁরা। সূর্যাস্ত হচ্ছিল, কিন্তু তেমনি মহিমময় সূর্যাস্ত নয়। হাজার হাজার পাহাড়ী গাছের জটিল নকশা চিত্রিত হয়েছিল আকাশ-পটে, অনেক বাড়ি থেকে ধোঁয়া উঠছিল, শস্যক্ষেত্র থেকেও কুয়াশার মতো কি উঠছিল যেন, জলচালিত কলের দুটো পাখনা দেখা যাচ্ছিল দূরে, মনে হচ্ছিল গাধার কান যেন। আর কাছেই প্রকাণ্ড একটা দীর্ঘ ক্ষতের মতো দেখা যাচ্ছিল রুদ্রার দিকে বিসর্পিত রাজপথটা, মনে হচ্ছিল সেটা যেন সূর্যের দিকেই এগিয়ে গেছে, যোগাযোগের রক্ত-ধমনী যেন।

প্রকৃতির একটি সুরে মানুষ এখনও কথা বসাতে পারে নি, গানও বাঁধতে পারে নি। 'পথের ডাক', প্রকৃতির সেই চিরন্তন সুর। এই সুর যুগ যুগ ধরে' আকুল করেছে, 'জিপ্‌সী'দের, বেদেদের, এই সুরে মেতে আমাদের ভ্রাম্যমাণ পূর্বপুরুষরা ঘুরে বেড়িয়েছেন বনেজঙ্গলে পর্বতে মরুতে। এই সুর তখনও বাজছিল, সেই মুহূর্ত, সেই ঋতু, সেই দৃশ্য সবাই যেন সেই সুরের ঐক্যতানে তন্ময় হ'য়ে গিয়েছিল। আকাশে উড়ে চলেছিল অসংখ্য বিদেশগামী পাখীরা

দল, লক্ষ লক্ষ ছোট বিন্দু যেন উড়ে চলেছে। আর নীচে ওই রাজপথ, মানুষের তৈরী পথ, তারও ওই এক আহ্বান—চলো, চলো, চলো।

কিন্তু যে অশ্বারোহী দুজন পর্বতশিখরে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের কানে এ সুর বাজছিল না। মনে হচ্ছিল তারা দুজনেই যেন চিন্তিত এবং বিরক্ত। তন্ন তন্ন করে' বনের আশে-পাশে, ঝোপের ফাঁকে-ফাঁকে দৃষ্টি দিয়ে তারা খুঁজছিল যেন কাকে। খুঁজতে খুঁজতে অধীর হ'য়ে পড়ছিল, হতাশ হ'য়ে পড়ছিল। আবার খুঁজছিল। যাকে খুঁজছে তার পাত্তা নেই।

"আমি তো তাকে দেখতে পাচ্ছি না কুনো"—প্রথম শিকারীটি বললে—"কোথাও না, তার ঘোড়ার ল্যাজের ডগাটুকু পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। আবার সে সরে' পড়েছে, বনের আড়াল থেকে অন্তর্ধান করেছে আবার। ইচ্ছে করছে কুকুর নিয়ে তার পিছু পিছু ধাওয়া করি—"

"হয়তো বাড়ি ফিরে গেছে"—কুনো বললে, একটু দ্বিধাভরে।

"বাড়ি!"—ঘৃণায় কুঞ্চিত হ'য়ে গেল প্রথম শিকারীর নাক মুখ —"বারো দিনের আগে সে বাড়ি ফিরবে না। বিয়ের তিন বছর আগে যে খেলা শুরু হয়েছিল তাই আরম্ভ হ'য়ে গেছে আবার। কি লজ্জা, কি কেলেঙ্কারি! রাজবংশের কুল-প্রদীপ! আমি বলব রাজবংশের অকাল কুষ্মাণ্ড একটি। রাজ্যের আত্মসম্মান, প্রতিষ্ঠা, মর্যাদা একটি ঘোড়ার পিঠে চড়ে' সীমান্ত পার হ'য়ে রোজ ভৈরঙ্গীতে চলে' যাচ্ছে! ছি, ছি, ছি। ওটা কি? না কিছু নয়। ও রকম রাজপুত্রের চেয়ে একটা ভাল ঘোড়া বা ভাল কুকুর ঢের বেশী নির্ভরযোগ্য। এই তো তোমার গন্ধরাজের গন্ধ!"

"আমার গন্ধরাজ কেন হ'তে যাবে"—অস্ফুট বিরক্ত কণ্ঠে বলল কুনো।

"তোমার যদি না হয় তাহলে কার তা-ও তো জানি না।"

"তুমি ওর জন্যে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তেও দ্বিধা কর না সেটা কে না জানে!"

"আমি! আমি ওকে ফাঁসিতে লটকে দিতে পারলে সুখী হব। আমি গর্জনগাঁওয়ের খাঁটি দেশপ্রেমিক লোক, সেনাবিভাগে আমি নাম লিখিয়েছি, দেশের জন্যে যুদ্ধ করে' পদকও পেয়েছি—আমি সাহায্য করব তোমার ওই রাজপুত্রকে! আমি স্বাধীনতা চাই, আমি কপিঞ্জলের দিকে—"

"যাই বল, সবই বুঝি"—কুনো হেসে বলল—"তুমি এখন যা বললে তা যদি আর কেউ বলত তাহলে তুমি তার রক্তদর্শন করে' ছাড়তে—এ আমিও জানি, তুমিও জান। লোকটা দেখছি সত্যিই তোমাকে গুণ করেছে। গন্ধরাজের গন্ধে তুমি মোহিত"—প্রথম শিকারী প্রত্যুত্তর করেই বলে উঠল—"ওই যে, ওই যাচ্ছেন মহাপুরুষ—"

সত্যিই দেখা গেল, প্রায় এক মাইল নীচে একজন অশ্বারোহী একটি শাদা ঘোড়ার পিঠে চড়ে' উপত্যকা বেয়ে দ্রুতবেগে অরণ্যের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

"একটু পরেই ও ভৈরঙ্গীতে পৌঁছে যাবে"—কুনো বললে—"নাঃ, ওকে আর শোধরানো গেল না। চিকিৎসার বাইরে চলে গেছে।"

"কিন্তু ও যদি অমন চমৎকার ঘোড়াটাকে জখম করে' ফেলে আমি ওকে ক্ষমা করব না কিছুতে—কি রকম ছোটাচ্ছে দেখেছ!"

প্রথম শিকারী ঘোড়ার লাগাম বাগিয়ে ধরল।

তারপর তারা পাহাড় থেকে নামতে লাগল তাদের সঙ্গীদের কাছে যাবার জন্যে। সূর্য অস্ত গেল। অরণ্যে ঘনীভূত হ'তে লাগল সন্ধ্যার অন্ধকার। একটা নীরব গাম্ভীর্য ঘনিয়ে এল চতুর্দিকে।

দুই

কুমার গন্ধরাজ রাত্রির অন্ধকারে ধীরে ধীরে নামছিলেন ঢালু পাহাড়ী পথ বেয়ে। পাতা আর শ্যাওলায় ঢাকা সবুজ সরু পথ। দেওদারগাছে সমাচ্ছন্ন চারিদিক। মাথার উপরে গাছের ফাঁকে ফাঁকে নক্ষত্র-খচিত কালো আকাশ। কিন্তু নক্ষত্রের আলো এ সূচীভেদ্য অন্ধকারকে আলোকিত করতে পারছিল না। বস্তুত পথই দেখতে পাচ্ছিলেন না তিনি। তাঁর ঘোড়াই তাঁকে নিজের খুশীমতো বয়ে' নিয়ে চলেছিল। মোটেই খারাপ লাগছিল না তাঁর। প্রকৃতির কঠোর রূপ, পথের অনিশ্চয়তা, মাথার উপর তারা-ভরা আকাশ, বন্যবাতাসের স্নিগ্ধ স্পর্শ চমৎকার লাগছিল। সুরাপান করলে প্রথমটা যেমন একটা ঈষৎ উত্তেজনাময় আনন্দ হয় সেইরকম একটা আনন্দ অনুভব করছিলেন তিনি যেন। অন্ধকারে কলধ্বনিমুখরা একটি নদীর আলাপও বেশ উপভোগ করতে করতে চলেছিলেন গন্ধরাজ। আশেপাশেই সে কলকলধ্বনি করে' বয়ে' যাচ্ছিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে যাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পরে তাঁর পরিশ্রম সার্থক হ'ল। বন থেকে বেরুতে পারলেন তিনি। রাজপথের শক্ত মাটির উপর এসে পড়লেন। পূবদিকে ঘেঁষে চলে' গেছে রাজপথ নীচের দিকে নেমে, অন্ধকার ঝোপের পাশে পাশে আবছা-ভাবে দেখা যাচ্ছে তার বিসর্পিত রূপটা। গন্ধরাজ থমকে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলেন সেদিকে। পথ চলেছে, যোজনের পর যোজন চলেছে, আরও কত পথ এসে মিলেছে ওর সঙ্গে, সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছে। কখনও সমুদ্রসৈকতের পাশ দিয়ে, কখনও শহরের আলো গায়ে মেখে চলেছে চলেইছে ওই পথ দেশ থেকে দেশান্তরে। ওর উপর দিয়ে শত শত পথিক চলেছে একই উদ্দেশ্যে এবং এখন সবাই বোধহয় সমবেত হচ্ছে কোনও শরাইখানায় বা বিশ্রাম-গৃহে। নানা

ছবি তাঁর মানসপটে ভিড় করে' এল আর অদৃশ্য হ'য়ে গেল। ধমনীতে চঞ্চল হ'য়ে উঠল রক্তস্রোত, দুর্দম হ'য়ে উঠল একটা প্রবল প্রলোভন, ইচ্ছে হ'ল ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে পড়ি অজানার উদ্দেশ্যে। পরমুহূর্তেই আবার সে ইচ্ছে অন্তর্ধান করল। ক্ষুধা এবং ক্লান্তি এবং অভ্যস্ত জীবনের সেই দৈনন্দিন দাবি যা আমাদের সাধারণ সাংসারিক বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করে তাই আবার প্রাধান্য লাভ করল তাঁর মনে। দেহের এবং মনের এই দাবি মেটাবার আশায় চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন তিনি। বাঁ দিকে, নদী এবং রাস্তার মাঝামাঝি একটা জায়গায়, দুটি আলোকিত বাতায়ন দেখতে পেলেন।

বাঁ দিকে ঘুরে সরু একটা পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে নেমে একটু পরেই হাজির হলেন এসে প্রকাণ্ড একটা গোলাবাড়ির সামনে। ঘোড়ার চাবুকের বাঁট দিয়ে দ্বারে আঘাত করতেই ঘেউ ঘেউ করে' ডেকে উঠল অনেকগুলো কুকুর। তার পরেই শুভ্র-মস্তক দীর্ঘকায় একটি বৃদ্ধ কম্পিত-শিখা প্রদীপ হস্তে দেখা দিলেন দ্বারপ্রান্তে। বৃদ্ধকে দেখলেই মনে হয় এককালে তিনি শক্তিশালী তো ছিলেনই, সুপুরুষও ছিলেন। কিন্তু এখন তাঁর দিন ফুরিয়েছে। একটি দাঁত নেই, কণ্ঠস্বর কম্পিত এবং অস্বাভাবিক।

"ক্ষমা করবেন"—রাজকুমার বললেন—"আমি একজন পথিক, পথ হারিয়ে ফেলেছি।"

"আসুন"—গম্ভীর সম্ভ্রমপূর্ণ কণ্ঠে আহ্বান করলেন বৃদ্ধ—"আপনি রঙ্গিলা খামারে এসে পড়েছেন। পাশেই রঙ্গিলা নদী। নদীর নামেই এই খামার। আমার নাম কীর্তিভূষণ—আপনার সেবা করবার সুযোগ পেলে আমি কৃতার্থ হব। এ জায়গাটা গর্জনগাঁওয়ের উত্তরা আর ভৈরঙ্গীর রুদ্রার ঠিক মাঝামাঝি—এদিকে দশ ক্রোশ ওদিকে দশ ক্রোশ। রাস্তা চমৎকার, কিন্তু শরাইখানা বা মদের দোকান একটিও নেই। আজ রাত্রের মতো আমারই কুঁড়ে ঘরে

আতিথ্য নিতে হবে আপনাকে, সম্বর্ধনা করবার মতো আয়োজন তেমন কিছু নেই, কিন্তু যা আছে তা আপনি স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারেন"—এই বলে বৃদ্ধ হাতজোড় করে' প্রণামের ভঙ্গীতে মাথা নত করলেন—"অতিথি সৎকার করা পরমভাগ্য। আপনি আসুন—"

"বেশ। অসংখ্য ধন্যবাদ—"

গন্ধরাজও মাথা নত করে' নমস্কার করলেন।

বাড়ির দিকে ফিরে বৃদ্ধ হাঁক দিলেন—"নন্দী, এই ভদ্রলোকের ঘোড়াটাকে নিয়ে গিয়ে আস্তাবলে বেঁধে দাও—"

তারপর রাজকুমারের দিকে ফিরে বললেন, "আসুন, ভিতরে আসুন।"

গন্ধরাজ যে ঘরটিতে ঢুকলেন সেটি বেশ বড় ঘর। একতলার প্রায় সবটাই জুড়ে আছে যেন ঘরখানা। মনে হ'ল ঘরখানা আগে বোধহয় ভাগ করা ছিল। কারণ ঘরের ওদিকটায় কয়েকটা সিঁড়ি রয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে একটা উঁচু বারান্দার মতো জায়গায় উঠতে হয়। তার একধারে আগুন জ্বলছে একটা প্রকাণ্ড উনুনে। তার কাছেই শাদা প্রকাণ্ড টেবিল একটা। বোধহয় খাবার টেবিল। ঘরের এ অংশটা বেশ উঁচু। কালো কাঠের উপর পিতলের কাজ করা আসবাবপত্র। শেলফে বাসনও সাজানো রয়েছে, সেকেলে ধাঁচের বাসন সব। তাছাড়া রয়েছে বন্দুক, দেওয়ালে বড় বড় হরিণের শিং, ঠাকুর দেবতার বিবর্ণ ছবি দু'একখানা। ঘটিকা-যন্ত্রও রয়েছে তাকের উপর। ঘরের কোণে পাথরের একটা বড় কলসী, তার গায়ে নল-লাগানো। গন্ধরাজের মনে হ'ল ওতে গৃহপ্রস্তুত সুরা আছে সম্ভবত। মনে আনন্দ সঞ্চারিত হ'ল একথা ভেবে। চমৎকার পরিবেশ, অদ্ভুত সুন্দর।

বলিষ্ঠ একটি যুবক বেরিয়ে এসে রাজকুমারের ঘোড়াটি ধরল। কীর্তি গন্ধরাজের সঙ্গে তাঁর মেয়ে উত্তমারও পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর গন্ধরাজ ঘোড়ার পিছু পিছু আস্তাবলে গিয়ে হাজির হলেন

ঘোড়াটার ঠিক মতো ব্যবস্থা হচ্ছে কি না দেখবার জন্যে। আচরণটা রাজকুমারের পক্ষে অশোভন হ'ল হয়তো, কিন্তু ঘোড়াকে তিনি এত ভালবাসতেন যে তার থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা হয়েছে কি না স্বচক্ষে না দেখলে স্বস্তি পেতেন না। আস্তাবল থেকে ফিরে এসে দেখলেন টেবিলের উপর গরম ডিম-ভাজা আর কয়েক টুকরো শূকরের মাংস তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। তারপর এল মাংসের কোর্মা, তারপর পুরু সর-ভাজা। গন্ধরাজের ক্ষুধা নিবৃত্ত হ'ল। সুরা-পাত্র নিয়ে সবাই আগুনের চারিপাশে সমবেত হলেন। পাছে কোনও অভদ্রতা হয় তাই কীর্তি এতক্ষণ কোনও প্রশ্ন করেন নি। এইবার করলেন।

"ঘোড়ার পিঠে অনেকটা রাস্তা এসেছেন বোধহয়।"

"ঠিকই ধরেছেন। অনেকটা রাস্তাই এসেছি। ক্ষিধের বহর দেখেই বুঝতে পারছেন সেটা। আপনার কন্যার দেওয়া খাবার একটুও নষ্ট করি নি।"

"রুদ্রার দিক থেকেই আসছেন বোধহয়।"

"হ্যাঁ। রাস্তা হারিয়ে না ফেললে আমি পার্বতীতে গিয়ে রাত কাটাতাম। কিন্তু তাতো হ'ল না।"

নির্বিকারভাবে মিথ্যা-ভাষণটি করলেন গন্ধরাজ।

"কোনও কাজের জন্যই নিশ্চয় পার্বতীতে যাচ্ছেন?"

"না, ঠিক কাজ নয়। কৌতূহল বলতে পারেন। গর্জনগাঁওয়ের প্রসিদ্ধ শহর পার্বতীকে দেখি নি,—গর্জনগাঁওয়ের নাম শুনেছি অনেক, দেখা হয় নি এখনও।"

"চমৎকার রাজ্য, দেখে সুখ পাবেন। সব ভালো, ওখানকার লোক, ওখানকার দেওদার-বন—সব ভালো। আমরা থাকি সীমান্তের এপারে তবু আমরা নিজেদের গর্জনগ্রামের প্রজা বলেই মনে করি। রঙ্গিলা নদীর জলে গর্জনগ্রামেরই স্বাদ গন্ধ। ওর প্রতি বিন্দুতে গর্জনগ্রামেরই মহিমা। চমৎকার জায়গা গর্জনগাঁও। গর্জনগাঁওয়ের

লোকেরা যে কুড়ুল চালিয়ে কাঠ কাটে ভৈরঙ্গীর লোকেরা সে কুড়ুল তুলতেই পারবে না। আর সেখানকার দেওদার, উঃ কত যে দেওদার আছে ওই রাজ্যে, অগুন্‌তি, অসংখ্য। পৃথিবীতে যত লোক আছে তার চেয়েও বেশী দেওদার আছে বোধহয় ওখানে। কুড়ি বছর আগে আমি জল-জঙ্গল পেরিয়ে গিয়েছিলাম একবার সেখানে, বুড়ো বয়সেই এখন ঘর আঁকড়ে পড়ে' আছি। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কাল গিয়েছিলাম। রাস্তা বরাবর চলে গেছে পার্বতীতে, কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু, কোথাও ঢেউ-খেলানো। আর চারদিকে কেবল গাছ আর গাছ, খালি দেওদার, ছোট বড় মাঝারি নানারকম। আর চারদিকেই নদীর স্রোতকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছে ওরা। কত কল, কত মিল। ওখানে আমাদের ছোট্ট একটুকরো বন ছিল বড় রাস্তার পাশে। বিক্রি করে' দিতে হয়েছিল সেটা। কিন্তু ওইটুকু বনের বদলে একগাদা টাকা পেয়েছিলাম। হ্যাঁ, একটি গাদা! মাঝে মাঝে তাই ভাবি সমস্ত গর্জনগাঁওয়ের গাছগুলোর দাম না জানি কত!"

"ওখানকার রাজকুমার গন্ধরাজের সঙ্গে পরিচয় নেই নিশ্চয়—"

"না"—নন্দী এবার জবাব দিলে—"পরিচয় করবার ইচ্ছেও নেই।"

"কেন! ওঁকে লোকে তেমন পছন্দ করে না বুঝি—"

"পছন্দ করে না বললে ঠিক বলা হবে না"—কীর্তি বললেন—"ওঁকে সবাই ঘৃণা করে।"

"বটে!"—অস্ফুট কণ্ঠে উত্তর দিয়ে থেমে গেলেন গন্ধরাজ।

"হ্যাঁ, ঘৃণা করে"—কীর্তি একটা লম্বা পাহাড়ী চুরুট ধরিয়ে বললেন—"আর আমার মতে ঘৃণা করবার ন্যায্য কারণও আছে। ভালো কাজ করবার কত সুযোগ পেয়েছিল লোকটা। কিন্তু কি করেছে? কিচ্ছু না। শিকার করে আর বাবুর মতো সেজেগুজে বেড়ায়। সাজ-গোজ মেয়েদের শোভা পায়, পুরুষের পায় কি?

আর শুনেছি মাঝে মাঝে অভিনয় করে। আর কিছু করে বলে' তো শুনি নি।"

"ও। কিন্তু শিকার করা, সেজে-গুজে বেড়ানো বা অভিনয় করা তো নির্দোষ আমোদ। আপনাদের কি ইচ্ছে উনি যুদ্ধ করুন ক্রমাগত?"

"না, মশাই"—বৃদ্ধ বলে, উঠলেন—"আমার কথাই ধরুন। এই রঙ্গিলা খামার নিয়ে আমি পঞ্চাশ বছর আছি, পঞ্চাশ বছর ধরে' এর পিছনে আমি খেটেছি। রাত-দিন খেটেছি প্রত্যহ। লাঙল দিয়েছি, বীজ ছড়িয়েছি, ফসল কেটেছি, খুব ভোরে উঠেছি, অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থেকেছি। ফল এই হয়েছে—এই খামার এতকাল আমার পরিবারকে লালনপালন করেছে এবং আমার স্ত্রীর কথা বাদ দিলে এর চেয়ে বড় বন্ধু আমার জীবনে আর পাই নি। আমি যখন চলে' যাব তখন যে খামার রেখে যাব তা আমি যা পেয়েছিলাম তার চেয়ে অনেক বড়, অনেক উন্নত। আমি বলতে চাই, মানুষ যদি আন্তরিকভাবে মেহনত করে—প্রকৃতির নিয়মও তাই—তাহলে কখনও তার অন্নবস্ত্রের অভাব হয় না, সুখশান্তিও পায়, তার স্পর্শে ধুলোমুঠি সোনামুঠি হয়ে যায়। আমরা সামান্য চাষী, তবু আমাদের মনে হয় গন্ধরাজ যদি তাঁর রাজত্বের দিকে একটু মন দিতেন, যে সিংহাসন তিনি পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পেয়েছেন সেই সিংহাসনের দায়িত্ব যদি তিনি রাজার মতন বহন করতেন, আমি যেমন জমির পিছনে খেটেছি তিনিও যদি তাঁর রাজ্যের জন্য খাটতেন, কত ভালো হ'ত তাহলে। সবাই ধন্য ধন্য করত, রাজ্যেরও উন্নতি হ'ত অনেক—"

"আপনি যা বললেন তা আমি মেনে নিচ্ছি"—গন্ধরাজ উত্তর দিলেন—"কিন্তু তবু আমি বলব আপনার জীবনে আর রাজার জীবনে তফাত আছে। আকাশ-পাতাল তফাত। আপনার জীবন স্বাভাবিক এবং সরল। কিন্তু রাজার জীবন কৃত্রিম এবং

জটিল। আপনার জীবনে আপনি অতি সহজেই যা উচিত তা করতে পারেন। কিন্তু রাজার পক্ষে অনুচিত কাজ না করাই খুব শক্ত ব্যাপার। কোন বার আপনার ফসল যদি না হয় আপনি আকাশের দিকে চেয়ে বলবেন—ভগবান এই যদি তোমার ইচ্ছা, তবে তাই হোক। ওইখানেই ব্যাপার মিটে গেল। কিন্তু রাজার কোন চেষ্টা যদি বিফল হয়, সবাই রাজাকেই দোষ দেবে, ভগবানকে নয়। তাই আমার মনে হয় ভারতবর্ষের রাজারা যদি নির্দোষ আমোদ নিয়ে থাকেন, প্রজারা বেশী সুখে থাকবে। রাজকার্য নিয়ে বেশী মাথা ঘামালেই বিপদ—"

"ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন"—নন্দী বলে' উঠল সানন্দে—"ঠারেঠোরে যা বলছেন তাতে মনে হচ্ছে আপনি আমার দলের লোক। সত্যিকার স্বদেশ-প্রেমিক আপনি, রাজা-রাজড়াদের শত্রু।"

তাঁর কথার যে এই নির্গলিতার্থ হবে তা ভাবেন নি গন্ধরাজ। একটু লজ্জিত হ'য়ে পড়লেন। প্রসঙ্গান্তরে আসাই সমীচীন মনে হ'ল।

"গন্ধরাজ সম্বন্ধে যা বললেন তা শুনে বেশ আশ্চর্য লাগছে। কিন্তু আমি তাঁর সম্বন্ধে যা শুনেছি তা এতটা খারাপ নয়। আমাকে একজন বলেছিলেন গন্ধরাজ লোক ভালো। কিন্তু তিনি নিজেই নিজের শত্রু। আর কারও সঙ্গে তাঁর শত্রুতা নেই।"

"ঠিক শুনেছেন আপনি"—কীর্তির মেয়ে উত্তমা বলল—"গন্ধরাজ নাকি চমৎকার লোক। সত্যি রাজপুত্র। তাঁর জন্যে প্রাণ বিসর্জন করতে প্রস্তুত আছেন এ রকম দু'একজন লোককে জানি—"

"ও, কুনো!"—নন্দী বলে' উঠল—"ও তো একটা গাড়োল—"

"হ্যাঁ, কুনো!"—কম্পিত কণ্ঠে শুরু করলেন বৃদ্ধ—"মনে হচ্ছে এ ভদ্রলোক এ অঞ্চলে আগন্তুক, গন্ধরাজের খবর জানতে চাইছেন, মনে হয় কুনোর গল্পটা ওঁর ভালোই লাগবে। দেখুন—এই কুনোকে আমরা চিনি। কুনো হ'ল গন্ধরাজের চাকর, শিকারের সময়ে সঙ্গে

থাকে। হোঁৎকা গোছের, বুদ্ধিসুদ্ধি নেই, মদও খায় খুব অর্থাৎ ভৈরঙ্গীদের ভাষায় গর্জনগাঁওয়ের নির্ভেজাল মাল একটি। আমাদের এখানে আসে প্রায়, শিকারী কুকুরগুলো যখন বনের ভিতর ছিটকে পড়ে এদিকে ওদিকে, তাদের খোঁজে আসে এখানে। আমরা অবশ্য যত্ন করি খুব। আমার বাড়িতে গর্জনগাঁও আর ভৈরঙ্গীর ভেদাভেদ নেই, বিশেষ করে, গর্জনগাঁওয়ের সঙ্গে ভৈরঙ্গীর যখন কোনও ঝগড়া নেই তখন আসা-যাওয়ারও কোন বাধা নেই। দু'দিকের পথ খোলা, আমার দুয়ারও খোলা—"

"হ্যাঁ"—গন্ধরাজ বললেন—"গর্জনগাঁও আর ভৈরঙ্গীর মধ্যে অনেকদিন ধরে' শান্তি বিরাজ করছে—অনেক শতাব্দী ধরে'—"

"শতাব্দীর কথা বলছেন ?"—কীর্তি বললেন প্রত্যুত্তরে—"চিরকাল নয় কেন, সেইটেই তো দুঃখ! যাক, কুনোর কথা শুনুন। কুনো একদিন কি একটা দোষ করেছিল। গন্ধরাজ রগ-চটা লোক, চাবকাতে লাগল কুনোকে। কুনো খানিক্ষণ সহ্য করলে, কিন্তু আর পারলে না, গন্ধরাজের হাত থেকে চাবুকটা কেড়ে নিয়ে বললে, আসুন রাজকুমার আমরা লড়ে' যাই, চাবুক দিয়ে মারা বীরত্বও নয়, মনুষ্যত্বও নয়। এ অঞ্চলে মল্লযুদ্ধ করে'ই সাধারণত বিবাদের নিষ্পত্তি হয়। গন্ধরাজ লড়ে' গেলেন কুনোর সঙ্গে। কিন্তু কুনো হ'ল একটা বিরাটকায় পাঠ্ঠা পালোয়ান, তার সঙ্গে ফড়িংবাবাজী গন্ধরাজ পারবে কেন। চাকা ঘুরে গেল। যে লোকটাকে এতক্ষণ তিনি চাবকাচ্ছিলেন সেই লোকটাই তাঁকে শূন্যে তুলে দিলে একটি আছাড়। ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন বাছাধন!"

নন্দী বললে—"কব্জির কাছটা ভেঙে গিয়েছিল, কেউ বলে নাকটাও। ঠিক হয়েছিল। হাতাহাতি যুদ্ধ হলেই প্রমাণ হ'য়ে যায় কার জোর বেশী।"

"তার পর ?"—গন্ধরাজ প্রশ্ন করলেন।

"কুনো তারপর কাঁধে করে' তাঁকে বাড়ি নিয়ে গেল এবং

তারপর থেকেই হরিহরআত্মা বন্ধু হ'য়ে গেল দুজনে। গল্পটা বিশ্বাসযোগ্য কি না তা জানি না"—বৃদ্ধ মুচকি হেসে বললেন—"কিন্তু মজার গল্প এটা, অদ্ভুত গল্প। মানুষকে চাবুক মারবার আগে একটু ভাবা উচিত। আমার ভাইপো নন্দী যা বললে মল্লযুদ্ধেই বোঝা যায় কার মুরোদ কতখানি—"

"এ বিষয়ে আমার অভিমত যদি শোনেন"—গন্ধরাজ হেসে বললেন—"হয়তো আপনারা আশ্চর্য হ'য়ে যাবেন। আমার মনে হয় গন্ধরাজই জয়ী হয়েছিলেন।"

"তা এক হিসাবে ঠিক"—গম্ভীর মুখে উত্তর দিলেন বৃদ্ধ—"ভগবানের চোখে তো নিশ্চয়ই। কিন্তু মানুষের দৃষ্টি একটু অন্যরকম। তারা এ নিয়ে ঠাট্টা করে হাসাহাসি করে।"

"তারা গানই বেঁধে ফেলেছে একটা"—বলে' উঠল নন্দী—"কুনো পিণ্ডি চটকেছে, গন্ধরাজকে পটকেছে—"

গানটা শোনবার ইচ্ছা ছিল না গন্ধরাজের। বাধা দিয়ে বললেন —"তবে আমার মনে হয় গন্ধরাজের বয়স তো বেশী নয়, শেষপর্যন্ত শুধরে যাবে।"

"খুব কমও নয়, মশাই"—নন্দী বলল—"মেঘে মেঘে বেশ বেলা হয়েছে। শুনেছি চল্লিশের কম নয়।"

"ছত্রিশ"—সংশোধন করে' দিলেন কীর্তি।

"ও বাবা"—উত্তমার স্বপ্ন-ভঙ্গ হ'ল যেন—"তাহলে তো বেশ বয়স হয়েছে। লোকে বলে যৌবনে তিনি নাকি খুব সুশ্রী ছিলেন।"

"সুশ্রী না ছাই। মাথায় টাক ছিল"—নন্দী টিপ্পনী কাটল।

গন্ধরাজ তাঁর চুলের ভিতর আঙুল চালালেন একবার। খুব খারাপ লাগছিল তাঁর। পার্বতীর রাজপ্রাসাদে একঘেয়ে বিরক্তিকর সন্ধ্যাগুলিও যে এর তুলনায় অনেক ভালো।

"ছত্রিশ বছর এমন কিছু বয়স নয়"—গন্ধরাজ প্রতিবাদের সুরে

বললেন, "ছত্রিশ বছরে লোক বুড়ো হ'য়ে যায় না। আমার বয়স ছত্রিশ বছর।"

"আমার মনে হচ্ছিল, আর একটু বেশী"—বৃদ্ধ কীর্তিভূষণ মন্তব্য করলেন—"ছত্রিশ বছরই যদি আপনার বয়স হয় তাহলে আপনি মৃগেন্দ্রকুমারের সমবয়সী। আর চেহারা দেখে মনে হয় কাজও করেছেন খুব, অলসের মতো বসে' থাকেন নি। আমাদের মতো বুড়োর তুলনায় বয়সটা অবশ্য কমই মনে হয়, কিন্তু ছত্রিশ বছরই বা কম কি, ছত্রিশ বছরে কত কি না করা যায়। যারা কুঁড়ে আর আড্ডা-বাজ তারাই ছত্রিশ বছরে শেষ হয়ে যায়। যে লোক ভগবানে বিশ্বাস করে, ভগবানের নিয়মে চলে, ছত্রিশ বছরে তার বাড়ি ঘর নাম যশ সব হয়, স্ত্রীপুত্রকন্যা নিয়ে সুখে দিন কাটায় সে, আর তার আদর্শ তার কীর্তি অমর করে' রাখে তাকে—"

"গন্ধেশ্বরের স্ত্রী আছে একটি"—হো হো করে' অসভ্যের মতো হেসে উঠল নন্দী।

"এতে আপনি একটা বিশেষ আমোদ অনুভব করছেন মনে হচ্ছে।"

"হ্যাঁ, কেন করছি বুঝতে পারছেন না"—অসভ্যটা উত্তর দিলে—"সারা ভারতবর্ষ তো একথা জানে। আপনি শোনেন নি?" একটা মূক অশ্লীল অভিনয় করে' ব্যাপারটা স্পষ্ট করবার চেষ্টা করল সে।

বৃদ্ধ বললেন, "মনে হচ্ছে আপনি কাছেপিঠে কোথাও থাকেন না। থাকলে শুনতে পেতেন। ব্যাপার কি জানেন, গর্জনগাঁওয়ের রাজপরিবারের লোকেরা আর রাজসভার সভ্যরা সবাই মহা অসভ্য আর মহাপাজি। একটি ভালো লোক নেই। সবাই রাজভোগে মহাসুখে আছে, কাউকে খেটে খেতে হয় না, আর এর যা অনিবার্য পরিণাম তাই ঘটেছে। সব দুশ্চরিত্র। গর্জনগাঁওয়ের রাণীর প্রণয়ী আছে একটি—পূর্ব হিমাচলের কোন এক প্রদেশের মহাসামন্ত না কি লোকটা। গন্ধরাজ তো নপুংসক, ওই লোকটার ধামা-ধরা

হ'য়ে আছে সে। শুধু তাই নয়—রাণীর প্রণয়ী ওই বিদেশী মহা-সামন্তটি এখন গর্জনগাঁওয়ের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। গন্ধরাজকে মাসে মাসে কিছু মাসোহারা দিয়ে সেই রাজকার্য চালায়! সুতরাং রাজ্য রসাতলে যাচ্ছে। এর ভয়ংকর ফল ফলবে। আমি যদিও বুড়ো হয়েছি, তবু মনে হয় সে ফল আমি দেখেই মরব।"

নন্দী এসব শুনে উত্তেজিত হ'য়ে পড়ল একটু।

"কপিঞ্জলের সম্বন্ধে একটু ভুল করলে তুমি"—উত্তেজিত কণ্ঠে বলল সে—"বাকি সব যা বলেছ তা ঠিক। গন্ধরাজ যদি ওই শয়তানী রাণীটাকে টুঁটি টিপে মেরে ফেলে—এখনও আমি ওকে ক্ষমা করতে রাজি আছি।"

"না, নন্দী। অন্যায় আচরণ করে' মন্দকে শোধরানো যায় না। দেখুন মশাই"—বেচারা রাজপুত্রের দিকে ফিরে তিনি আবার বলতে শুরু করলেন—"সমস্ত দোষ ওই গন্ধরাজের।" সে শপথ করে' তার স্ত্রীর আর রাজ্যের ভার নিয়েছিল—"

"শপথ!"—বাধা দিল নন্দী—"রাজাদের শপথে তুমি বিশ্বাস কর নাকি!"

একথায় কর্ণপাত না করে' বৃদ্ধ গন্ধরাজকে উদ্দেশ্য করেই বলতে লাগলেন—"সে শপথ ভুলে গিয়ে সে রাণী আর রাজ্যকে সঁপে দিয়ে বসল কিনা একটা বিদেশী বোম্বেটের হাতে। বোম্বেটেটা রাণীকে ভুলিয়ে এমন স্তরে নিয়ে গেছে যে প্রত্যেক মদের ভাঁটিতে ভাঁটিতে তার নাম নিয়ে ঠাট্টা মস্করা চলছে। আর রাণীর বয়স কত জানেন? মাত্র কুড়ি। তার চেয়েও কম বোধহয়। লোকটা ক্রমাগত খাজনা বাড়িয়ে চলেছে। অস্ত্রের ঝনৎকারে সবাই সন্ত্রস্ত। যুদ্ধ বাধল বলে।"

"যুদ্ধ"—বলে' উঠলেন গন্ধরাজ।

"তাই তো বলছে সবাই। যারা তাদের কাজকর্ম লক্ষ্য করে তাদের তো ওই মত। যুদ্ধই বাধবে শেষটা। সমস্ত ব্যাপারটাই

দুঃখের। বড়ই দুঃখের। ওই হতভাগিনী ভ্রষ্টা রাণী সকলের অভিশাপ কুড়িয়ে নরকে যাবে সেটা দুঃখের, এমন সুন্দর রাজত্বটা সুশাসনের অভাবে ছারখার হ'য়ে যাবে সেটাও দুঃখের। কিন্তু যে যাই বলুক আমার ধারণা গন্ধরাজ এঁটে উঠতে পারবে না এদের সঙ্গে। তার কৃতকর্মের ফল তাকে ভোগ করতে হবেই। ভগবান ক্ষমা করুন তাকে—"

"লোকটা শপথ ভঙ্গ করেছে, সুতরাং প্রতারক। প্রজার কাছ থেকে খাজনা আদায় করেছে কিন্তু প্রজাদের প্রতিদানে কিছু দেয় নি, সুতরাং চোর। স্ত্রীকে পরপুরুষের কোলে তুলে দিয়েছে, সুতরাং আত্মসম্মানহীন বেহায়া। আর বাকী রইল কি। বুদ্ধি? জন্ম থেকেই তো ও নিরেট!"

"সুতরাং বুঝতেই পারছেন"—কীর্তিভূষণ বললেন—"কেন আমরা গন্ধরাজের উপর চটা। মানুষ তার অন্তরের ব্যক্তিগত জীবনে সৎ আর ধার্মিক হ'তে পারে, আবার বাইরের সামাজিক জীবনেও হ'তে পারে। কিন্তু কোন লোক যদি কোন দিকেই ভদ্র না হয় তাহলে ভগবান ছাড়া তাকে আর কে বাঁচাতে পারে বলুন। ওই যে কপিঞ্জল লোকটা—যার সম্বন্ধে আমাদের নন্দী এত উচ্ছ্বসিত—"

"হ্যাঁ, কপিঞ্জলই আমার আদর্শ। ওর মতো নেতা যদি ভৈরঙ্গীতেও থাকতো তাহলে আমরা বেঁচে যেতাম।"

"লোকটা কিন্তু খারাপ"—মাথা নাড়তে নাড়তে বৃদ্ধ বললেন—"খুব খারাপ। ধর্মের বিধান যারা লঙ্ঘন করে তারা কখনও কোনও ভাল কাজ করতে পারে না। তবে এইটুকু বলতে পারি লোকটা উদ্যোগী আর পরিশ্রমী—সেটাও একটা বড় গুণ।"

তর্জনী আস্ফালন করে বলে' উঠল নন্দী—"ওই কপিঞ্জলই গর্জনগাঁওয়ের একমাত্র আশা-ভরসা। তোমার সেকেলে বাসী শুকনো আদর্শের সঙ্গে না মিললেও এটা বলতেই হবে ওই হচ্ছে

আধুনিক নেতা। আধুনিক যুগের আলো আর প্রগতির ওই হচ্ছে প্রতীক। ও মাঝে মাঝে ভুল করে' ফেলে মানছি—কিন্তু ভুল কে না করে—কিন্তু জনসাধারণের মঙ্গল হোক এইটেই ওর একমাত্র লক্ষ্য। আপনি তো মশাই সংস্কারমুক্ত উদার লোক আর যতদূর বুঝতে পারছি ওই রাজরাজড়াদের শত্রু, আপনি একটা কথা শুনে রাখুন—কিছুদিন পরে দেখবেন ওই নপুংসক গন্ধরাজকে আর তার স্বৈরিণী রাণীকে প্রজারা ঘাড় ধরে' রাজ্য থেকে বার করে' দিয়ে কপিঞ্জলকে গণ-নায়করূপে বরণ করেছে। এ হবেই, দেখে নেবেন। ওদের বক্তৃতায় আমি একথা শুনেছি। রুদ্রাতে আমি একবার একটা সভায় গিয়েছিলাম। বিরাট সভা। পার্বতীর প্রায় পনেরো হাজার লোকের প্রতিনিধিরা সেখানে বক্তৃতা দিয়েছিল। পনেরো হাজার বাজে লোক নয়, সেনাদলের পদক-প্রাপ্ত পনেরো হাজার জোয়ান। তারা ঠিক এই কথাই বললে। কপিঞ্জলের প্রভাবটা কি রকম বুঝতেই পারছেন তাহলে—"

এসব কথায় বৃদ্ধ কীর্তিভূষণ কিন্তু তেমন প্রভাবিত হলেন না।

"আরে শেষ পর্যন্ত দেখ কি হয়। ওসব লম্বা-চওড়া কথা অনেক শুনেছি, বীরত্বের আর আধুনিকতার ফাঁকা আওয়াজ গুণ্ডামি আর লুটপাটে পরিণত হ'তে বেশী দেরি লাগে না। তবে একটা কথা ঠিক, এই কপিঞ্জল একটি পা রেখেছেন রাজার অন্দরমহলে আর একটি পা শ্রমিক প্রজাদের উঠোনে। নিজেকে উনি গণ-নায়ক বলে' প্রচার করে' বেড়াচ্ছেন। বিদেশী মহাসামন্ত এদেশের গণ-নেতা সেজেছেন।"

"সেজেছেন!"—প্রতিবাদ করল নন্দী—"সত্যিই উনি গণনেতা। যেদিন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে সেইদিনই উনি ওঁর মহাসামন্ত উপাধি পরিত্যাগ করবেন। ওঁর বক্তৃতায় এ কথা শুনেছি।"

"মহাসামন্ত ভোল বদলে গণ-নেতা হবেন। নীলবর্ণ মেখে

শৃগাল হবেন পশুরাজ। আমি তো থাকব না, তোমরাই দেখতে পাবে এর কি ফল হয়।"

"বাবা"—উত্তমা বৃদ্ধের কানে কানে বলল—"ভদ্রলোক বোধহয় অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন। ওঁর দিকে ভাল করে' চেয়ে দেখ—"

আতিথ্য সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে উঠলেন বৃদ্ধ.

"ক্ষমা করবেন। অনেকক্ষণ বকবক করেছি। ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছেন মনে হচ্ছে। একটু মাধ্বী খাবেন? খাঁটি মধু থেকে মাধ্বী তৈরি করি আমরা—"

"না, ধন্যবাদ। সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছি খুব"—গন্ধরাজ বললেন—"শরীর আর বইছে না। এখন শুয়ে পড়তে চাই—"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। উত্তমা আলোটা দাও। মুখটা শুকিয়ে গেছে আপনার। আর একটু শরবত খাবেন? না? থাক তাহলে। আসুন আমার সঙ্গে। ওই ঘরে আপনার শোওয়ার জায়গা হয়েছে। অনেক অতিথির পায়ের ধুলো পড়েছে ওঘরে। আসুন—"

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন দু'জনে।

"ভালো খাবার, একটু ভালো মদ, ভদ্র বিবেক, আর শোওয়ার আগে একটু হালকা গল্প-গুজব—এর চেয়ে ভালো ঘুমের ওষুধ আর কিছু নেই। আসুন—"

একটি ঘরের কপাট খুলে গন্ধরাজকে নিয়ে তিনি ছোট একটি শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করলেন।

"এই আপনার বন্দর! ছোট, তবে খুব অসুবিধা হবে না। ঘরটায় ভালো হাওয়া খেলে। বিছানাপত্রও খুব খারাপ নয়, উত্তমার এসব ব্যাপারে খুব শখ—বিছানায় আতর ছেটায়! এঘরে জানলা দিয়ে রঙ্গিলাকে দেখতে পাবেন আর তার গান শুনবেন। একই গান বরাবর শুনিয়ে আসছে ও, কিন্তু কখনও একঘেয়ে হয় না। মানুষের গান বেশীক্ষণ শোনা যায় না, কিন্তু নদীর গান শোনা

যায়। মনটাকে একেবারে আকাশের তলায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়। আমরা বাড়িটাড়ি বানাই বটে, কিন্তু আকাশের তলায় গিয়ে দাঁড়ালেই বোঝা যায় বাজে সময় আর অর্থ নষ্ট হয়েছে। রঙ্গিলার ওই কুলুকুলু শব্দ মনে ভারি একটা আনন্দও এনে দেয়। প্রার্থনা করবার পর যে আনন্দ হয়, অনেকটা সেই রকম আনন্দ। এবার শুয়ে পড়ুন। সকালে আবার দেখা হবে!"

বৃদ্ধ মাথা নত করে' অভিবাদন করলেন, তারপর নেবে গেলেন ধীরে ধীরে।

তিন

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল গন্ধরাজের, পাখীদের প্রথম কাকলীতে বনভূমি সবে জেগে উঠেছে, মন্দ সমীরণে চতুর্দিক স্নিগ্ধ। নবোদিত সূর্যকিরণের তির্যক আলোতে দেওদার গাছগুলোর সুদীর্ঘ ছায়া পড়েছে পাহাড়ের গায়ে। রাত্রিটা বড় কষ্টে কেটেছিল, পবিত্র প্রভাতের এ সংবর্ধনা ভারি ভালো লাগল। মনে হ'ল সবার আগে যখন উঠেই পড়েছি তখন এই মনোরম পরিবেশে শরীর আর মনকে একটু চাঙ্গা করে' নেওয়া যাক। ভিজে ঘাসের উপর দিয়ে দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। তাঁর ছায়াও অনুসরণ করতে লাগল তাঁকে।

জাফরি-ঘেরা একটা পথ নদীর দিকে চলে' গেছে দেখতে পেলেন। সেই পথেই চলতে লাগলেন গন্ধরাজ। রঙ্গিলা দুর্দান্ত পাহাড়ী নদী। খামারের কাছেই একটি ছোট পাহাড়ের উপর থেকে লাফ দিয়ে নদীটি নেমেছে ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে, তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে কলকল খলখল করে' বয়ে চলেছে উপত্যকার মধ্যে দিয়ে। তারপর কিছুদূর গিয়ে গর্তের মধ্যে পড়ে' সৃষ্টি করেছে একটা ছোট্ট জলাশয়। তার জল যেন ফুটছে! সেই জলাশয়ের ভিতর একটা বড় পাথরের চাঙড় দেখা যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যেন একটা অন্তরীপ। গন্ধরাজ কোনক্রমে সেই পাথরটার উপর উঠে পড়লেন। ভাবলেন এইখানে বসেই ব্যাপারটা একটু প্রণিধান করা যাক।

একটু দূরেই দেওদার গাছের ডালপালা আর কচি কচি পাতাগুলো একটি পরদার মতো ঝুলছিল প্রপাতের উপর। সূর্য একটু উপরে উঠতেই সেই পরদার উপর আলো পড়ল, সোনালী আর সবুজের মহিমা প্রতিফলিত হ'ল সেই ফুটন্ত জলের উপর। মনে

হ'তে লাগল পাথরের উপর আশ্চর্য কারুকার্য যেন মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে হঠাৎ। সেই দুরন্ত জলধারার সঙ্গে আলো যেন খেলা করতে লাগল, জলাশয়ের ফেনিল আবর্ত্ত মণ্ডিত হ'য়ে গেল উজ্জ্বল হীরক-দ্যুতিতে। গন্ধরাজ যেখানে বসেছিলেন সেখানে রোদ এসে পড়েছিল। প্রভাতের সেই মধুর আতপ্ত পরিবেশে কেমন যেন নেশার মতো লাগছিল। মনে হচ্ছিল আলো যেন সাঁতার কাটছে, আলো যেন জলের উপর আলপনা দিচ্ছে। যে পাথরের উপর তিনি বসেছিলেন সে পাথরটাও যেন আলোর স্পর্শে রূপবান হ'য়ে উঠল। প্রজাপতির মতো নাচতে লাগল প্রতিফলিত আলোর অপরূপ ছবি সব। সামনের দেওদার গাছের পরদাটা দুলতে লাগল পাহাড়ী হাওয়ায়।

সমস্ত রাত বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে' কেটেছে, যা শুনলেন তাতে সমস্ত মন গ্লানিতে আর ঈর্ষায় পূর্ণ—কিন্তু এই আলো-ছায়াময় কলধ্বনি-মুখর পরিবেশে এসে তাঁর প্রাণটা যেন জুড়িয়ে গেল। পা দুটো গুটিয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি পাথরটার উপর। মুগ্ধ স্বপ্নাচ্ছন্ন হ'য়ে চেয়ে রইলেন সামনের দিকে সবিস্ময়ে। অজানা দেশের অনিশ্চিত রহস্যলোকে ঘুরে বেড়াতে লাগল তাঁর মন। নদীর মতোই তরল ধারায় প্রবাহিত হ'তে লাগল তাঁর অস্পষ্ট চিন্তাধারা বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ করে',—যেন অদৃশ্য ভাগ্যের স্রোতেই ভাসিয়ে দিলেন তিনি নিজেকে ক্রীড়াচ্ছলে। ভাসতে ভাসতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে ঘুমের দেশে চলে' গেলেন যেন। নদীর আবর্ত্ত আর গন্ধরাজ দুই যেন এক। দুজনকেই কোন শক্তি যেন পিছন থেকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, আবার দুজনকেই যেন কোন শক্তি পৃথিবীর এক কোণে বন্দী করে' রেখেছে। বিশ্বতত্ত্বের বিরাট পটভূমিকায় কি মূল্য আছে তাদের? কিছুই নেই!

সম্ভবত গন্ধরাজ একটু ঘুমিয়েই পড়েছিলেন—কার ডাকে চমকে জেগে উঠলেন।

"শুনুন"—গন্ধরাজ ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন কীর্তিভূষণের কন্যা

উত্তমা ডাকছে। একটা সলজ্জ ভয় যেন মূর্ত হ'য়ে উঠেছে তার ব্যবহারে। মনে হচ্ছে তাঁকে এ ভাবে ডেকে সে যেন শালীনতার সীমা অতিক্রম করছে এবং অতিক্রম করছে বলে' ভয়ে আর লজ্জায় অভিভূত হ'য়ে পড়েছে বেচারী। সাধারণ গ্রাম্য বালিকা উত্তমা। সুস্থ, সবল, সরল, সুখী এবং সৎ। সুখ এবং স্বাস্থ্য থাকলে দেহে যে রূপ বিকশিত হয় সে রূপ তার যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এখন তার সলজ্জ সভয় ভাব তাকে যেন আরও কমনীয় করে' তুলেছে।

"নমস্কার"—পাথর থেকে উঠে তার দিকে অগ্রসর হ'তে লাগলেন গন্ধরাজ—"আমি খুব ভোরে উঠেছি। এতক্ষণ যেন একটা স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে ছিলাম।"

"মহারাজ"—সভয়ে সানুনয়ে বলল সে—"আমার বাবাকে ক্ষমা করুন। আপনি কে তা জানলে তিনি যা বলেছেন তা কখখনো বলতেন না। তা বলবার আগে নিজের জিভ কেটে ফেলতেন তিনি। আর ওই নন্দী—কি অসভ্যের মতো যা তা বলছিল কাল। কিন্তু আমার কেমন সন্দেহ হয়েছিল কাল রাত্রেই। সকালে উঠেই তাই আমি আস্তাবলে চলে' গেলাম। গিয়ে দেখলাম যা ভেবেছি তাই, ঘোড়ার রেকাবে আপনার বজ্রাঙ্কুশ আঁকা রয়েছে। আমি জানি আপনি ওদের ক্ষমা করবেন—ওরা নিতান্তই সরল আর নিরীহ। যা শোনে, তাই বলে' বেড়ায়—"

গন্ধরাজ খুশী হলেন একথা শুনে।

বললেন, "কিন্তু একটা কথা তুমি বুঝতে পারছ না। দোষ তো আমারই। নাম ধাম পরিচয় গোপন করে' ওদের উসকে দিয়ে ওদের মুখ থেকে নিজের সমালোচনা শোনার কোনও মানে হয়? দোষ আমারই। কিন্তু আমার অনুরোধ, ব্যাপারটা, মানে আমার এই আত্মগোপনের ব্যাপারটা, যেন ফাঁস করে' দিও না তোমরা। আমাকে ভয় নেই, আমি তোমাদের কিছু করব না। ভৈরঙ্গীতে

তোমরা তো এমনিতেই নিরাপদ, আর আমার নিজের রাজত্বে আমার কোনও ক্ষমতা নেই।"

"ওকথা বলবেন না। আমি জানি শিকারীরা আপনার জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত।"

"ও, তাহলে আমাকে সুখী রাজপুত্র বলতে পার!"—হেসে বললেন গন্ধরাজ—"কিন্তু আমি জানি সৌজন্যবশতই তুমি আসল সত্যটা চাপা দেবার চেষ্টা করছ। সত্যটা হচ্ছে আমি নামেই রাজা, বাইরের একটা লোক-দেখানো মিথ্যা শোভা। কালই তো সব শুনলে পরিষ্কারভাবে। পাথরের উপর ছায়াটা নড়ছে দেখছ? আমি ওই ছায়া আর কপিঞ্জল পাথরটা। এ ছাড়া গন্ধরাজের আর কোন মূল্য দেয় না কেউ। তোমার বন্ধুদের আমার উপর যত রাগ কপিঞ্জলের উপর যদি তত রাগ থাকত! নন্দী তো ওর সম্বন্ধে একেবারে গদগদ দেখলুম। তোমার বাবা ততটা নন, তিনি বেশ জ্ঞানী লোক বলেই মনে হ'ল আমার, সৎলোক তো বটেই—"

উত্তমা বলল—"সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ করবেন না মহারাজ। নন্দীও ভালো ছেলে। কাল ওরা যা বলছিল তা সব বাজে কথা। গাঁয়ের লোকেরা যখন গল্পগুজব করে তখন সত্য-মিথ্যার দিকে খেয়াল থাকে না তাদের। গল্প করবার জন্যেই গল্প করে। আপনি যদি আর একটা খামারে যান আর তাদের আড্ডায় বসেন শুনতে পাবেন তারা আমার বাবার বিরুদ্ধেই কত কথা বলছে। গাঁয়ের লোকেদের ওই স্বভাব! পরনিন্দা পরচর্চা করতে পেলে আর কিছু চায় না।"

"থাম, থাম"—গন্ধরাজ বাধা দিলেন—"আমার কথাটা শোন। গন্ধরাজের বিরুদ্ধে কাল ওঁরা যা বলছিলেন—"

"সব মিথ্যে—"

"মোটেই না। সব সত্যি। ওঁরা কাল যা বলছিলেন তা সব

বর্ণে বর্ণে সত্যি। ওঁরা আমাকে যত খারাপ ভাবছেন আমি তার চেয়েও খারাপ!"

"বলেন কি"—সবিস্ময়ে বলে' উঠল উত্তমা—"আপনি সত্যি ওই রকম? আপনি পুরুষ নন? আমাকে যদি কেউ ওরকম ভাবে গালাগালি দিত আমি কিছুতেই সহ্য করতাম না, কিছুতেই না। আমি মজাটি টের পাইয়ে দিতাম তাদের। আর আপনাকেও তাই করতে হবে যদি আপনি মাথা উঁচু করে' বাঁচতে চান। ওসব কথা শুনে কাল আপনার লজ্জা হচ্ছিল না? রাগ হচ্ছিল না? আপনার পৌরুষ বলে' কিছু নেই না কি! বিশ্বাস করি না আমি।"

"তা আছে। পৌরুষ আছে বৈ কি।"

"বেশ, তাহলে আসুন আমার সঙ্গে। আপনাকে প্রমাণ করতে হবে সেটা। আশা করি আমার উপর রাগ করছেন না?"

"তোমাকে বোঝাই কি করে'!"—গন্ধরাজ বিব্রত হলেন একটু—"তুমি খুব ভালো রাঁধতে পার। কাল মাংসের যে কোর্মাটি রেঁধেছিলে তা চমৎকার, খুব তৃপ্তি করে' খেয়েছি। এই সুযোগে ধন্যবাদটাও দিয়ে দিচ্ছি। তুমি ভালো রাঁধুনী, কিন্তু তুমি কি দেখ নি, আনাড়ী রাঁধুনীর হাতে ভালো মসলা, ভালো মাংস দিলেও তা সুখাদ্য হয় না, অখাদ্য হয়? তার হাতে পায়েস পুড়ে যায়, সন্দেশের পাক ঠিক হয় না। তরকারিতে নুনের বদলে সে চিনি দিয়ে ফেলে, গরম মসলার বদলে হলুদ। আমার অবস্থাও অনেকটা সেই রকম। আমার নাগালের মধ্যে মালমসলা বা উপকরণের অভাব নেই, কিন্তু রান্না অখাদ্য হয়েছে। আমি বার বার সুক্তুনিতে ঝাল আর অম্বলেতে ঘি দিয়ে ফেলেছি—"

"আমি অতশত বুঝতে চাই না। আমি জানি আপনি ভালো—সত্যি ভালো"—বলেই একটু লজ্জা পেয়ে গেল উত্তমা।

"আমি একটা কথা যদি বলি, তুমি রাগ করবে না তো"—

গন্ধরাজ মৃদু হেসে বললেন, "ভালো আমি নই, ভালো তুমি। তুমি চমৎকার—"

"আপনার সম্বন্ধে সবাই ওই কথাই বলে। মেয়েদের খোশামোদ করতে আপনি খুব পটু।"

"ভুলে যেও না, আমি প্রৌঢ় প্রবীণ লোক। কি বলছ!"

গন্ধরাজের চোখে মুখে চাপা-হাসি চিকমিক করতে লাগল।

"সত্যি কথা বলব? রাগ করবেন না তো? আপনি প্রবীণ তো ননই, আপনি একটি দুষ্টু ছেলে। রাজা হোন বা যাই হোন, আমার রান্নাঘরে যদি আপনি আমাকে বিরক্ত করতে আসতেন আমি আপনাকে খুনতির ছেঁকা দিয়ে দিতাম। ওমা, কি সব বলছি আমি! রাগ করলেন মহারাজ? কিন্তু আমি যে মনের কথা চেপে রাখতে পারি না—"

"আমিও পারি না"—গন্ধরাজ বললেন—"এই জন্যেই তো সবাই গাল দেয় আমাকে"

মনে হ'তে লাগল ওরা যেন প্রণয়ী-প্রণয়িনী। একটু অবশ্য তফাত ছিল, ওরা ফিসফিস করে' কথা বলছিল না। জলপ্রপাতের ঝরঝর শব্দের জন্য বেশ চেঁচিয়ে চেঁচিয়েই কথা বলতে হচ্ছিল। কিন্তু পাহাড়ের উপর থেকে কেউ যদি দেখতে পেত তাহলে ওদের এই ঘনিষ্ঠতা দেখে সন্দেহ হ'ত তার। হয়তো একটুও রাগও হ'ত। উপরের একটা ঝোপের আড়াল থেকে হঠাৎ কে যেন চীৎকার করে' উত্তমার নাম ধরে' ডাকতে লাগল। উত্তমার কান দুটো লাল হ'য়ে উঠল লজ্জায়। "নন্দী ডাকছে। আমি যাই—"

"যাও। আমার সম্বন্ধে ভয় আশা করি ভেঙে গেছে। আমি যে ভয়ংকর কিছু একটা নই তা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়।"

তারপর দু'হাত তুলে তিনি বিদায়-অভিনন্দন জানালেন তাকে অনেকটা থিয়েটারি ভঙ্গীতে। উত্তমা হরিণীর মতো লাফিয়ে লাফিয়ে উপরে উঠে গেল এবং উপরের ঝোপটায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল একটু

পরেই। অদৃশ্য হবার ঠিক আগেই হাসিমুখে ফিরে চাইল একবার, তারপর মাথার ছোট্ট একটা ঝাঁকানি দিয়ে ঢুকে পড়ল ঝোপে। হাসিমুখে চাইল তার কারণ আবার সে ভুলে গিয়েছিল যে তাদের অতিথি সামান্য লোক নন—গর্জনগ্রামের অধীশ্বর গন্ধরাজ।

গন্ধরাজ আবার তাঁর অন্তরীপে ফিরে গেলেন। তাঁর মেজাজের রংটা বদলে গিয়েছিল একটু। বেলা বাড়াতে জলাশয়ের উপর রোদ পড়েছিল, তার বাদামী রঙের উৎসারিত জলরাশির উপর প্রতিফলিত হয়েছিল নীল আকাশ আর দেওদার গাছের বাসন্তী-মহিমা-মণ্ডিত পত্র-পল্লবের অপূর্ব কারুকার্য। মনে হচ্ছিল যেন আরব্যউপন্যাসের কোন পসারিণী গহনার পসরা মেলে ধরেছে সামনে। আবর্তের তরঙ্গে তরঙ্গে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল বিচিত্র বর্ণ-হিল্লোল। উপত্যকার এই অপূর্ব সৌন্দর্য দেখে মনটা করকর করছিল গন্ধরাজের। জায়গাটা তাঁর রাজ্যের এত কাছে, অথচ রাজ্যের ভিতরে নয়, ঠিক বাইরে। তাঁর নিজের রাজ্যে এরকম হাজার হাজার সুন্দর জায়গা আছে, কিন্তু তাদের সম্বন্ধে তাঁর কোন মোহ নেই। কিন্তু যেহেতু এ জায়গাটা তাঁর রাজ্যের সীমার বাইরে, যেহেতু এটা অপরের সম্পত্তি, তাই তাঁর মনে কেমন যেন একটু ঈর্ষা জাগল, কেমন যেন একটা শিল্পীসুলভ ঈর্ষা। মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে অন্যমনস্ক হ'য়ে এই মৃদু ঈর্ষার পীড়া ভোগ করছিলেন তিনি। কীর্তিভূষণ আসাতে একটু আরাম বোধ করলেন।

"আশা করি গরীবের কুঁড়ে ঘরে ঘুমুতে আপনার কষ্ট হয় নি কাল রাত্রে"—প্রথমেই বললেন কীর্তিভূষণ।

একথার জবাব না দিয়ে গন্ধরাজ বললেন—"আপনার এই সুন্দর স্থানটির শোভা আমি উপভোগ করছি ভোর থেকে। আপনি এই জায়গায় থাকেন, আপনি সৌভাগ্যবান।"

"হ্যাঁ, সুন্দর বটে, কিন্তু জংলী জায়গা। তবে এখানকার জমিটমিগুলো ভালো। পশ্চিমদিকের জমিগুলো খুব উর্বরা।

ওদিকে যদি যান আমার গমের ক্ষেতটা দেখবেন। গর্জনগাঁও বা ভৈরঙ্গী কোথাও আপনি রঙ্গিলা খামারের জোড়া পাবেন না। কোথাও বারো আনা ফসল ফলে, কোথাও বা চোদ্দ আনা। ষোল আনা ফলে এমন জায়গাও আছে দু'একটা। কিন্তু আমার কত ফলে জানেন? বিশ আনা! অন্য জায়গার জমি যে খারাপ তা নয়, কিন্তু সবাই জমির পিছনে খাটে না। খাটা চাই—"

"নদীতে মাছ আছে নিশ্চয়—"

"হ্যাঁ, ওই যেখানটায় জল জমেছে ওটা তো মাছে ভরতি। জায়গাটা সময় কাটাবার পক্ষে চমৎকার। রঙ্গিলার কলকল শব্দ, চারদিকে সবুজ গাছপালা আর পাহাড়। আর দেখেছেন, পাথরের নুড়িগুলো যেন নানারঙের দামী পাথর! সময় কাটাবার পক্ষে খুব ভালো জায়গা। কিন্তু একটা কথা বলছি, মাপ করবেন। আপনার যা বয়স এখন বাতের সম্বন্ধে সাবধান হওয়া উচিত আপনার। তিরিশ আর চল্লিশ বছরের মধ্যেই বাতের শুরু হয়। সাবধান না হলেই পেড়ে ফেলবে শেষে। এ জায়গাটা চমৎকার সন্দেহ নেই, কিন্তু বড্ড স্যাঁতসেঁতে। খালি পেটে এত সকালে এখানে বসে' থাকা ঠিক নয়। যদি আপত্তি না থাকে, চলুন এবার আমার সঙ্গে—"

"না, না, আপত্তি কি। চলুন। সত্যি জায়গাটি সুন্দর। আপনার সারাজীবন কি এখানে কেটেছে?"

চলতে চলতে প্রশ্ন করলেন গন্ধরাজ।

"আমি এখানে জন্মেছি। আর এখানে মরতেও চাই। কিন্তু সব ইচ্ছা তো পূর্ণ হয় না। অদৃষ্টই চালক, সে যেখানে নিয়ে যাবে সেইখানেই যেতে হবে। সবাই বলে অদৃষ্ট না কি অন্ধ, কিন্তু আশা করি একেবারে অন্ধ নয়, আশা করি খানায় খন্দে ফেলে দেবে না আমাকে। আমার ঠাকুরদা, আমার বাবা আর আমি—আমরা এখানকার জমি চষেছি। আমার লাঙলের দাগ, তাদের লাঙলের দাগকে অনুসরণ করেছে। আমাদের বাগানের বেঞ্চিটায় তিনজনের

নামই খোদাই করা আছে—কর্মভূষণ, ধর্মভূষণ আর কীর্তিভূষণ। কর্মভূষণ আর ধর্মভূষণ ওই বাগানেই দেহ রেখেছেন। বাবার একটা ছবি আমার খুব মনে আছে এখনও। রাত্রে একটা কালো টুপি পরে' একটা লম্বা চুরুট ধরিয়ে তিনি চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন। সেই শেষবারের মতো দেখছিলেন। হঠাৎ আমাকে বললেন—"কীর্তি চুরুটের ধোঁয়াটা দেখছিস? মানুষের জীবনও ওই ধোঁয়ার মতো!" ওই তাঁর জীবনের শেষ চুরুট খাওয়া। আমার মনে হয় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সেটা। সমস্ত ফেলে চলে' যাওয়া—অদ্ভুত ব্যাপার এটা। যে গাছ তিনি নিজের হাতে পুঁতেছিলেন, যে ছেলেকে তিনি মানুষ করেছিলেন, যে চুরুট তিনি নিজের হাতে তৈরি করে' খেতেন, যেখানে তাঁর প্রথম যৌবন প্রথম প্রেম ফুলের মতো ফুটেছিল—এই সব ছেড়ে চিরদিনের মতো চলে' যাওয়া—আশ্চর্য, নয়? কিন্তু এই তো ভবিতব্য। এর পর কি আছে কে জানে। অনন্ত স্বর্গ? কে জানে সত্যি তা কোথাও আছে কি না। বিশ্বাস করতে অবশ্য ভালো লাগে, খুবই ভালো লাগে। কিন্তু অপরিচিত জায়গায়, অচেনা খাটে শুয়ে মরতে ভালো লাগে না আমার। যে পরিবেশে জীবন আরম্ভ করেছিলাম সেই পরিবেশেই তা শেষও করতে চাই—"

"করবেনই তো। করবার বাধাটা কোথায়?"

"বাধা আছে। দশ হাজার টাকা দাম উঠেছে। দু' হাজার টাকা হ'লে মেরে কেটে আমিই কিনে ফেলতে পারতুম, না বড়াই করছি না, দু' হাজার টাকা আমি যোগাড় করতে পারতুম নিশ্চয়। কিন্তু দশ হাজার টাকা পারব না। নতুন জমিদার যিনি হবেন তিনি যদি আমাকে উচ্ছেদ করতে চান তাহলে পোঁটলাপুঁটলি গুটোতেই হবে আমাকে। গত্যন্তর নেই।"

এই সংবাদে গন্ধরাজ উল্লসিত হলেন মনে মনে। জায়গাটা তাঁর ভালো লেগেছিল, এ সংবাদ শুনে আরও ভালো লেগে গেল।

যা তিনি কাল শুনলেন তা যদি সত্যি হয় তা হলে গর্জনগ্রামে তো তিনি টিকতে পারবেন না। রাজবংশের উত্তরাধিকারীকে তো আর আমোলই দেবে না কেউ। গণতন্ত্র স্থাপন করতে ব্যগ্র হ'য়ে উঠেছে সবাই। সুতরাং তাঁকে অন্য একটা আশ্রয় খুঁজতে হবে। তাই যদি হয় তাহলে এ জায়গাটার চেয়ে ভালো জায়গা আর কোথায় পাবেন তিনি? কীর্তিভূষণকে তাঁর ভালোও লেগেছিল। তাছাড়া প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই মহত্ত্ব আস্ফালন করবার লোভ থাকে একটা। যে লোকটি কাল রাত্রে তাঁর অত নিন্দা করছিল তাকে তিনি যদি এই বিপদ থেকে বাঁচাতে পারেন তাহলে একটা মহৎ প্রতিশোধও নেওয়া হবে। কথাটা মনে হয়েছে বলে' নিজের উপরই তাঁর শ্রদ্ধা বেড়ে গেল যেন।

"দেখুন, আমি একজন ভালো খরিদ্দার যোগাড় করে' দিতে পারি, সে আপনাকে উচ্ছেদ করবে না। আপনি যেমন আছেন তেমনই থাকবেন।"

"পারেন না কি! সত্যি! তাহলে তো বেঁচে যাই আর কেনা গোলাম হ'য়ে থাকি আপনার। সারা জীবন ঈশ্বরের উপরই বিশ্বাস করে' এসেছি—শেষ জীবনে হতাশ হ'য়ে পড়েছিলাম। মনে হচ্ছিল সবই বৃথা হল।"

"আপনি দলিলপত্র ঠিক করতে বলুন। সে দলিলে এটাও লিখিয়ে নিতে পারেন যে আপনার জীবদ্দশায় ক্রেতা আপনাকে উচ্ছেদ করতে পারবেন না।"

"কিন্তু তার পর? আপনার বন্ধু কি নন্দীর সম্বন্ধে কিছু করতে রাজি হবেন?"

"নন্দী তো এখন ছেলেমানুষ। সে আগে তার যোগ্যতা প্রমাণ করুক—"

"নন্দী আমার সঙ্গে বরাবর কাজ করেছে। সমস্ত কাজকর্ম ওর নখদর্পণে। আমি বুড়ো হয়েছি তো, আসছে বৈশাখে আটাত্তর

বছরে পড়ব। আমার মৃত্যুর পর নূতন মালিকের পক্ষে আবার নূতন লোক খোঁজা কি সহজ হবে? আমার মৃত্যুর পর নন্দীই যদি এখানে থাকে তাহলে আমি শান্তিতে মরতে পারব। যিনি নূতন মালিক হবেন তিনি যদি পুরুষানুক্রমে আমাদের এ খামারে কাজ করবার অনুমতি দেন তাহলে ক্ষতি কি।"

"নন্দীর মতি-গতি কিন্তু ভালো নয়। কেমন যেন একটু উচ্ছৃঙ্খল উদ্ধত গোছের—"

"যিনি কিনবেন তিনি হয়তো—"

ঈষৎ ক্রোধের রক্তিমা ফুটে উঠল গন্ধরাজের গালে।

"আমিই কিনব—"

খুব ঝুঁকে অভিবাদন করে' বৃদ্ধ সসম্ভ্রমে বললেন—"সে কথা আমার ভাবা উচিত ছিল। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। এই বুড়োর মনের ভার নামিয়ে দিলেন আপনি। কাল যে আমি একজন দেবদূতকে অতিথিরূপে পেয়েছিলাম তা ভাবি নি। পৃথিবীতে যারা বড় লোক—মানে যারা পদস্থ লোক—তারা যদি আপনার মতো উদার হ'ত তাহলে গরীবদের ঘরে ঘরে আনন্দের বান ব'য়ে যেত—"

"বড় লোকদের সম্বন্ধে রূঢ় হ'তে আমি চাই না। দুর্বলতা কার নেই?"

"তা তো ঠিকই, তা তো ঠিকই। আমার নূতন জমিদারকে কি নামে আমি ডাকব?"

গন্ধরাজের মনে পড়ল তাঁর রাজসভায় এক সপ্তাহ আগে একটি বাঙালী পর্যটক এসেছিলেন, আর যৌবনে 'অংশুমালী' নামে একটি দুষ্টপ্রকৃতির বাঙালীর সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল তাঁর।

বললেন—"আমার নাম অংশুমালী। আমি একজন বাঙালী পর্যটক। আজ মঙ্গলবার, আগামী বৃহস্পতিবারে দুপুরের আগেই টাকাকড়ি নিয়ে আমি প্রস্তুত থাকব। পার্বতী'তে শুকতারা নামে

যে সরাইটা আছে, সেইখানেই আসুন আপনি, যদি আপনার অসুবিধা না হয়—”

“না, না, কিছুমাত্র অসুবিধা নেই। আপনি যেখানে হুকুম করবেন সেইখানেই যাব। বে-আইনী কাজ ছাড়া আর সব কাজ করতে আমি প্রস্তুত। আপনি বাঙালী? মস্ত জাত বাঙালী। বাঙালী পাল রাজারা পৃথিবীখ্যাত। বাঙালী পর্যটকরাও পৃথিবীর সর্বত্র গেছেন। আপনি বাঙালী! আচ্ছা, জমি সম্বন্ধে আপনার কোনও অভিজ্ঞতা আছে তো—”

“আগে ছিল কিছু কিছু”—গন্ধরাজ হেসে উত্তর দিলেন—“কিন্তু ওই যে আপনি বললেন অদৃষ্টই চালক। এখন এখানে এসে পড়েছি, দেখি এখানে যদি কিছু সুবিধা করতে পারি। সবই ভগবানের হাত—”

“নিশ্চয়। সে কথা আর বলতে—”

চিন্তিতমুখে দুজনেই পাশাপাশি হাঁটতে লাগলেন। গোলা-বাড়ির কাছাকছি এসে পড়েছিলেন তাঁরা, জাফরি দেওয়া রাস্তাটা ধরে' উপরে উঠছিলেন। একটু উপরে কাদের কথাবার্তার শব্দ অস্পষ্টভাবে শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। তাঁরা যতই উপরে উঠতে লাগলেন ততই স্পষ্ট হ'তে লাগল সেটা। একটু পরে তাঁরা উপরে উঠে পড়লেন। দেখা গেল দূরে উত্তমা আর নন্দী রয়েছে। নন্দীর চোখ লাল, মুখ কালো, সে চীৎকার করে' কর্কশকণ্ঠে কি যেন বলছে নিজের প্রসারিত করতালের উপর ঘুষি মেরে মেরে আর একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে উত্তমা, তারও মুখ লাল, সে-ও অনর্গল কি সব বলে' চলেছে। তার বেশবাস বিস্রস্ত, চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত।

“কি কাণ্ড!”—কীর্তিভূষণ সেখান থেকে চলে' যাওয়াই উচিত মনে করে' অন্যদিকে মুখ ফেরালেন।

কিন্তু গন্ধরাজ সোজা চলে' গেলেন প্রণয়ীযুগলের দিকে। ঝগড়ার কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এবং ঝগড়ার মূল যে তিনিই এটাও

অনুমান করে' নিতে বিলম্ব হয় নি তাঁর। গন্ধরাজকে দেখেই নন্দী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, একটা মৌন প্রতিবাদ আর বিদ্রোহ যেন মূর্ত হ'য়ে উঠল তার সর্বাঙ্গে।

"ও আপনি এসে গেছেন!"—চীৎকার করে' বলে' উঠল সে—"আপনি ভদ্রলোক, আশা করি আপনি আমার কথার ভদ্র জবাব দেবেন একটা। ওখানে কি করছিলেন আপনারা? ঝোপের ধারে লুকিয়ে লুকিয়ে কি করা হচ্ছিল! ছি, ছি, ছি"—হঠাৎ উত্তমার দিকে ফিরে সে বলল—"কি কুক্ষণেই যে তোমাকে আমি ভালবেসে-ছিলাম। তুমি এই তা যদি জানতাম—"

"শুনুন"—গন্ধরাজ বাধা দিলেন—"আমার সঙ্গে কথাটা আগে শেষ করে' নিন। আপনি আমার কাছে এই মেয়েটির আচরণ সম্বন্ধে জানতে চাইছেন। জিজ্ঞাসা করতে পারি কি কোন অধিকারে চাইছেন? আপনি কি ওর বাবা, না দাদা, না স্বামী?"

"ওর সঙ্গে আমার যে কি সম্পর্ক তা সবাই জানে, আপনিও হয়তো আন্দাজ করেছেন। ও আমার সঙ্গিনী, ওকে আমি ভালবাসি আর আমার ধারণা আমাকেও সম্ভবত ভালবাসে ও। জানি না, ব্যাপারটা এখন গোলমেলে ঠেকছে। আমি সেটা ওর সামনেই স্পষ্ট করে' নিতে চাই। আমারও আত্মসম্মান বলে' একটা জিনিস আছে—"

গন্ধরাজ বললেন, "তাহলে প্রেম কি সেটা আপনাকে বোঝানো দরকার। মমতাই হচ্ছে প্রেমের মাপ-কাঠি। আপনার আত্মসম্মান আছে বলছেন, কিন্তু ওরও আত্মসম্মান আছে হয়তো। আমি নিজের স্বপক্ষে কিছু বলব না। তবে একটা কথা জেনে রাখুন আপনার সব আচরণও যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করা যায় আপনি বেকাদায় পড়ে' যাবেন।"

"দেখুন, এসব তুলনার কোনও মানে হয় না"—নন্দী একটু উদ্ধত ভাবেই বলল—"আমি পুরুষ আর ও মেয়েমানুষ। আমাদের দুজনের

ওজন এক নয়। পুরুষ চিরকালই শ্রেষ্ঠ আছে এবং থাকবে। এর অন্যথা কোনও কালে হবে না। হবে কি? দিন, এবার আমার কথার জবাব।"

"মানব-সভ্যতার সম্বন্ধে আর একটু জ্ঞান থাকলে আপনার মত বদলে যেত। ওজনের কথা বলছিলেন? একটা কথা আপনি ভাবেন নি যে ভুয়ো বাটখারা দিয়ে আপনি আপনার ওজন বাড়িয়েছেন। নানারকম বাটখারা ব্যবহার করেন আপনারা। মেয়েদের জন্যে একরকম বাটখারা, পুরুষদের জন্যে আর একরকম। রাজা-রাজড়াদের জন্যে একরকম বাটখারা, গরীব-গুরবোদের জন্যে আর একরকম। গন্ধরাজ তাঁর স্ত্রীর সম্বন্ধে উদাসীন, তাঁর সমালোচনায় আপনি পঞ্চমুখ। কিন্তু প্রণয়ী যদি প্রণয়িনীকে অপমান করে সে সম্বন্ধে আপনি কি বলবেন? আপনি ভালবাসা কথাটা বললেন। এ মেয়েটি আপনার মতো লোকের ভালবাসার কবল থেকে যদি মুক্তি পেতে চায় তাহলে খুব অন্যায় হবে কি সেটা? আমি একজন বিদেশী, আপনি ওর সঙ্গে বর্বরের মতো যে ব্যবহার করেছেন, আমি যদি তার শতাংশের একাংশও করতাম তাহলে আপনি আমার মাথা ফাটিয়ে দিতেন। আর ঠিক কাজই হ'ত সেটা, প্রণয়ী হিসাবে ওর মর্যাদা রক্ষা করা আপনার কর্তব্য। কিন্তু আমি বলছি আপনার কাছ থেকেই আগে বাঁচান ওকে। কারণ আপনার আচরণ ভদ্র নয়। ও মেয়েমানুষ বলেই ওকে অপমান করবার অধিকার আপনার নেই—"

"ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন"—বৃদ্ধ কীর্তিভূষণ মাথা নেড়ে নেড়ে সায় দিলেন—"শাস্ত্রও ওই কথা বলে"।

নন্দী একটু হক্‌চকিয়ে গিয়েছিল। গন্ধরাজের গম্ভীর অবিচলিত ব্যবহার তো ঘাবড়ে দিয়েইছিল তাকে, সে আরও ঘাবড়েছিল নিজের ব্যবহারের জন্য। সে যে অন্যায় করেছে এটা বুঝতে পেরেছিল সে। বিশেষ করে' মানব-সভ্যতার দোহাই দিয়ে গন্ধরাজ যা বললেন তা

মর্ম স্পর্শ করেছিল তার, সে সহসা যেন উপলব্ধি করল যদিও সে নিজেকে এতদিন সভ্য বলে' মনে করে' আত্মপ্রসাদ লাভ করে' এসেছে কিন্তু মানব-সভ্যতার ধারে কাছেও যেতে পারে নি সে।

"আমি যদি অন্যায় করে' থাকি স্বীকার করব সেটা"—নন্দী বলল—"তবে আমি বেদস্তুর কিছু করি নি। তবে এ কথাও আমি বলব ওই সব সেকেলে ছ্যাঁচড়ামিও আমি পছন্দ করি না। আমি যদি রূঢ় আচরণ করে' থাকি, ক্ষমা চাইছি সেজন্য—"

"হয়েছে, হয়েছে, খুব হয়েছে—" বলে উঠল উত্তমা।

"কিন্তু আমি যা জানতে চাইছি তা তো তুমি বললে না। তোমরা ওখানে কি কথা বলছিলে সেইটেই আমি জিগ্যেস করছি। ও বলছে আপনার কাছে না কি ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সে কথা কাউকে বলবে না। কিন্তু আমি জানতে চাই সেটা। ভদ্রতার মান অবশ্যই আমি রাখব, কিন্তু ছলচাতুরী আমি সহ্য করব না। দুজনকে যদি একসঙ্গে থাকতে হয় তাহলে ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় চলবে না।"

গন্ধরাজ বললেন, "বেশ, আপনার বাবাকে জিগ্যেস করলেই বুঝতে পারবেন সব। আমি বাজে সময় নষ্ট করছিলাম না। আজ সকাল বেলা উঠেই আমি ঠিক করেছি যে এই রঙ্গিলা খামার আর তার আশপাশের জমি জায়গা আমি কিনে নেব। এরকম অশোভন কৌতূহলকে আমি প্রশ্রয় দিই না, আপনার খাতিরে এইটুকু বললুম শুধু—"

"ও, আপনি বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন? তাহলে অবশ্য আলাদা কথা সেটা। কিন্তু এতে গোপন করবারই বা কি আছে তা-ও বুঝতে পারছি না। তবে আপনি যদি আমাদের খামারের মালিক হন তাহলে অবশ্য আপনার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে চাই না।"

"নিশ্চয়ই না" দৃঢ়কণ্ঠে বলে' উঠলেন কীর্তিভূষণ।

উত্তমা এবার রুখে উঠল। বিজয়িনীর মতো বললে—"এইবার শুনলে তো? কি বলেছিলাম আমি তোমাকে? বলেছিলাম যে তোমাদের জন্যেই আমি অনুরোধ করেছিলাম ওঁকে। এবার শুনলে তো? কি জঘন্য সন্দেহবাতিক তোমার। ছি, ছি, ছি। তোমার উচিত ওঁর কাছে আর আমার কাছে হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চাওয়া।"

চার

দুপুরের একটু আগে গন্ধরাজ কৌশলে সরে' পড়লেন রঙ্গিলা খামার থেকে। কীর্তিভূষণের সাড়ম্বর উচ্ছ্বাস এবং উত্তমার গোপন কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন এড়িয়ে গা ঢাকা দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি, কিন্তু নন্দীকে অত সহজে এড়াতে পারলেন না। এই চতুর ছোকরাটির মনে সম্ভবত কোনও সন্দেহ জেগেছিল। সে বললে, "চলুন আমি আপনাকে কিছুদূর এগিয়ে দিই।" গন্ধরাজ 'না' বলতে পারলেন না। তাঁর মনে হ'ল 'না' বললে উত্তমার সম্পর্কে যে ঈর্ষা আর সন্দেহ তার মনে জেগেছে সেটা বেড়ে যাবে হয়তো। কিন্তু ওর সঙ্গটা পছন্দ করছিলেন না তিনি মোটে। নন্দী কিছুক্ষণ নীরবে তাঁর ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে চলল। অনেক দূর গিয়ে একটু ইতস্তত করে' আত্মপ্রকাশ করল সে অবশেষে।

"আপনি কি একজন বিদ্রোহী ?"

"না। বিদ্রোহী কেন হ'তে যাব। একথা মনে হচ্ছে কেন আপনার।"

"গোড়া থেকেই আপনার কথাবার্তা থেকে তাই মনে হচ্ছিল। ওই বুড়োর ভয়েই আপনি মুখ খোলেন নি। আভাসে ইঙ্গিতে কথা বলছিলেন। ঠিকই করেছেন: বুড়োরা প্রায়ই ভীতু হয়, সেকেলে ধরনধারণ নিয়মকানুনই আঁকড়ে থাকতে চায় তারা। কিন্তু আজকাল কে যে ঠিক কোন দলের তা-ও তো বোঝা কঠিন, বিদ্রোহের পথে কে যে কতটা অগ্রসর তা প্রথম প্রথম বোঝবার উপায় থাকে না। আমিও প্রথমটা ধরতে পারি নি আপনাকে, কিন্তু আপনি যখন মেয়েদের কথা আর স্বাধীন প্রেমের কথা বললেন তখনই আপনাকে চিনে ফেললাম।"

"কই না"—গন্ধরাজ বললেন—"ওসব কথা তো আমি বলি নি।"

"বলেন নি! বুঝতে পেরেছি। ধরা-ছোঁওয়া দিতে চান না। কেবল বীজ ছড়িয়ে দিয়ে চলে' যেতে চান। আমাদের দলপতি ওকে 'বীজ-টোপ' বলেন। ঠিকই করেছেন। কিন্তু আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া শক্ত, আমি নানা দলের সঙ্গে পরিচিত, তাদের মতামত ধরনধারণও জানি।" তারপর নিম্নকণ্ঠে সে বললে—"আপনাকে বলতে বাধা নেই, আমিও গুপ্ত-সমিতির একজন সভ্য। এই দেখুন আমার পদক।" সে সবুজ-ফিতে-দিয়ে-বাঁধা একটা দস্তার পদক বার করল। তার গলায় ঝোলানো ছিল সেটা। গন্ধরাজ দেখলেন তার একদিকে আঁকা রয়েছে একটি কোষমুক্ত কৃপাণ আর একদিকে লেখা রয়েছে—"গণ-স্বাধীনতা"।

"এখন আশা করি আর আপনার সন্দেহ নেই। আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। শরাইখানায় যারা মদের ঝোঁকে রাজা-উজীর মারে, আমি তাদের দলের নই। আমি একজন খাঁটি বিদ্রোহী।"

উদ্ভাসিত দৃষ্টি তুলে সে চাইল গন্ধরাজের দিকে।

"ও তাই বুঝি"—গন্ধরাজ একটু বিস্ময়ের ভান করে' বললেন—"বাঃ, বাঃ, খুব আনন্দের কথা। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে। দেশের ভালো করতে হ'লে আগে নিজে ভালো হ'তে হবে। ওইটেই প্রথম এবং প্রধান কাজ। আপনি ঠিকই ধরেছেন, রাজনীতি নিয়েই আমি মাথা ঘামাই, কিন্তু আমি নেতা হ'তে পারি নি, কারণ আমার মেজাজ, আমার বুদ্ধি নেতা হওয়ার মতো নয়। হয়তো উপনেতা হ'তে পারতুম, কিন্তু তা-ও হয়েছি কিনা জানি না। কিন্তু তবু আমাদের প্রত্যেককেই কিছু না কিছু শাসন করতেই হয়, নিজের মন-মেজাজকে নিজের চরিত্রকে শাসন করাও কম কাজ নয়। বিশেষ ক'রে যে লোক বিয়ে করবে ঠিক করেছে তার তো এ বিষয়ে কড়া নজর রাখা দরকার। রাজার পদই বলুন আর স্বামীর পদই বলুন—দুটোই কৃত্রিম ব্যাপার। কড়া শাসন না করলে কোন পদই

বজায় রাখা যায় না। একটু ঢিলে দিলেই মুশকিল। বুঝতে পারছেন আমার কথা।"

"হ্যাঁ পারছি বই কি।"

নন্দী কিন্তু এ ধরনের উত্তর আশা করে নি। মনে মনে একটু হতাশ হ'য়ে পড়ল বেচারা। তার পর আবার একটু সাহস সঞ্চয় করে' জিজ্ঞাসা করল—"আপনি যে রঙ্গিলা খামার কিনছেন, এখানে দুর্গটুর্গ করবার ইচ্ছে আছে না কি!"

"এখনও ঠিক করি নি কিছু"—হেসে ফেললেন গন্ধরাজ—"খুব বেশী উত্তেজিত হবেন না এ নিয়ে। আর এ নিয়ে কাউকে কিছু বলবেন না। এ সব চাউর হওয়া ঠিক নয়।"

"আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন"—গন্ধরাজ তাকে যে স্বর্ণমুদ্রাটি দিলেন সেটি ট্যাঁকে গুঁজে সোৎসাহে বলে' উঠল সে—"তাছাড়া আপনি কিছুই তো বলেন নি এখনও। আমি কেবল আন্দাজ করেছি, আর মনে হয় আমার আন্দাজ ভুল হয় নি। একটা কথা মনে রাখবেন এ অঞ্চলের জঙ্গলে পাহাড়ে ছোট বড় যত পথ আছে সব আমার নখদর্পণে। সে বিষয়ে আমি আপনাকে খুব সাহায্য করতে পারব।"

মনে মনে একটু হেসে অশ্বের গতিবেগ বাড়িয়ে দিলেন তিনি। নন্দার কথাবার্তা খুব ভালো লেগেছিল তাঁর। রঙ্গিলা খামারের অন্য লোকজনদেরও মন্দ লাগে নি। ওরা এর চেয়ে খারাপ ব্যবহারও তো করতে পারত! এ অবস্থায় খারাপ ব্যবহারই তো প্রত্যাশিত ছিল। মনের আনন্দে তিনি এগিয়ে যেতে লাগলেন, আর তাঁর মনের সুরের সঙ্গে বাসন্তী প্রকৃতি আর আঁকা-বাঁকা পাহাড়ী রাস্তাও যেন সুর মেলাতে লাগল।

এঁকে বেঁকে চড়াই উতরাই পার হ'য়ে পার্বত্য অরণ্যভূমির ভিতর দিয়ে চওড়া রাজপথ এগিয়ে গিয়েছিল গর্জনগাঁওয়ের দিকে। পথের দু'ধারে দেওদারশ্রেণী নীরবে দাঁড়িয়েছিল, সবুজ শ্যাওলার

সমারোহ নন্দিত করছিল দৃষ্টিকে, মাঝে মাঝে রুক্ষ পাহাড়ের বুক ভেদ ক'রে নামছিল ঝরনাধারা। দেওদার গাছ নানা বয়সের, নানা আকারের। কেউ মহীরুহ, কেউ যেন লাবণ্যময় কিশোর, কেউ আবার আরও সরু—কিন্তু সবাই নীরবে একই ভঙ্গীতে দাঁড়িয়েছিল, মনে হচ্ছিল এক বিরাট সেনা-বাহিনী রাজাকে যেন নীরবে অভিবাদন জানাচ্ছে।

রাজপথ দু'পাশের শহর এবং গ্রামকে একটু দূরে রেখেই এগিয়ে চলেছিল। একটু দূরে এখানে-ওখানে, কখনও বা অনেক নীচের কোনও উপত্যকায় গন্ধরাজ দেখতে পাচ্ছিলেন ছাতের সারি, কখনও বা অনেক উপরে—হয়তো কোনও পাহাড়ের কাঁধের উপর কাঠুরেদের কাঠের তৈরী ঘরও চোখে পড়ছিল। রাজপথ আন্ত-র্জাতিক ব্যাপার, তার লক্ষ্য দূরের শহরের দিকে, গর্জনগাঁওয়ের ছোট ছোট গ্রাম বা নগরের জীবনধারাকে অগ্রাহ্য করে' সে যেন চলেছিল দূরের দিকেই কেবল। তাই পথ খুব নির্জন। গর্জনগ্রামের সীমান্তে পৌঁছে গন্ধরাজ দেখতে পেলেন তাঁরই একটা সৈন্যদল ধূলো উড়িয়ে আসছে। গন্ধরাজকে দেখে তারা জয়ধ্বনি করল—গন্ধরাজের মনে হ'ল একটু ক্ষীণভাবেই করল যেন। গন্ধরাজ পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলেন। এর পর অনেকক্ষণ একাই রইলেন তিনি। পথের দু'ধারে প্রকাণ্ড বন ছাড়া আর কেউ সঙ্গী রইল না তাঁর।

তাঁর মনের প্রসন্নভাব কিন্তু বেশীক্ষণ রইল না। পোকার মতো ঝাঁকে ঝাঁকে চিন্তারাশি তাঁর মন জুড়ে বসল আর গতরাত্রে যা শুনেছিলেন তা যেন চড়-কিল-লাথির মতো আঘাত করতে লাগল তাঁকে এখন। সান্ত্বনার আশায় এদিক ওদিক চাইতে লাগলেন তিনি। দেখতে পেলেন একটু দূরে একটি উঁচু খাড়া পাহাড় থেকে সরু রাস্তা বেয়ে খুব সন্তর্পণে একজন অশ্বারোহী নাবছেন। মরুভূমিতে ঝরনা দেখলে যে আনন্দ হয় সেইরকম আনন্দ হ'ল গন্ধরাজের। মনে মনে একজন মানুষের কামনা করছিলেন তিনি।

গন্ধরাজ ঘোড়ার রাশ টেনে ধরে' অপেক্ষা করতে লাগলেন। লোকটি যখন কাছাকাছি এল তাখন গন্ধরাজ বুঝতে পারলেন লোকটি তাঁর রাজ্যেরই অধিবাসী একজন। লোকটির টক-টকে লাল মুখ, পুরু ঠোঁট। ঘোড়ার জিনের দু'ধারে জিনিসপত্রে ঠাসা দুটি থলি ঝুলছে আর কোমরে বাঁধা আছে একটি বড় বোতল। গন্ধরাজ যখন তাকে ডাকলেন তখন সে উৎফুল্লকণ্ঠে সাড়া দিলে বটে, কিন্তু গন্ধরাজের মনে হ'ল কণ্ঠস্বর একটু জড়িত। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে একটু টাল খেয়ে সামলে নিলে। গন্ধরাজ বুঝলেন মদ খেয়েছে।

"আপনি পার্বতীর দিকে যাচ্ছেন নাকি"—প্রশ্ন করলেন গন্ধরাজ।

"হ্যাঁ যাচ্ছি। কিন্তু জজ্ঘা পর্যন্ত। আপনি যাবেন আমার সঙ্গে?"

"হ্যাঁ। আপনার জন্যেই অপেক্ষা করে' ছিলাম। চলুন।"

পাশাপাশি চলতে লাগলেন দুজনে। সাধারণ লোকের যা স্বভাব লোকটি প্রথমেই গন্ধরাজের ঘোড়াটাকে তার ঝাপসা দৃষ্টি দিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। "আরে, চমৎকার ঘোড়াটি তো আপনার—বাঃ বাঃ"—তারপর সে দৃষ্টি ফেরাল গন্ধরাজের মুখের দিকে, ফিরিয়েই চমকে উঠল সে।

"মহারাজ!"

বলেই সে অভিবাদন করল এবং তা করতে গিয়ে আবার একবার টাল সামলাল।

"আপনাকে চিনতে পারি নি মহারাজ, ক্ষমা চাইছি।"

গন্ধরাজ একটু বিরক্ত হলেন। তাঁর মনের সাম্য যেন বিচলিত হ'ল একটু।

"আপনি যখন আমাকে চিনতে পেরেছেন তখন আমরা আর পাশাপাশি যেতে পারি না। আমি এগিয়ে যাচ্ছি, আপনি পিছু পিছু আসুন।"

তিনি এগোতে যাচ্ছিলেন কিন্তু ওই অর্ধ-মত্ত লোকটা এক কাণ্ড করে' বসল। একটু ঝুঁকে গন্ধরাজের ঘোড়ার লাগামটা ধরে' ফেলল সে।

"শুনুন, আপনি মহারাজা হোন আর যা-ই হোন, এমন অভদ্রতা করে' আপনাকে চলে' যেতে দেব না। আপনি ছদ্মবেশে আমার সঙ্গে যেতে চাইছিলেন, বোধহয় আমার মনের কথা বার করে' নেবার মতলব ছিল, কিন্তু যে-ই ধরা পড়ে' গেলেন অমনি এগিয়ে সরে' পড়তে চাইছেন। আপনি মহারাজা না গুপ্তচর?"

মদের ঝোঁকে আর আহত আত্মসম্মানের ক্ষোভে আরও লাল হ'য়ে উঠল লোকটার চোখ-মুখ। মনে হ'ল কথাগুলো সে যেন থুতুর মতো ছুঁড়ে দিল গন্ধরাজের মুখে।

একটু থতমত খেয়ে গেলেন গন্ধরাজ। বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়লেন। বুঝলেন তিনি ভুল করেছেন, তিনি যে 'মহারাজ' এ নিয়ে আস্ফালন করাটা অশোভন হয়েছে। তাছাড়া তাঁর ভয়ও হ'ল একটু। লোকটা বেশ বলিষ্ঠ আর ষণ্ডা, তাছাড়া মাতাল হয়েছে।

"আমার লাগাম ছেড়ে দিন"—শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন তিনি। একটা আদেশের সুর ধ্বনিত হ'ল তাতে। একটু অবাকও হলেন, লোকটি যখন সত্যিই লাগাম ছেড়ে দিলে।

"আপনার সঙ্গে পাশাপাশি যেতে আমার আপত্তি ছিল না, আপনি যদি বুদ্ধিমান ধীর স্থির লোক হতেন, তাহলে আপনার মুখ থেকে আমার সমালোচনা শুনলেও আমি খুশী হতাম, কিন্তু এখন আমাকে মহারাজা জেনে যে সব অসার চাটুবাক্য আপনি বলবেন তা শোনবার তেমন আগ্রহ নেই আমার।"

"আপনি কি মনে করেন আমি মিথ্যে কথা বলব?"

আরও লাল হ'য়ে উঠল তার মুখ।

"আমি জানি আপনি বলবেন"—এইবার আত্মস্থ হয়েছিলেন

গন্ধরাজ—"এ-ও জানি আপনি গলায় যে পদকটি ঝুলিয়ে রেখেছেন তা-ও আমাকে দেখাবেন না।"

গন্ধরাজ লোকটির গলায় সবুজ ফিতেটা দেখতে পেয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত পরিবর্তন হ'ল। বিবর্ণ হ'য়ে গেল তার মুখটা। মোটা মোটা আঙুল দিয়ে গলার ফিতেটা ঢাকবার চেষ্টা করল সে। নেশা ছুটে গেল।

"আমার কোনও পদক নেই।"

"বিশ্বাস করলাম না আপনার কথা, মাপ করবেন। আপনার পদকে কি আঁকা আছে তা-ও বলে' দিতে পারি—একদিকে একটা খোলা তলোয়ার আর এক দিকে 'গণ-স্বাধীনতা'। তাই না?"

লোকটি নির্বাক হ'য়ে রইল।

গন্ধরাজ হেসে বললেন—"আপনি অদ্ভুত লোক দেখছি। যাকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করছেন তার কাছ থেকে ভদ্রতা প্রত্যাশা করছিলেন!"

"হত্যা!"—প্রতিবাদ করে' উঠল লোকটা—"না, কখনও নয়। ওসব নোংরা কাজের মধ্যে আমি নেই।"

"ষড়যন্ত্র মানেই নোংরা কাজ, আইনত ওতে মৃত্যুদণ্ড হ'তে পারে। ধরা পড়লে মৃত্যুদণ্ড হবেই এতে কোনও সন্দেহ নেই। ঘাবড়াবেন না অত, কারণ আমি গোয়েন্দাবিভাগের লোক নই। কিন্তু এ ধরনের রাজনীতি করতে গেলে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে' দেখা উচিত। জানা উচিত এর পরিণাম কি হ'তে পারে—"

"মহারাজ—" কম্পিতকণ্ঠে শুরু করছিল লোকটা। কিন্তু গন্ধরাজ তাকে থামিয়ে দিলেন।

"মহারাজ? মহারাজ কথাটা তো আপনার মুখে মানাচ্ছে না। আপনি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, আপনার মুখে মহারাজ টহারাজ বেমানান নয় কি? চলুন যাওয়া যাক। আপনার যখন এত ইচ্ছে চলুন পাশাপাশিই যাই। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করছি আপনাকে।

শুনেছি আপনারা দলে বেশ ভারী, প্রায় পনর হাজার লোক আপনাদের দলে আছে। কথাটা সত্যি ?"

লোকটার গলায় একটা ঘড়-ঘড় শব্দ হ'ল শুধু।

"আপনারা দলে যখন এত ভারী তখন সোজা আমার কাছে এসে আপনাদের দাবী জানালেই পারতেন। আরও স্পষ্ট করে' বলছি, আমাকে আদেশ করলেই পারতেন। আপনাদের কি ধারণা আমি সিংহাসন আঁকড়ে থাকতে চাই ? মোটেই না। আপনাদের দল যদি সংখ্যা-গরিষ্ঠ হয় আমাকে দেখিয়ে দিন সেটা, আমি এখনই সিংহাসন ত্যাগ করছি। আপনাদের দলের লোকেরা আমার নানা দোষ দেখতে পেয়েছে, কিন্তু তাদের বলুন যে তারা এজন্য আমাকে যতটা দোষী করেছে তার চেয়ে অনেক বেশী দোষী করেছি আমি নিজেকে। তারা আমাকে রাজা হিসেবে যত অনুপযুক্ত মনে করে তার চেয়ে অনেক বেশী অনুপযুক্ত মনে করি আমি নিজে। আমি জানি ভারতবর্ষের মধ্যে আমি অতি ওঁছা রাজা। এর চেয়ে খারাপ ধারণা নিশ্চয়ই নেই তাদের। সিংহাসনের ঝামেলা পোয়াবার আমার ইচ্ছে নেই। আমি নির্বিবাদী লোক। আপনারা যদি গণতন্ত্র স্থাপন করতে চান করুন, আমার কিচ্ছু আপত্তি নেই।"

"না, না, আপনি এসব কি বলছেন। আমার দ্বারা—" আবার আরম্ভ করল লোকটা।

"কি কাণ্ড! আপনি আবার আমার দিকে হ'য়ে গেলেন নাকি" —সবিস্ময়ে বলে' উঠলেন গন্ধরাজ —"তাহলে শুনুন। ওসব ষড়যন্ত্র টড়যন্ত্র ছেড়ে দিন। দেখছি, আমার যেমন রাজা হওয়ার যোগ্যতা নেই আপনারও তেমনি চক্রান্ত করবার যোগ্যতা নেই।"

"একটা কথা শুনুন, সত্যি কথা এটা"—মরিয়া হ'য়ে বলে' ফেলল লোকটা—"আপনার উপর আমাদের ততটা রাগ নেই, আমাদের রাগ আপনার রাণীর উপর।"

"না, কোনও কথা শুনতে চাই না"—গন্ধরাজ থামিয়ে দিলেন

তাকে। তারপর একটু রাগতকণ্ঠে বললেন—"আমি আবার আপনাকে বলছি রাজনীতি আপনি ছেড়ে দিন। ওপথে চলবার যোগ্যতা আপনার নেই। আর এর পর যখন আপনার সঙ্গে দেখা হবে তখন আপনাকে মাতাল অবস্থায় যেন না দেখি। সকালে উঠেই যে মদ খায় আমার মতো হতভাগা রাজাকেও বিচার করবার যোগ্যতা নেই তার।"

"আমি বেশী খাই নি, ছ'এক ঢোঁক মাত্র খেয়েছি"—লোকটার চোখ মুখ উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠল হঠাৎ—"আর যদিও বা খেতাম তাতেই বা কি! কেউ কি আমার কথা ভাবে? আমার কারখানাটা বন্ধ হ'য়ে আছে। এর জন্যে দোষী কে জানেন? আপনার রাণী। আর শুধু কি আমারই কারখানা বন্ধ? ঘুরে ঘুরে জিগ্যেস করুন গিয়ে। দেখবেন সব ব্যবসা বন্ধ। যারা ব্যবসা চালায় তারা সব উধাও। বাজারে টাকা নেই। দেশটার যেন পক্ষাঘাত হয়েছে। কেন এমন হ'ল! কার দোষে এই অরাজকতা? আপনাদের। আপনাদের দোষের জন্যই আমরা মারা যাচ্ছি, আমরা গরীবরা। আমাদের দুঃখ আপনারা কি বোঝেন? মদ খাই বা না খাই একটা জিনিস কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারছি, দেশ উচ্ছন্ন যাচ্ছে আর কেন যাচ্ছে কার জন্যে যাচ্ছে তা-ও জানি। মাপ করবেন, মনের কথা সরল ভাবে বলে' ফেললুম—এর জন্য আমাকে যদি গারদে পুরতে চান, পুরুন। আপত্তি করব না। যা সত্য তাই বলেছি, আর সত্যকেই আঁকড়ে থাকব। আমি আর মহারাজকে বিব্রত করতে চাই না, যদি অনুমতি দেন এবার আমি যাই।"

ঘোড়ার লাগামটা টেনে ধরে' সে অভিবাদন করল গন্ধরাজকে, যদিও সেটা দেখতে শোভন হ'ল না তেমন।

"আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, আমি আপনার নাম ধাম জানতে চাই নি। আশা করি নির্বিঘ্নে আপনি আপনার ঠিকানায় পৌঁছে যাবেন। নমস্কার।"

লোকটা দ্রুতবেগে ঘোড়া চালিয়ে চলে' গেল।

গন্ধরাজ কিন্তু মুষড়ে পড়লেন মনে মনে। হারিয়ে দিয়ে গেল তাঁকে লোকটা, অপ্রস্তুত করে' দিয়ে গেল। প্রথমে তাঁর ভদ্রতার খুঁত ধরল, শেষে তাঁকে তর্কেও হারিয়ে চুপ করিয়ে দিলে। লোকটার প্রতি ঘৃণা হ'ল খুব, রাগও হ'ল। কিন্তু সত্যকে তিনি অস্বীকার করতে পারলেন না। হ্যাঁ, হেরে গেছেন তিনি! সমস্ত মন বিষিয়ে উঠল, একটু আগে যে সব তিক্ত চিন্তা মনে জাগছিল, আবার তারা যেন ভিড় করে' আসতে লাগল। অপরাহ্ণে একটা চৌরাস্তার মোড়ে পৌঁছে ঠিক করলেন রোহিণীর দিকে যাবেন। সেইখানেই খাওয়া-দাওয়া করবেন। পথ চলতে আর ভালো লাগছিল না তাঁর।

রোহিণীর এক পান্থশালায় ঢুকেই তিনি দেখতে পেলেন একটি যুবক আহারে ব্যাপৃত রয়েছেন যদিও, কিন্তু তাঁর সামনে একটি বই খোলা রয়েছে। খেতে খেতে পড়ছেন তিনি। যুবকটির চোখেমুখে বুদ্ধির দীপ্তি দেখে ভালো লাগল তাঁর। যুবকটির পাশেই তাঁকে খেতে দেওয়া হ'ল। তিনি আলাপ করবার জন্যেই প্রশ্ন করলেন, "কি বই পড়ছেন অত মন দিয়ে?"

"এটা? পার্বতীর রাজপাঠাগারের অধ্যক্ষ এবং গর্জনগাঁওয়ের মহারাজা গন্ধরাজের খুল্লতাতপুত্র ইন্দীবর ভারতীর লেখা বই এটা। এটাই তাঁর শেষ বই। তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি বিরাট পণ্ডিত, কিন্তু নীরস নন। রসের নানা পরিচয় আছে তাঁর রচনায়।"

"ইন্দীবর ভারতীর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে"—ভদ্রভাবে বললেন গন্ধরাজ—"কিন্তু তাঁর কোন বই আমি পড়ি নি।"

"ও। তাহলে তো আপনি মহাসৌভাগ্যবান। তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখেছেন এটা একটা সৌভাগ্য। পরোক্ষে আর একটা সৌভাগ্য অপেক্ষা করছে যখন তাঁর বইগুলো পড়বেন—"

"ইন্দীবর ভারতীকে তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্যে সবাই খুব খাতির করেন, নয়?"

"বুদ্ধির আর বিত্তার শক্তি যে কত সুদূরপ্রসারী হ'তে পারে তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ইন্দীবর ভারতী। তাঁর খুড়তুতো ভাই গন্ধরাজ যদিও মহারাজা কিন্তু আমরা যুবকরা তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না। কিন্তু ইন্দীবর ভারতীকে কে না চেনে? বিদ্বানকে বুদ্ধিমানকে সবাই শ্রদ্ধা করে।"

গন্ধরাজ সসম্ভ্রমে বললেন—"মনে হ'চ্ছে কোন ছাত্রের সঙ্গে আলাপ করবার সৌভাগ্য হ'ল আমার। ছাত্র, না কোনও গ্রন্থকার?"

যুবক একটু লজ্জিত হলেন।

"আমি ছাত্র, গ্রন্থকার দুইই। আমার নাম কুণাল। রাজনীতি সম্বন্ধে কয়েকখানা বই লিখেছি।"

"বটে! বাঃ আপনার সঙ্গে আলাপ হ'য়ে খুব আনন্দ হ'ল। আপনার কাছে একটা কথা জেনেও নি তাহলে। শুনেছি গর্জন-গাঁওয়ে না কি বিদ্রোহের আগুন ধোঁয়াচ্ছে? আপনি তো এসব বিষয়ে পণ্ডিত, বলুন তো এতে কি ভালো হবে শেষ পর্যন্ত?"

যুবকটি ঈষৎ অধীরভাবে ঘাড় বেঁকিয়ে ফিরে বসলেন।

"দেখছি, আমার ছোটখাটো বইগুলো আপনি পড়েন নি। আমি শক্তিশালী শাসন-তন্ত্রে বিশ্বাসী। যাঁরা নানারকম উদ্ভট আজগুবী কল্পনা করে' আত্মপ্রবঞ্চনা করেন এবং মূর্খ জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করেন, আমি তাঁদের দলে নই। ওসব উদ্ভট কল্পনার দিন চলে' গেছে কিংবা যাচ্ছে—"

"কিন্তু আমি চারিদিকে যখন চেয়ে দেখি—"

"তখন আপনি দেখেন কেবল মূর্খ জনসাধারণকে"—বাধা দিয়ে বললেন যুবকটি—"কিন্তু যে মন্দিরে সব রকম মতবাদ জ্ঞানের আলো দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয় সেখান থেকে ওসব উদ্ভট মিথ্যা কল্পনা বহু আগেই নাকোচ হ'য়ে গেছে। আমরা প্রাকৃতিক স্বাভাবিক নিয়মের দিকেই ফিরে যাচ্ছি এবং চিকিৎসকরা যেমন বলেন, আশা করছি প্রাকৃতিক নিয়মেই সমাজের ব্যাধি আস্তে আস্তে সেরে যাবে।

কিন্তু আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনার এই গর্জনগাঁওয়ের যা অবস্থা আর আপনাদের ওই গন্ধরাজের যা মতিগতি তা আমরা মোটেই সমর্থন করি না। ওরা যুগের সঙ্গে পা ফেলে চলতে পারছে না, অনেক পেছিয়ে পড়েছে। কিন্তু বর্বরের মতো বিদ্রোহ করে' সব উলটে পালটে দিলেই এর প্রতিকার হবে তা-ও আমি মনে করি না। আমার মতে স্বাভাবিক ভাবে, মানে, প্রকৃতির রাজ্যে যেমন সর্বদা হ'চ্ছে—একটি ভালো রাজা এসে যদি সিংহাসনে বসেন তাহলেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে। ভালো মানে, শক্তিমান, সুদক্ষ। আপনি হয়তো বলবেন ভালো রাজা মানে কি"—হেসে বলতে লাগলেন যুবকটি—"আমরা যারা গ্রন্থ-কীটের মতো ঘরের কোণে বসে' বই পড়েছি, আমরা এ কাজের উপযুক্ত নই। আমরা নানারকম পরস্পরবিরোধী মতামত পড়ে' বিভ্রান্ত হ'য়ে বসে' আছি। আমার মনে হয় না কোন বিরাট পণ্ডিত যদি সিংহাসনে বসেন তিনি রাজ্য চালাতে পারবেন। যদিও এটা আমি স্বীকার করি রাজাকে পরামর্শ দেবার জন্যে সিংহাসনের কাছাকাছি কোনও বিদ্বান লোক থাকলে ভালো হয়। আমি কি রকম রাজা চাই জানেন? লোকটি খুব নয়, কিন্তু মোটামুটি বুদ্ধিমান্ হবে, খুব গভীর বা গম্ভীর হবার দরকার নেই, কিন্তু সজীব প্রাণবন্ত হওয়া চাই। আচরণ ভদ্র হবে, তোষণ করবার এবং শাসন করবার দু'রকম ক্ষমতাই তার থাকবে। অর্থাৎ বেশ সমঝদার, চৌকশ, দিলদরিয়া হওয়া চাই লোকটি। আপনাকে আমি গোড়া থেকেই লক্ষ্য করছি। আমি যদি গর্জনগাঁওয়ের প্রজা হতাম তাহলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতাম তিনি যেন আপনার মতো একজন লোককে এখানকার সিংহাসনে বসান।"

"বলেন কি মশাই!"—সবিস্ময়ে বলে' উঠলেন গন্ধরাজ।

হো হো করে' হেসে উঠলেন যুবকটি।

"আমি জানি আপনি আশ্চর্য হ'য়ে যাবেন। এও জানি এখানকার জনসাধারণ আপনার মতো লোককে পছন্দ করবে না।"

"নিশ্চয়ই করবে না।"

"আজ না করতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতে করবে, করতে হবে। জনসাধারণের মতিগতিও ভালো হ'চ্ছে ক্রমশ।"

"মাপ করবেন, আপনার সঙ্গে একমত হ'তে পারলাম না।"

"বিনয় অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য"—যুবক মৃদু হেসে বললেন—"কিন্তু আমি বলছি আপনার মতো রাজার পাশে যদি ইন্দীবর ভারতীর মতো মন্ত্রী থাকেন তাহলে আমি অন্তত খুশী থাকব। আমার মতে ওই হবে আদর্শ যোগাযোগ।"

এইভাবে অনেকক্ষণ গল্প হ'ল, অনেকটা সময় আনন্দে কেটে গেল। যুবকটি কিন্তু বেশীক্ষণ পান্থশালায় থাকতে পারলেন না, বললেন রোহিণী গ্রামে একজনের বাড়িতে শোবেন তিনি। রাত্রে আর কোথাও যাবেন না। একটানা ঘোড়ার পিঠে থাকতে তাঁর ভালো লাগে না। রাস্তায় বিশ্রাম করে' করে'ই চলা তাঁর অভ্যাস। যুবকটি চলে' যাওয়ার পর একলা পড়ে' গেলেন গন্ধরাজ। এদিকে ওদিকে চেয়ে সঙ্গী খুঁজতে লাগলেন। একটু দূরে দেখতে পেলেন তাঁরই রাজ্যের একদল কাঠের ব্যবসায়ী একজায়গায় বসে' গুলতানি করছে কয়েক বোতল মদকে কেন্দ্র করে'। তাদেরই সঙ্গে গিয়ে ভাব করলেন গন্ধরাজ এবং অবশেষে তাদের দলেই ভিড়ে গেলেন।

তাঁরা যখন ঘোড়ার পিঠে চড়লেন তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। বারুণীর প্রভাবে ব্যবসায়ীরা ঈষৎ বেসামাল হয়েছিলেন। হাসাহাসি ঠাট্টামস্করা বেশ জোরে জোরেই চলছিল। নিজেদের ঘোড়া নিয়ে ছুড়োছুড়ি করেও যেন একটু বিশেষ আমোদ পাচ্ছিলেন তাঁরা। সমবেতকণ্ঠে গানও গাইছিলেন মাঝে মাঝে। গন্ধরাজের কথা সব সময়ে মনে থাকছিল না তাঁদের। তাই গন্ধরাজ মাঝে মাঝে একা হ'য়ে পড়ছিলেন, আবার মাঝে মাঝে ওদের সঙ্গও পাচ্ছিলেন। ওদের হাসি ঠাট্টা বাজে বকবক গল্প শুনছিলেন মাঝে মাঝে, আবার মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হ'য়ে দু'পাশের আরণ্য পরিবেশে মগ্ন করে'

দিচ্ছিলেন নিজেকে। নক্ষত্রের আলোকে ঈষৎ-স্বচ্ছ অন্ধকার, বনের রহস্যময় মর্মর, খপ্ খপ্ খপ্ খপ্ অশ্ব-ক্ষুরোত্থিত বেখাপ্পা সঙ্গীত, সমস্ত মিলে এক বিচিত্র রসে পরিপূর্ণ করে' তুলেছিল তাঁর মনকে। পার্বতীর প্রান্তে যে সুদীর্ঘ পর্বতটি আছে তার চূড়ায় যখন তাঁরা উঠলেন তখনও তাঁর মনের সুর কাটে নি।

অনেক নীচে অরণ্য-কুন্তলা পার্বতীকে দেখা যাচ্ছিল। বনের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছিল তার আলো, দেখা যাচ্ছিল তার আলোকিত পথঘাট। মনে হচ্ছিল একটা ছবি যেন। ডান দিকে আলোক-মণ্ডিত রাজপ্রাসাদ দাঁড়িয়েছিল একক মহিমায়।

গর্জনগাঁওয়ের অধিবাসী হলেও একজন ব্যবসায়ীও গন্ধরাজকে চিনতেন না। রাজপ্রাসাদের দিকে আঙুল বাড়িয়ে তিনি বললেন, "এতক্ষণ আমরা রোহিণী পান্থশালায় ছিলাম, এইবার ওই দেখুন স্বৈরিণী পান্থশালা।"

আর একজন হো হো করে' হেসে উঠে বললেন—"আরে ওর ওই নামকরণ করেছ না কি তুমি!"

"হ্যাঁ ভদ্রভাষায় ওই নাম দিয়েছি। আসলে তো ওটা একটা বেশ্যার আড্ডা" বলেই তিনি গান ধরে' দিলেন একটা। মনে হ'ল গানটা সকলেই জানে, কারণ সকলেই গেয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। গর্জনগাঁওয়ের রাণী, মহামান্যা সুরূপিণী, হায় হায় হায়, সুধাভাণ্ড উজাড়িয়া কপিঞ্জল পিপাসা মিটায়। হায় হায় হায়, রাণী বড় রসবতী, আহা রাণী বড় রসবতী—হায় হায় হায়।" এই হ'ল গানের গোড়ার দিকটা। লজ্জায় গন্ধরাজের মাথা কাটা গেল যেন। কানের ডগা দিয়ে আগুন বেরুতে লাগল। তিনি ঘোড়ার লাগাম টেনে, স্তব্ধ হ'য়ে বসে' রইলেন ঘোড়ার উপর। প্রমত্ত বণিকের দল গান গাইতে গাইতে নীচে নামতে লাগল। গন্ধরাজ তাদের সঙ্গে গেলেন না।

গানের সুরটা প্রপাতের মতো নামতে লাগল। গানের কথা-

গুলো যখন অস্পষ্ট হ'য়ে এল তখনও সুরটার দোলা যেন বার বার দুলে দুলে অপমান করে' যেতে লাগল গন্ধরাজকে। তিনি আর সেখানে থাকতে পারলেন না। কাছেই পাহাড়ের গা বেয়ে একটা সরু পথ নেমে গিয়েছিল রাজপ্রাসাদের দিকে এঁকে বেঁকে ঘন অন্ধকারের ভিতর দিয়ে। সেটা বেয়ে গন্ধরাজ রাজপ্রাসাদের সামনের উদ্যানে এসে হাজির হলেন। বিকেল বেলা এখানটা বেশ জমজমাট থাকে। রাজসভার লোকেরা, স্বদেশী বিদেশী নাগরিকেরা এখানে সমবেত হ'য়ে মহারাজাকে অভিবাদন জানান। কিন্তু এখন এত রাত্রে এখানে কেউ নেই, আছে কেবল গাছের শাখায় শাখায় ঘুমন্ত পাখীরা। খরগোশদের খশ খশ শব্দ শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। পাথরের মূর্তিগুলো এখানে ওখানে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই একই ভঙ্গীতে। উদ্যানের দুই একটা মন্দিরে প্রতিহত হ'য়ে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ অদ্ভুত শোনাতে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই তিনি নিজের বাগানের সীমায় এসে পৌঁছলেন। এখানে একটা পুলের কাছে ছোট ছোট কয়েকটা আস্তাবল আছে বাগানের দিকে মুখ করে'। শুনতে পেলেন প্রহরী ঘণ্টা বাজাচ্ছে দূরে দুর্গশিখরে, সে ঘণ্টার শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে দূর থেকে দূরান্তরে। আস্তাবলে ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। চারিদিক নিস্তব্ধ। গন্ধরাজ ঘোড়া থেকে নামলেন। অনেকদিন আগেকার একটা স্মৃতি জেগে উঠল মনে। চোর সহিসগুলো ঘোড়ার দানা কি ভাবে সরিয়ে সস্তায় পাচার করে এটা অনেকদিন আগে দেখেছিলেন তিনি লুকিয়ে। হঠাৎ সেটা মনে পড়ে' গেল। পুল পার হ'য়ে তিনি একটা জানলায় একটা বিশেষ ধরনে ছ'সাত বার আঘাত করলেন ঠুক ঠুক করে'। জানলা ফাঁক হ'য়ে গেল, মানুষের মুণ্ড বেরিয়ে এল একটি।

"আজ মাল নেই।"

"একটা আলো আন।"

"এ কি কাণ্ড"—বলে' উঠল সহিসটা—"কে তুমি ?"

"আমি, আমি গন্ধরাজ। আলো আন একটা। ঘোড়াটাকে ভিতরে নিয়ে যাও আর বাগানে ঢোকবার কপাটটা খুলে দাও।"

লোকটা নির্বাক হ'য়ে রইল ক্ষণকাল।

"মহারাজ!"—সবিস্ময়ে বলে' উঠল তারপর—"আপনি ওভাবে জানলায় শব্দ করলেন কেন বুঝতে পারছি না।"

"পার্বতীতে একটা কুসংস্কার আছে যে ওই রকম শব্দ করলে ঘোড়ার দানা সস্তা হ'য়ে যায়।"

ঢোঁক গিলে মুণ্ডটা টেনে নিলে সহিস। যখন আলো নিয়ে ফিরে এল তখন সে বিবর্ণ, হাত কাঁপছে। কোনরকমে সে ঘোড়ার লাগামটা ধরে' ভিতরে নিয়ে এল তাকে।

"মহারাজ"—হঠাৎ সে বলে' ফেলল—"ঈশ্বরের দোহাই—" এ পর্যন্ত বলে' আর কথা সরল না তার মুখে।

"ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে কি বলছ! ভয়ের কি আছে। ঘোড়ার দানা যদি ঈশ্বরের কৃপায় সস্তা হ'য়ে যায় ভালই তো হবে।"

বাগানের ভিতর ঢুকে পড়লেন গন্ধরাজ। সহিস প্রস্তরমূর্তিবৎ দাঁড়িয়ে রইল।

ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমেছে বাগানের দিকে। বাগানের মাঝখানে যে মীন-দীঘিটা আছে সেই দীঘির পাড়ে এসে থেমেছে সিঁড়িগুলো। দীঘির ওপার থেকে আবার শুরু হয়েছে সিঁড়ি, সে সিঁড়ি পৌঁছেছে প্রাসাদ পর্যন্ত পিছন দিক দিয়ে। প্রাসাদের উঁচু-নীচু ছাদ, ত্রিকোণ প্রাচীর অন্ধকারে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছিল। প্রাসাদের বড় বড় স্তম্ভ, নাটমঞ্চ, পাঠাগার, প্রমোদগৃহ, গন্ধরাজের শয়নকক্ষ, বিরামকক্ষ প্রভৃতি রাজকীয় কক্ষের সারি পিছন থেকে কিছুই দেখা যায় না। সেগুলোর মুখ সব নগরের দিকে। পিছন দিকটা সেকেলে গোছের, এখানে জাঁকজমক বিশেষ কিছু নেই। বেশ অন্ধকারও। কয়েকটা পিছনের জানলা থেকে আলো এসে

পড়েছে কেবল সিঁড়ির উপর। বিরাট চতুষ্কোণ তোরণদুর্গটি ক্রমশঃ সরু হ'য়ে উপরের দিকে উঠেছে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মতো। তার উপর পতাকাটি যেন ঝুলে আছে, উড়ছে না।

রাত্রির নক্ষত্রালোকিত অন্ধকারে পিছনের এই বাগানটি আমোদিত হ'য়ে উঠেছিল জুঁই চামেলী আর হাস্নুহানার গন্ধে। অন্ধকারের রহস্যময় আবরণের তলায় যেন গোপন চঞ্চলতার সাড়াও পাওয়া যাচ্ছিল মাঝে মাঝে। সিঁড়ি বেয়ে দ্রুতপদে নামছিলেন গন্ধরাজ, তাঁর বিক্ষুব্ধ মনের চিন্তাগুলোই যেন তাড়া করে' নিয়ে যাচ্ছিল তাঁকে। কিন্তু হায়, এ চিন্তা থেকে তাঁকে রক্ষা করবে এমন আশ্রয় কি কোথাও আছে পৃথিবীতে? কিছুদূর নেমে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। প্রমোদগৃহ থেকে গানের সুর ভেসে আসছে, রাজসভার সভাসদরা নাচগানে মত্ত হ'য়ে আছেন ওখানে। ছাড়া ছাড়া ভাবে গানের টুকরো ভেসে আসছে। হঠাৎ এ গানকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল আর একটা গান, সেই মত্ত ব্যবসায়ীর দল একটু আগে যে গান গাইতে গাইতে পাহাড় থেকে নামছিল—রাণী বড় রসবতী, আহা, রাণী বড় রসবতী, হায় হায়, হায়—গানের এই ধুয়োটা আবার যেন স্পষ্ট শুনতে পেলেন তিনি। সমস্ত মন অন্ধকারাচ্ছন্ন হ'য়ে গেল। এতদিন পরে তিনি বাড়ি ফিরছেন। রাণী নাচ-গানে মাতোয়ারা, তিনি একটা সামান্য সহিসকে ধাপ্পা দিয়ে চোরের মতো বাড়ি ঢুকলেন। চারিদিকে ঢিঢি পড়ে' গেছে, প্রজারা হাসাহাসি করছে সবাই। তিনি সত্যিই কি মহারাজা? সত্যিই কি স্বামী? গন্ধরাজ কি হয়েছ তুমি! দ্রুতপদে নামতে লাগলেন তিনি আবার।

কিছুদূর নেমেই অপ্রত্যাশিতভাবে সাক্ষাৎ পেলেন একজন প্রহরীর। কিছুদূর গিয়ে আর একজন প্রহরী গতিরোধ করল তাঁর। মীন-দীঘির উপর সাঁকোটা যখন পার হচ্ছিলেন তখন একজন পদস্থ সামরিক কর্মচারী আবার দাঁড় করালেন তাঁকে। মনে হ'ল তিনি

যেন এ দিকটায় বিশেষ পাহারায় নিযুক্ত হ'য়ে আছেন। পাহারার এমন বাড়াবাড়ি দেখে একটু অবাক হলেন গন্ধরাজ। কিন্তু কোনও প্রশ্ন জাগল না মনে। তাঁর মনে কোন কৌতূহল আর ছিল না যদিও বার বার বাধা পাওয়াতে বিরক্ত হচ্ছিলেন খুব। প্রাসাদের পশ্চাৎভাগে যে রক্ষী পাহারা দিচ্ছিল, সে তাঁকে সিংহদরজা খুলে দিল এবং তাঁর বিস্রস্ত বেশবাস দেখে চমকে উঠল একটু। সেখান থেকে দ্রুতপদে এগিয়ে গেলেন তিনি প্রাসাদের দিকে এবং গুপ্ত সিঁড়ি দিয়ে গোপনে হাজির হলেন এসে নিজের শয়নকক্ষে। কেউ দেখতে পেল না। গিয়েই তিনি গায়ের পোশাক পরিচ্ছদ টেনে খুলে ফেলে অন্ধকারে শুয়ে পড়লেন নিজের বিছানায়। প্রমোদগৃহে নাচ-গান বাজনা তখন উদ্দাম হ'য়ে উঠেছে, কিন্তু সব ছাপিয়ে গন্ধরাজের কানে বাজতে লাগল সেই অর্ধমত্ত ব্যবসায়ীদের গানের সুর—অশ্বক্ষুরের বেসুরা বাজনার সঙ্গে সেই গান—রাণী বড় রসবতী—হায় হায় হায়।

পাঁচ

খুব ভোরে ইন্দীবর ভারতী রাজপাঠাগারের পাঠকক্ষে এসে নিজের কাজ শুরু করে' দিয়েছিলেন। পাশেই ছিল এক পাত্র মাধ্বী সুরা, আর আশেপাশে দেখা যাচ্ছিল সারি সারি আবক্ষ কয়েকটি মর্মরমূর্তি আর বহুবর্ণবিচিত্র পুস্তকের সংগ্রহগুলি। তিনি আগের দিন যা লিখেছিলেন তাই সংশোধন করছিলেন বসে' বসে'। ইন্দীবর ভারতীর বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথার চুল পাতলা হ'য়ে এসেছে, মার্জিত বুদ্ধিদীপ্ত মুখমণ্ডলেও ক্লান্তির ছাপ এসেছে একটা, চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টিও তত উজ্জ্বল নেই আর। খুব সকাল সকাল শুয়ে খুব ভোরে ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করাই তাঁর বহুকালের অভ্যাস আর নেশা মাত্র দু'টি। বিদ্যাচর্চা আর মাধ্বী সুরা। তাঁর সঙ্গে গন্ধরাজের একটা প্রাচীন বন্ধুত্ব আছে, আত্মীয়তাও আছে। কিন্তু সেটাকে সুপ্ত বা অদৃশ্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁদের দেখা হয় ক্বচিৎ। কিন্তু যখনই হয় তখনই যেন পুরাতন সুরটি আবার বেজে ওঠে। বাণীমন্দিরের নিষ্ঠাবান ব্রহ্মচারী পুরোহিত ইন্দীবর তাঁর খুল্লতাত-পুত্র গন্ধরাজের উপর ঈষৎ ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন (অবশ্য মাত্র একবেলার জন্য) যখন গন্ধরাজ সুরূপিণী দেবীকে বিয়ে করে' আনেন। তিনি রাজা হয়েছেন বলে' তাঁর কোন ঈর্ষা হয় নি। সিংহাসনের উপর লোভ ছিল না তাঁর।

গর্জনগাঁওয়ের লোকদের বই পড়ার আগ্রহ বিশেষ নেই। পাঠাগারে কেউ আসত না। সুতরাং এই বৃহৎ, আলোকিত, মর্মরমূর্তি-শোভিত, সুন্দর পুস্তকসংগ্রহশালাটি ইন্দীবর ভারতী একাই ভোগ করতেন। মাঝে মাঝে কেউ কখনও ক্বচিৎ গবেষণার জন্য ইন্দীবরের শিষ্য হতেন এসে।

সেদিন সকালে কিন্তু তাঁর পাণ্ডুলিপি পাঠে বাধা ঘটল।

অপ্রত্যাশিত ভাবে দ্বার খুলে গেল। গন্ধরাজ প্রবেশ করলেন। ইন্দীবর চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। পাঠাগারের বড় বড় বাতায়নের পাশ দিয়ে আসছিলেন গন্ধরাজ, প্রভাতরৌদ্র যেন আলিঙ্গন করে' অভ্যর্থনা করছিল তাঁকে। তাঁর চালচলন প্রসাধন-পরিচ্ছদেও যে আভিজাত্য পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছিল তা দেখে মুগ্ধ হওয়া উচিত ছিল ইন্দীবরের, কিন্তু তিনি যেন চটে গেলেন মনে মনে।

"ইন্দীবর কেমন আছ"—একটা আসনে বসে' পড়লেন গন্ধরাজ —"অনেকদিন দেখা হয় নি—"

"আরে তুমি! খুব সকালে উঠেছ দেখছি। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল না কি, না অভ্যাস বদলাচ্ছ।"

"হ্যাঁ, এবার বদলাবার সময় এসেছে বৈ কি।"

"ও! কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে পারছি না"—হেসে বললেন ইন্দীবর—"আমি নাস্তিক-প্রকৃতির লোক, নীতি-শাস্ত্রে আস্থা নেই। যখন যৌবন ছিল তখন আদর্শ টাদর্শ নিয়ে অনেক মাতামাতি করেছি। এখন বুঝেছি ওসব আলেয়া, আশার ইন্দ্রধনুতে রঙের খেলা মাত্র।"

"তুমিই জান"—গন্ধরাজ বললেন—"আমি জনপ্রিয় রাজা নই" বলেই তিনি এমনভাবে চাইলেন ইন্দীবরের দিকে যেন তিনি ইন্দীবরের কাছ থেকে এর সমর্থন বা প্রতিবাদ প্রত্যাশা করছেন।

"জনপ্রিয়? কিন্তু জনপ্রিয়তার রকমফের আছে।"

ইন্দীবর তাঁর আসনটিতে ভাল করে' হেলান দিয়ে বসলেন, তারপর দু'হাতের আঙুলের ডগাগুলিকে হালকাভাবে পরস্পরের সঙ্গে ঠেকিয়ে সহাস্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললেন—"জনপ্রিয়তা অনেক রকমের আছে। বই-পড়া পাণ্ডিত্যের জনপ্রিয়তা আছে একরকম, বই পড়ে যে কোনও লোক পণ্ডিত হতে পারে। ওতে ব্যক্তিত্বের বিশেষ কোন প্রকাশ নেই,

আর অনেক সময় তা দুঃস্বপ্নের মতো অলীক। আর একরকম জনপ্রিয়তা আছে রাজনৈতিক নেতাদের, সেটা কিন্তু গোলমেলে গোছের। আর একরকম জনপ্রিয়তা, যা' নিতান্ত ব্যক্তিগত, তা হচ্ছে তোমার। মেয়েমানুষ তোমাকে দেখলেই প্রেমে পড়ে, চাকরবাকররা তোমাকে তুষ্ট করবার জন্যে পাগল। ভালো কুকুরকে দেখলেই তাকে আদর করে' তার পিঠ চাপড়ে দেওয়ার ইচ্ছেটা যেমন স্বাভাবিক তোমাকে দেখলেই ভালো-লাগাটা তেমনি স্বাভাবিক। তুমি গর্জনগাঁওয়ের কোনও কাঠুরে বা কাঠের-ব্যবসায়ী হ'লে নিঃসন্দেহে তুমি সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় নাগরিক হ'তে। কিন্তু রাজা হিসাবে তুমি অচল, একদম বেমানান। আর সেটা স্বীকার করাই হয়তো বুদ্ধিমানের কাজ, যা তুমি করেওছো—"

"হয়তো বুদ্ধিমানের কাজ ?"—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন গন্ধরাজ।

"হ্যাঁ, হয়তো। আমি জোর করে' কিছু বলতে চাই না।"

"হয়তো বুদ্ধিমানের কাজ, কিন্তু ধর্মসঙ্গত কি ?"

"বীরধর্মসঙ্গত নয় অন্তত।"

গন্ধরাজ তাঁর আসনটি আরও কাছে টেনে এনে টেবিলের উপর দুই কনুই দিয়ে ইন্দীবরের মুখোমুখি হ'য়ে বসলেন।

"তার মানে ? পুরুষোচিত নয় ?"

একটু ইতস্তত করে' ইন্দীবর বললেন, "তাও বলতে পার।"

তারপর হেসে বললেন—"তুমি নিজের পৌরুষ আস্ফালন করতে এত ব্যগ্র তা আমার জানা ছিল না তো। আর এই জন্যেই বিশেষ করে' ভালো লাগত তোমাকে। তার চেয়েও বেশী—এই জন্যেই মনে মনে তারিফ করতাম তোমাকে। ধর্মসঙ্গত আচরণ করবার জন্যে সবাই লালায়িত। সব রকম ধর্মের পোশাক একসঙ্গে পরতে চায় সবাই, তা সে যতই না বেমানান হোক। আমরা দুঃসাহসী নির্ভীক বীরও হ'তে চাই আবার পরিণামদর্শী সংসারীও হ'তে চাই। আমরা অহঙ্কার আস্ফালন করে' হুহুঙ্কারও ছাড়ি আবার বিনয়ে

গদগদ হ'য়ে ধুলোয় লুটিয়েও পড়ি। ধর্মের পাল্লায় পড়ে' একই লোক বিপরীত আচরণ করে। কিন্তু তুমি কখনও তা কর নি। তুমি নির্জলা তুমিই আছ, কোনও কিছুর সঙ্গে কখনও আপোস কর নি। আমি বরাবরই বলেছি গন্ধরাজের মধ্যে কোন ভণ্ডামি নেই। গন্ধরাজ চিরকালই গন্ধরাজ।"

"ভণ্ডামি নেই, কিন্তু কোন উদ্যমও নেই"—বলে' উঠলেন গন্ধরাজ—"একটা মরা জানোয়ারের চেয়েও বেশী নির্জীব আমি। কিন্তু যে জিনিসটা তোমার কাছে জানতে এসেছি ইন্দীবর সেইটের উত্তর দাও—চেষ্টা করলে এবং কৃচ্ছ্রসাধন করলে আমি একটা চলনসই গোছের রাজাও হ'তে পারব না?"

"না, কদাপি নয়"—গম্ভীরভাবে বললেন ইন্দীবর—"ও চিন্তাই কোরো না। তাছাড়া, আমি জানি তুমি চেষ্টাই করবে না।"

"না, ইন্দীবর, আমাকে তুমি নিরস্ত করতে পারবে না, একটা হেস্ত-নেস্ত না করে' আমি ছাড়ব না। রাজা হবার যোগ্যতা যদি আমার না থাকে তাহলে প্রজাদের টাকা নেবার কি অধিকার আছে আমার, এই প্রাসাদে বাস করবার কি অধিকার আছে, এত সৈন্যসামন্তের উপর, এত দেহরক্ষীর উপর প্রভুত্ব করবারই বা কি অধিকার আছে! আমি তো চোর তাহলে, অপরাধীকে আইনত শাস্তি আমি তাহলে দেব কি করে'?"

হ্যাঁ মুশকিল আছে বটে, সেটা মানছি।"

"আমি কি চেষ্টা করতে পারি না?"—গন্ধরাজ উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছিলেন—"ধর্মত আমি কি চেষ্টা করতে বাধ্য নই? আমি যদি চেষ্টা করি আর তুমি যদি আমাকে পরামর্শ আর সাহায্য দাও—"

"আমি!" বলে' উঠলেন ইন্দীবর—"রক্ষে কর!"

গন্ধরাজ যদিও উত্তেজিত হয়েছিলেন তবু হেসে ফেললেন তিনি।

"কাল রাত্রে কিন্তু সত্যিই একজন আমাকে বলেছে যে আমার মতো একজন লোক যদি ইন্দীবর ভারতীর মতো মাঝিকে হালে

বসিয়ে পাল তুলে দেয় তাহলে রাজ্যের তরণী ঠিক তীরে ভিড়ে যাবে—”

“যে তোমাকে বলেছে সে হয় উন্মাদ, না হয় মতলববাজ পিশাচ—”

“সে তোমারই সগোত্র, একজন লেখক। নাম কুণাল—”

“কুণাল? হ্যাঁ তাকে চিনি, সে তো মহামূর্খ একটা—বই পড়েছি তার—”

“কিন্তু সে তোমার একজন ভক্ত।”

“তাই না কি?”—ক্ষণকাল চুপ করে' রইলেন ইন্দীবর—“তাহলে তো দেখছি ছোকরা খুব নিরেট নয়। তার বইটা আর একবার পড়ে' দেখব। তার মতের সঙ্গে আমার মতের কিছুমাত্র মিল নেই, এ সত্ত্বেও যদি সে আমার ভক্ত হয় তাহলে ওর ভিতর বস্তু আছে কিছু। ওকে কি আমার মতে আনতে পেরেছি? কিন্তু না, ওসব কাণ্ড তো রূপকথার পরীর দেশে হয়।”

“তুমি কি রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী?”

“আমি? মোটেই না। আমি বিদ্রোহী। লাল রঙের বিদ্রোহী—”

“তাহলে আমার পরের কথাটা শোন এইবার। সত্যিই যদি আমাকে সিংহাসনে বসবার অনুপযুক্ত মনে কর, এই যদি সত্যাই আমার বন্ধুদের মত হয়, আমার প্রজারা যদি সত্যিই আমাকে সিংহাসন থেকে টেনে নামিয়ে দিতে চায়, বিদ্রোহ যদি সত্যিই আসন্ন হ'য়ে থাকে তাহলে এই অনিবার্য পরিণতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই ভয়ঙ্কর বিভীষিকা আর হাস্যকর পরিস্থিতির অবসান ঘটানো কি উচিত নয়? সংক্ষেপে সিংহাসন ত্যাগ করাই কি এখন একমাত্র কর্তব্য নয় আমার? বিশ্বাস কর, ইন্দীবর, সকলের বিদ্রূপ গালাগালি আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমার সহ্যের সীমা অতিক্রম করে' গেছে। কিন্তু আমার মতো বাজে মহারাজাদের সিংহাসন ত্যাগ করার কি মূল্য আছে। সিংহাসন ত্যাগ করবার আগে প্রমাণ

করতে হবে যে ওই সিংহাসনে সত্যিই আমার কিছু অধিকার ছিল, সংক্ষেপে আগে সাড়ম্বরে মহারাজার অভিনয় করে' তারপর সিংহাসন ত্যাগ করতে হবে।"

"ঠিক। কিংবা যেমন আছ তেমনি থাকতে হবে। আচ্ছা, তোমার আজ কি হ'য়েছে বল তো! তুমি কি করছ তা জানো? তুমি অজান্তে আনাড়ীর মতো জ্ঞানরাজ্যের সেই পবিত্র তীর্থে এসে পড়েছ যেখানে পাগলেরা থাকে। হ্যাঁ, পাগলেরা। আমাদের জ্ঞানের মন্দিরে গোপনতম নির্জন কক্ষে আমরা তালা দিয়ে যা বন্ধ করে' রাখি, তা কি জান? মাকড়শার ঝুল! খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে সমস্ত মানুষ—সমস্ত—বাজে, অত্যন্ত বাজে। অত্যন্ত অনাবশ্যক, একেবারে অপ্রয়োজনীয়। প্রকৃতি আমাদের দয়া করে' সহ্য করেন, আমরা প্রকৃতির কোনও কাজে লাগি না। আমরা সেই ফুল যাতে ফল ফলে না। দরিদ্র ঘর্মাক্তকলেবর শ্রমিক থেকে শুরু করে' তিলকমালাধারী মহাপুরুষরা পর্যন্ত সবাই একদলের, সবাই সমান অনাবশ্যক। কেউ কোন কাজে লাগি না। আমরা সবাই বালি দিয়ে দড়ি পাকাবার চেষ্টা করছি কিংবা তাস দিয়ে কেল্লা বানাচ্ছি। ও আলোচনা থাক্। করলে, পাগলদের কথা এসে পড়বে আবার।"

ইন্দীবর আসন থেকে উঠে পড়লেন। আবার বসে' পড়লেন হঠাৎ। তারপর একটু হেসে বললেন "ভায়া, দৈত্য-দানবদের সঙ্গে যুদ্ধ করা আমাদের কর্ম নয়, ফুলের মতো ফুটে থাকাই আমাদের কাজ। তুমি ওটা পারো বলেই তোমাকে ভালবাসি। ওইই কর। ওই শোভন ওই সুন্দর। নিজের মৌজে মশগুল হ'য়ে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়িয়ে বেড়াও। ধর্মটর্ম বিবেক টিবেক চুলোয় যাক। কপিঞ্জল যেমন রাজ্য শাসন করছে করুক। লোকে বলে ও নাকি ভালই শাসন করছে। আর এসব করে' ও নাকি খুশীও আছে, ওর দেমাকের কিছু খোরাকও পেয়েছে!"

"ইন্দীবর কি বলছ তুমি এসব? আমরা বাজে, আমরা অনাবশ্যক? না, আমি অন্তত অনাবশ্যক নই, বাজেও নই। আমি হয় কোন কাজে লাগব, না হয় অকাজ করব। হয় গড়ব না হয় ভাঙব। স্থির হ'য়ে থাকা আমার ধাতে নেই। আমি মানছি রাজা-রাজত্ব এ সবই হাস্যকর ব্যাপার, সবই প্রহসন, কিন্তু এও ঠিক যে সাধারণ গৃহস্থরা যারা খেটে-খুটে খায় তারাই সমাজের ধারক আর বাহক। তিন বচ্ছর আমি রাজ্যের দিকে ফিরে তাকাই নি—সমস্ত দায়িত্ব, সমস্ত সম্মান, সমস্ত আমোদ-প্রমোদ, ঐশ্বর্যের সমস্ত সমারোহ কপিঞ্জল আর স্বরূপিণীর হাতে ছেড়ে দিয়েছিলাম। ফল কি হয়েছে জান? প্রজাদের খাজনা বেড়েছে, সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে, কামান কেনা হয়েছে—অর্থাৎ রাজ্য বারুদের স্তূপে রূপান্তরিত হয়েছে। একটি স্ফুলিঙ্গ পড়বার অপেক্ষা কেবল। প্রজাদের শান্তি নেই। ক্ষেপে রয়েছে সবাই। যুদ্ধের কথাও শোনা যাচ্ছে—এই ছোট্ট চায়ের পেয়ালাতেও তুফান উঠবে বলছে সবাই। পেজোমি আর বোকামির এমন জটিল সমন্বয় আগে দেখেছ কখনও? এ লজ্জা এ অপমান সহ্য করা যায় না। এর অনিবার্য পরিণাম বিদ্রোহ যখন দাউ দাউ করে' জ্বলে উঠবে তখন ভগবানের কাছে জবাবদিহি করতে হবে কাকে? আমাকে। এই সাক্ষীগোপাল মহারাজা গন্ধরাজকে। লোকে আমাকেই জবাই করবে, আমাকেই দায়ী করবে—"

ইন্দীবর বললেন, "আমার ধারণা ছিল লোকমতকে তুমি গ্রাহ্য কর না।"

"আগে করতাম না, এখন করছি"—গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন গন্ধরাজ—"এখন বয়স বেড়েছে। তাছাড়া, ওই স্বরূপিণী, তার খবর রাখ? তাকে সকলে ঘৃণা করে। বিয়ে করে' যে দেশে তাকে আমি এনেছিলাম সে দেশে তার কিছুমাত্র সম্মান নেই। বুঝতে পারছি, আমারই দোষে নষ্ট হয়েছে সে। এই রাজ্যটা তাকে আমি খেলনার

মতো উপহার দিয়েছিলাম, কিন্তু খেলনাটা সে ভেঙে ফেলেছে। ফেলবেই! যেমন দ্যাবা, তেমনি দেবী। আচ্ছা, ইন্দীবর, তার জীবন কি নিরাপদ এ রাজ্যে?"

"হ্যাঁ, এখন নিরাপদ"—উত্তর দিলেন ইন্দীবর—"তবে জিজ্ঞাসা করছ যখন তখন খুলেই বলছি। আজ নিরাপদ, কিন্তু কাল কি হবে বলতে পারি না। তোমার রাণীর পরামর্শদাতা যিনি তাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন, তিনি মোটেই ভাল লোক নন।"

"কে তিনি? তিনিই তো কপিঞ্জল। আর তুমি বলছ ওরই হাতে শাসনভার থাকুক। অদ্ভুত পরামর্শ তোমার! আমি এ ক'বছর যে পথে চলে' এসেছি সে পথ আমাকে শেষে যে এখানে এনে ফেলবে তা ভাবতে পারি নি। তুমি বলছ সুরূপিণীর পরামর্শদাতা লোক ভাল নন। শুধুই কি তিনি পরামর্শদাতা? না, এ নিয়ে ঢাকঢাক গুড়গুড় করে' লাভ নেই। লোকে তার সম্বন্ধে কি রটাচ্ছে জান?"

ইন্দীবর ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসেছিলেন, তিনি শুধু মাথা নাড়লেন।

"আমি রাজা হিসেবে যে কত বাজে সে সমালোচনায় তুমি পঞ্চমুখ। কিন্তু আমি স্বামী হিসেবে কেমন সে কথা তো তুমি একবারও বল নি।"

"না"—ইন্দীবর বললেন—"ও তো অন্য প্রসঙ্গ। আমি চিরকুমার প্রৌঢ় মানুষ। ও বিষয়ে কথা কইবার বা পরামর্শ দেবার অধিকার আমার নেই।"

"আমি পরামর্শ চাইও না"—উঠে দাঁড়ালেন গন্ধরাজ—"কিন্তু এসব আর চলবে না। এ বন্ধ করতেই হবে।"

পিছনে দু'হাত দিয়ে পদচারণা শুরু করলেন তিনি।

"গন্ধরাজ, ভগবান তোমার সহায় হোন, আমি পারব না" কিছুক্ষণ নীরব থেকে ইন্দীবর বললেন অবশেষে।

হঠাৎ থেমে গন্ধরাজ ফিরে দাঁড়ালেন।

"এর মানে কি? কি বলব একে। আত্ম-অবিশ্বাস? উপহাসের ভয়? ছদ্ম আত্মম্ভরিতা? নাম যাই হোক কিন্তু কি শোচনীয় অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছি। দেখ, ইন্দীবর, ভুয়ো ব্যাপার নিয়ে আমি কখনও মাথা ঘামাই নি। এই খেলনা-সিংহাসন যখন আমি পেলাম তখন আমি আনন্দিত হই নি লজ্জিত হয়েছিলাম। এই রাজা-গিরিতে, এই অসম্ভব হাস্যকর ব্যাপারে, আমার যে কিছুমাত্র আস্থা আছে তা লোকে বিশ্বাস করুক এ আমি মোটেই চাই নি। যা হাসিমুখে সহজভাবে করা যায় না তা আমি কখনও করি না। সত্যিই আমার একটা রস-বোধ আছে, আমার স্রষ্টা ভগবান সেটা জানেন কি না জানি না, কিন্তু আমি জানি। আমি বেরসিকের মতো কিছু করি না। বিয়ের ব্যাপারেও ঠিক তাই। যখন বিয়ে হ'ল তখন বুঝলাম এ মেয়ে আমাকে কোনদিন ভালবাসবে না, সুতরাং তার পথে বাধা হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকার কোনও মানে হয় না, আমি যে ওর জীবনে কাঁটা হ'য়ে থাকতে চাই না এটা ভড়ং করে' বজায় রাখতে হবে। তাই করেছি। কিন্তু কি করেছি! লোকে আমাকে অক্ষম নপুংসক বলছে। ছি, ছি—"

"দেখ"—ইন্দীবর একটু হেসে বললেন—"আমাদের একই বংশে জন্ম, আমাদের দু'জনের শরীরেই এক রক্ত বইছে। তাই বুঝতে পারছি অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে তুমি যে ছবিটি আঁকলে সেটি একটি সন্দেহবাদী দার্শনিকের অপূর্ব আলেখ্য—"

"দার্শনিকের? ভীরুর"—চীৎকার করে' উঠলেন গন্ধরাজ —"হ্যাঁ। ভীরুর। মেরুদণ্ডহীন, নতজানু ভীরুর, যার মাথায় গোবর ছাড়া আর কিছু নেই।"

গন্ধরাজের মুখ থেকে গুলির মতো এই কথাগুলো যখন ছুটছিল ঠিক সেই সময় একটি বেঁটে মোটা বৃদ্ধ ভদ্রলোক ইন্দীবরের পিছন দিকের একটি কপাট খুলে নিঃশব্দে প্রবেশ করলেন। গুলিগুলো

যেন তাঁরই মুখে লাগল। একটু হকচকিয়ে গেলেন তিনি। শুক-চঞ্চুর মতো নাক, চাপা ওষ্ঠাধর, ঠিকরে-পড়া চোখ ভদ্রলোকের। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে তিনি যেন ভব্যতার প্রতিমূর্তি। সাধারণত তিনি যখন তাঁর বিরাট ভুঁড়ির পিছনে সদর্পে ঘুরে বেড়ান তখন তাঁকে জ্ঞান-গম্ভীর অবিচল-চরিত্রের লোক বলেই মনে হয়, কিন্তু একটু বেগতিক দেখলেই তাঁর চেহারা বদলে যায়, হাত কাঁপতে থাকে, পা নড়বড় করে। তখন বোঝা যায় মূলেই গোলমাল আছে কোথাও। পার্বতীর বিখ্যাত গ্রন্থশালায়—যেখানে সাধারণত নিশ্ছিদ্র নীরবতাই বিরাজ করে—সেখানে তিনি যে এমন সগর্জনে অভ্যর্থিত হবেন তা তাঁর কল্পনার অতীত ছিল। দু'হাত তুলে মেয়েমানুষের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, মনে হ'ল সত্যিই বুঝি তাঁর মুখে গুলি লেগেছে।

"ও—" সভয়ে চীৎকার করে' উঠলেন তিনি—"ও, আপনি, মহারাজ। বুঝতে পারি নি ঠিক। ক্ষমা করুন আমাকে। কিন্তু এত সকালে আপনি এখানে? ব্যাপারটা একেবারে ধারণার অতীত ছিল আমার—সত্যিই অপ্রত্যাশিত—মানে—"

"মহাধ্যক্ষ মশাই না কি। নমস্কার। হ্যাঁ, আজ একটু সকাল সকালই এসেছি এখানে।"

"আমি এখনি চলে' যাচ্ছি। ভারতীমহাশয়কে কাল কিছু কাগজ দিয়ে গিয়েছিলাম সেটা নিয়ে যাব। ওগুলো দেখা হ'য়ে গেছে নিশ্চয় আপনার। দিন তাহলে নিয়ে চলে' যাই। আপনাদের আলাপে বাধা দেব না।"

ইন্দীবর ভারতী একটি বাক্সের তালা খুলে একগোছা পাণ্ডুলিপির কাগজ তাঁকে দিলেন। কাগজগুলি হস্তগত করেই মহাধ্যক্ষ সসম্ভ্রমে নমস্কার করে' চলে যাচ্ছিলেন।

"চলে' যাচ্ছেন কেন"—বাধা দিলেন গন্ধরাজ—"এতদিন পরে যখন দেখাই হ'য়ে গেল তখন বসুন, একটু গল্প করা যাক।"

গর্জনগাঁওয়ের মহাধ্যক্ষ কুজ্ঝটিকুমার অভিবাদন করে' বললেন—"মহারাজের এ অনুগ্রহে সম্মানিত হলাম।"

"আমি চলে' যাওয়ার পর কোন গোলমাল হয় নি তো?"

গন্ধরাজ আসনে উপবেশন করলেন।

"আগে যেমন ছিল তেমনিই আছে"—উত্তর দিলেন কুজ্ঝটি-কুমার—"সামান্য ইতরবিশেষ হয়েছে হয়তো কোথাও কোথাও। ওই সামান্য হয়তো না দেখলে বড় কিছু হ'য়ে পড়ত। কিন্তু তা হয় নি। মহারাজের আদেশ সর্বতোভাবে পালিত হচ্ছে।"

"আমার আদেশ?"—গন্ধরাজ বিস্মিত হলেন—"আমি আবার কবে আপনাকে আদেশ দিয়ে বিব্রত করলাম! আমার বদলে হয়তো অন্য কেউ আদেশ দিয়ে থাকবেন। কিন্তু ও কথা যাক—ওই যে সামান্য ইতরবিশেষ কি কি হয়েছে বলেছিলেন কি সেগুলো—"

"মহারাজ, আপনি রাজ্যের ধারাবাহিক কাজকর্ম থেকে নিজেকে বুদ্ধিমানের মতো সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তাই—"

"আমার বিশ্রামের কথা বাদ দিন। কি কি হয়েছিল তাই বলুন।"

"ওই যে বললাম রাজ্যের ধারাবাহিক কাজকর্মই"—আমতা আমতা করে' আবার বললেন তিনি।

"আশ্চর্য কাণ্ড দেখছি। সোজা প্রশ্নের সোজা উত্তর দিতে পাচ্ছেন না আপনি? আপনি এ রাজ্যের মহাধ্যক্ষ, আপনার কাছে এ রকম অস্পষ্টতা আশা করি নি। সন্দেহ হ'চ্ছে এর পিছনে কোনও মতলব লুকোনো আছে। আমি আপনাকে প্রশ্ন করেছি আমার অবর্তমানে রাজ্যের শান্তি অটুট ছিল কি না। অনুগ্রহ করে' একথাটার জবাব দিন—"

"হ্যাঁ, ছিল, ছিল বই কি, শান্তি অটুট ছিল—"

যে ভাবে থেমে থেমে হোঁচট খেয়ে হোঁচট খেয়ে কথাগুলো

বললেন কুজ্‌ঝটিকুমার তাতে মনে হ'ল সত্য গোপন করছেন তিনি।

"এই কি তাহলে আমাকে মনে করতে হবে"—গম্ভীরভাবে বললেন গন্ধরাজ—"আপনি মহাধ্যক্ষ, আমার কাছে জানাচ্ছেন যে আমি চলে' যাওয়ার পর রাজ্যে এমন কিছু ঘটে নি যা উল্লেখযোগ্য, যা আমার জানা উচিত?"

"না, না, ভারতী মশায় সাক্ষী আছেন, এরকম কোন কথা আমি বলি নি মহারাজ।"

"চুপ করুন"—থামিয়ে দিলেন তাঁকে গন্ধরাজ।

তারপর একটু থেমে বললেন—"দেখুন মহাধ্যক্ষ মশায়, আপনি বৃদ্ধ হ'য়েছেন। আমার অধীনে কাজ করবার আগে আমার বাবার অধীনেও আপনি কাজ করেছেন। আপনার মুখে এ ধরনের এলোমেলো কথা শোভা পাচ্ছে না, মনে হ'চ্ছে আপনি যেন কোনও অছিলায় সত্য গোপন করতে চাইছেন। আমি এ রাজ্যের মহারাজা, আমি প্রত্যাশা করি আমার মহাধ্যক্ষ তাঁর মর্যাদার উপযুক্ত হবেন। আপনি স্থির হ'য়ে একটু ভাবুন এবং যে সব কথা গোপন করবার চেষ্টা করেছেন তা খুলে বলুন। হয়তো আর কারও প্ররোচনায় আপনি এ হীন কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন—কিন্তু আমি অনুরোধ করছি, আপনি আত্মস্থ হোন।"

ইন্দীবর শাস্ত্রী তাঁর পাণ্ডুলিপির উপর ঝুঁকে পড়ে' সম্ভবত কিছু সংশোধন করছিলেন কিন্তু তাঁর স্কন্ধযুগলের আন্দোলন থেকে মনে হ'ল তিনি গোপনে হাসছেন। আঙুলে রুমাল জড়াতে জড়াতে অপেক্ষা করতে লাগলেন গন্ধরাজ।

"মহারাজ, আমাকে ক্ষমা করুন। আমার কাছে এখন কোনও কাগজপত্র নেই, আপনার অবর্তমানে যে গুরুতর ঘটনাটি ঘটেছে সে সম্বন্ধে এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে কিছু বলা যাবে না—কারণ সেটা রীতিবিরুদ্ধ। কারণ যা ঘটেছে তা কেন ঘটেছে সেটা আপনাকে

বোঝাতে হ'লে সরকারী কাগজপত্র চাই। তা না হ'লে আমার ভয় হ'চ্ছে, আপনি সুবিচার করতে পারবেন না।"

"আমি কোনও সমালোচনাই করব না"—গন্ধরাজ বললেন—"আপনার আর আমার মধ্যে ভয়ের ছায়া থাকুক, এটাও আমি চাই না। কারণ আমি ভুলি নি আমার সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক। বহুদিন থেকে আপনি এ রাজ্যের বিশ্বাসী কর্মচারী। কাগজপত্রের দরকার নেই, আপনি যদি মনে করেন ও বিষয়ে আমার হস্তক্ষেপ করা অনুচিত—তাও আমি করব। কিন্তু আপনার হাতেই তো এখন একগোছা কাগজ রয়েছে। কি এগুলো? দেখি। আশা করি ওগুলোর সম্বন্ধে আলোকপাত করতে আপনার আপত্তি নেই।"

"এগুলো?"—বলে' উঠলেন কুজ্ঝটিকুমার—"এগুলো বাজে কাগজ। গোয়েন্দা আর আরক্ষী বিভাগের লোকেরা পাঠিয়েছিল। ওই যে বাঙালী পর্যটকটি এসেছেন তাঁরই কিছু কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আমরা ভারতী মশাইয়ের কাছে দেখবার জন্য দিয়ে গিয়েছিলাম।"

"বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে?"—গন্ধরাজ বলে' উঠলেন—"কি রকম? খুলে বলুন সব।"

ইন্দীবর ভারতী বললেন—"রাঢ়ের ভগীরথ শর্মাকে কাল সন্ধ্যায় এখানে বন্দী করা হয়েছে।"

"সে কি! এ কথা কি সত্যি—?"

মহাধ্যক্ষ কুজ্ঝটিকুমারের দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন গন্ধরাজ।

"হ্যাঁ, সেইটেই সঙ্গত বলে' বিবেচিত হয়েছে"—একটু কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়লেন যেন মহাধ্যক্ষ—"বেআইনী কিছু হয় নি। মহারাজেরই ছাপ মোহর আর মহারাণীর দস্তখত অনুসারে আইনত সব কিছু করেছেন ওঁরা। আমি ভৃত্য মাত্র, আমার বাধা দেবার কি অধিকার আছে মহারাজ!"

"ভগীরথ শর্মা আমার রাজ্যের সম্মানিত অতিথি। তাঁকে বন্দী করেছেন আপনারা? কি দোষে? কোন অছিলায়?"

মহাধ্যক্ষ আমতা আমতা করতে লাগলেন।

ইন্দীবর ভারতী বললেন—"মহারাজ হয়তো ওই পাণ্ডুলিপি থেকেই বুঝতে পারবেন সেটা।"

কলম দিয়ে দেখিয়ে দিলেন তিনি পাণ্ডুলিপিটা।

গন্ধরাজ ইন্দীবরের দিকে সহাস্য দৃষ্টিতে চেয়ে মহাধ্যক্ষকে বললেন "দিন তাহলে ওটা, দেখি—"

মহাধ্যক্ষ কিন্তু ইতস্তত করতে লাগলেন।

"মহাসামন্ত কপিঞ্জল এ ব্যাপারটা নিজের হাতেই রাখতে চান। এক্ষেত্রে আমি বাহক মাত্র। এ পাণ্ডুলিপি হস্তান্তরিত করবার হুকুম নেই। ইন্দীবর ভারতী আশা করি আমাকে সমর্থন করবেন।"

"দেখুন মহাধ্যক্ষ মশাই, এসে থেকে ক্রমাগতই আপনি আবোল-তাবোল বকছেন। কিন্তু এখন যা বললেন তা মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। দিন, দিন ওগুলো। আমি আদেশ করছি আপনাকে। দিন—"

কুজ্ঝটিকুমার আর পারলেন না।

"তাই হোক। আমার এই অবাধ্যতার জন্য বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করছি, কিন্তু কি করব, আমি নাচার। যদি অনুমতি করেন তাহলে আমি এবার মন্ত্রণালয়ে যাই। সেখানে রাজ-কার্যের—"

"ওই চেয়ারটা দেখছেন? ওইটের উপরই বসুন এখন। ওইখানে বসেই রাজকার্য করুন আপাতত। না, না, আর কোন কথা বলবেন না"—কুজ্ঝটিকুমার কথা বলবার জন্যে মুখ খুলছিলেন—"নতুন মনিবের যে আপনি অতি বিশ্বস্ত চাকর তার অনেক প্রমাণ তো দিলেন। কিন্তু আমার সহ্যেরও তো একটা সীমা আছে।"

মহাধ্যক্ষ মশাই বিনাবাক্যব্যয়ে বসে' পড়লেন চেয়ারটাতে।

"দেখা যাক এবার এতে কি আছে"—পাণ্ডুলিপির কাগজগুলো

ওলটাতে লাগলেন গন্ধরাজ—"ও বাবা, এ যে দেখছি প্রকাণ্ড বই একটা।"

"হ্যাঁ"—ইন্দীবর বললেন—"ওটি একটি ভ্রমণকাহিনী। উনি নানা রাজ্যে ঘুরে ঘুরে যা যা দেখেছেন তাই লিখেছেন এতে।"

"তুমি পড়েছ বইখানা ?"

"না। আমি সূচীপত্রটা দেখেছি কেবল। বইটা কিন্তু খোলা অবস্থায় পেয়েছিলাম। আর ও সম্বন্ধে কোনও গোপনতা বা সতর্কতার কথাও তো আমাকে বলা হয় নি।"

গন্ধরাজ কুজ্ঝটির দিকে একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

"হুঁ"—গন্ধরাজ পাতা ওলটাতে ওলটাতে বললেন—"পৃথিবীর ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে গর্জনগাঁওয়ের মতো অতি ক্ষুদ্র অতি নগণ্য একটা রাজ্যে একজন গ্রন্থকারের লেখা পাণ্ডুলিপি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে—এর চেয়ে অকীর্তিকর মূর্খতা আর কি হ'তে পারে !"

তারপর কুজ্ঝটিকুমারের দিকে চেয়ে বললেন—"এরকম একটা ঘৃণ্য কাজে আপনি হাত দিয়েছেন ? আমার প্রতি আপনি সুবিচার করেছেন, না, অবিচার করেছেন সে কথা এখন থাক, কিন্তু আপনি, গর্জনগাঁওয়ের মহাধ্যক্ষ, গুপ্তচর হয়েছেন শেষে ? তাছাড়া একে আর কি বলব ! একজন গণ্যমান্য ভদ্রলোককে বন্দী করে, তাঁর ব্যক্তিগত কাগজপত্র, তাঁর সারাজীবনের সাধনা এই গ্রন্থ কেড়ে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে' যা করেছেন আপনি, তা কি কোনও ভদ্রলোকে করে কখনও ? এই ভগীরথ শর্মা আমার সম্মানিত অতিথি। বঙ্গরাজ প্রসন্নপল্লবের পরিচয়পত্র নিয়ে তিনি এসেছিলেন আমার রাজ্য পরিদর্শন করতে। তিনি শুধু বড় পণ্ডিতই নন, বড় যোদ্ধাও একজন। প্রসন্নপল্লব লিখেছিলেন উনি অভিজাত বংশের সন্তান, শস্ত্র এবং শাস্ত্র উভয় ক্ষেত্রেই পারঙ্গম। কিন্তু ওঁর দেশভ্রমণ করবার বাতিক আছে, তাই সারা ভারতের নানা রাজ্যে ঘুরে বেড়ান। আমি ওঁকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করেছিলাম। আমার

অবর্তমানে তাঁকে কোন্ সাহসে অপমান করেছেন আপনারা? কেন ওঁর গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করেছেন? গ্রন্থ নিয়ে কি করব আমরা? ইন্দীবর ভারতী হয়তো বলতে পারবেন গ্রন্থটি ভালো কি মন্দ, কিন্তু যদি মন্দই হয় তাহলে তা নষ্ট করবার অধিকার আমাদের আছে কি? তা যদি থাকতো তাহলে তো পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে ভাঁড়ের ভূমিকায় আমরা প্রথম হতাম!"

এ সব কথা বলতে বলতে গন্ধরাজ পাণ্ডুলিপিটি উলটে-পালটে দেখছিলেন। দেখলেন মলাটের উপর লেখা রয়েছে—"ভারতের নানা রাজ্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ। ভগীরথ শর্মা বিরচিত।" এরপরই সূচীপত্র। কোন কোন রাজ্যে তিনি গেছেন তারই একটা তালিকা। গন্ধরাজ দেখলেন উনবিংশ পরিচ্ছেদটি তিনি গর্জন-গাঁওয়ের সম্পর্কে লিখেছেন।

"গর্জনগাঁও সম্বন্ধেও লিখেছেন দেখছি। মজার হবে নিশ্চয়ই খুব।"

পড়বার জন্যে কৌতূহলী হ'য়ে উঠলেন তিনি।

"ভদ্রলোকের লেখার বৈশিষ্ট্য আছে একটা। তিনি প্রত্যেক রাজ্যে থেকে সে রাজ্য সম্বন্ধে লেখা আরম্ভ করেছেন এবং সে লেখা শেষ করে' তবে সে রাজ্য ত্যাগ করেছেন। মানে, সবই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। বইটা যখন প্রকাশিত হবে তখন আমি যোগাড় করব একটা।"

"এটা কি পড়া উচিত হবে।"

ইন্দীবর ভ্রূকুঞ্চিত করে' জানলার দিকে চেয়ে রইলেন। গন্ধরাজ অনুভব করলেন ইন্দীবরের ইচ্ছে নয় যে তিনি পড়েন।

"একবার একটু দেখে নি উলটে পালটে, তাতে আর ক্ষতিটা কি"—একটু হেসে আড়চোখে ইন্দীবরের দিকে চেয়ে পাণ্ডুলিপিটি প্রসারিত করে' বসলেন তিনি।

ছয়

ভগীরথ শর্মা ঊনবিংশ পরিচ্ছেদটি এই ভাবে আরম্ভ করেছিলেন।

"আপনারা সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন করিতে পারেন যে হিমালয়ের পাদদেশে তো গর্জনগাঁওয়ের মতো অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য আছে, সকলেই একরকম, সকলেই নামেমাত্র রাজ্য, সকলেই স্থূল-রুচি, সকলেই নীতি-বিবর্জিত,—তবে গর্জনগাঁওকেই আমি নির্বাচন করিলাম কেন। ঘটনাচক্র ইহার জন্য দায়ী, আমি স্বেচ্ছায় ইহা করি নাই। কিন্তু ইহাও বলিব, এজন্য আমার দুঃখও হয় নাই। এই ক্ষুদ্র রাজ্যের ক্ষুদ্র সমাজে শিক্ষণীয় কিছু পাইলাম না, নিজেদের বিকৃতির জারকরসে ইহারা ক্রমশই গলিত বিগলিত হইতেছে। এখানে শিখিবার কিছু নাই। কিন্তু এখানে আমি অনেক মজার জিনিস দেখিলাম। এখানে আমোদের অনেক উপকরণ মিলিয়াছে।

এখানকার যিনি মহারাজা—মহামহিম মহিমার্ণব শৈলসূত শ্রীমন গন্ধরাজ বর্মন, তিনি, আমার মনে হয় তেমন শিক্ষিত লোক নহেন। তাঁহার সাহসের অভাব আছে, কর্ম-প্রেরণাও নাই। তাঁহার প্রজাদের চক্ষে তিনি ঘৃণিত এবং হেয়। অনেক কষ্টে আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ লাভ করি। কারণ তিনি প্রায়ই রাজসভায় থাকেন না, বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ান। রাজসভায় কেহ তাঁহাকে গ্রাহ্য করে না। রাজসভায় যখন থাকেন তখন তাঁহাকে মহারাণীর প্রণয়-লীলায় আবরণ স্বরূপ থাকিতে হয়। এতদ্ব্যতীত রাজসভায় তাঁহার অন্য ভূমিকা নাই। তৃতীয়বারের চেষ্টায় আমি যখন সাক্ষাৎকারের অনুমতি পাইয়া রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করি তখন মহারাজাকে ওই ভূমিকাতেই দেখিয়াছিলাম। তাঁহার একপাশে মহারাণী, আর একপাশে মহারাণীর প্রণয়ী কপিঞ্জল। মহারাজ

কুদর্শন ব্যক্তি নহেন। মাথায় কালো কুঞ্চিত কেশদাম, চোখের তারা নীলাভ। কালো চুল আর নীলাভ চোখের সমন্বয় চারিত্রিক বা মানসিক দৌর্বল্য সূচিত করে। হয়তো এ দৌর্বল্য উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার শারীরিক সৌষ্ঠবে ছন্দ নাই, কিন্তু রূপ আছে। নাকটি ঈষৎ ছোট, মুখটি নারী-সুলভ। তাঁহার কথাবার্তা বলিবার ভঙ্গী মনোরম, তিনি সার্থকভাবে নিজের মনোভাব প্রকাশ করিতেও সক্ষম। কিন্তু তাঁহার এই মনোহর বহিরাবরণ ভেদ করিয়া অন্তরে প্রবেশ করিলে হতাশ হইতে হয়। সেখানে কোনও উৎকৃষ্ট গুণ নাই। আছে শিথিল নীতির আভাস, আছে চপলতা, আছে পরস্পরবিরোধী উদ্দেশ্যহীন অসংলগ্ন চিন্তাধারা। বর্তমান যুগের অবক্ষয়-বৃক্ষের তিনি একটি পাকা ফল। মাকাল ফল। সব-জান্তা পল্লবগ্রাহী গোছের লোক তিনি। নানা বিষয়ে অনেকক্ষণ বক্‌বক্‌ করিলেন, দেখিলাম একটি বিষয়েও তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞান নাই। তিনি বলিলেন, "আমি এক জিনিস নিয়ে বেশীক্ষণ থাকতে পারি না"—হাসিমুখেই কথাটা বলিলেন, যেন তাঁহার এই অক্ষমতা, এই চারিত্রিক দীনতা একটা বাহাদুরি, একটা গর্বের বস্তু। তাঁহার এই ঢিলা-ঢালা কান্ত কোমল দুর্বল চরিত্রের প্রভাব সর্বক্ষেত্রে পরিস্ফুট। তিনি অসিযুদ্ধ করেন, কিন্তু তিনি প্রথম শ্রেণীর অসি-যোদ্ধা নহেন। অশ্বারোহী, নর্তক, শিকারী—তিনি সবই, কিন্তু দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর। তিনি গানও করেন—আমি তাঁহার গান শুনিয়াছি—মনে হয় ছোট ছেলে গান গাহিতেছে। তিনি ভুল সংস্কৃতে বাজে কবিতাও লেখেন। অভিনয়ের শখও আছে, কিন্তু কৃতিত্ব নাই, নৈপুণ্য নাই, প্রতিভা নাই। সংক্ষেপে, তিনি বহুরকম ব্যাপারে লিপ্ত থাকেন, কিন্তু কোনটাই ভালো করিয়া করিতে পারেন না। একটিমাত্র পুরুষোচিত গুণ আছে তাঁহার, সেটি শিকার। এককথায়, তিনি নানা দুর্বলতার সঙ্গমক্ষেত্র। মনে হয় আসলে তিনি বোধহয় থিয়েটারের সখী,

তামাশা করিয়া কেহ বুঝি তাঁহাকে পুরুষবেশে সাজাইয়া ঘোড়ার পিঠে চড়াইয়া দিয়াছে! আমি দূর হইতে এই নকল-মহারাজাকে, এই মহারাজার অপচ্ছায়াকে, অশ্বপৃষ্ঠে কয়েকবার দেখিয়াছি। কখনও একাই চলিয়াছেন, কখনও বা দুই চারিজন শিকারী হয়তো সঙ্গে আছে। কেহ তাঁহাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেছে না। ব্যর্থ বিষণ্ণ এই চিত্রটি দেখিয়া আমি নিজেই বড় দুঃখ বোধ করিয়াছি। মহৎ রাজবংশের অন্তিমকালে হয়তো এইরূপ দুর্বল প্রতিভূদেরই আবির্ভাব ঘটে।

মহারাণী শতশ্রী সুরূপিণী, কপিলবাস্তুর মহারাজাধিরাজ উৎফুল্লগৌরবের কন্যা। স্বামীর মতোই তাঁহাকেও হয়তো নগণ্যা বলিতাম, কিন্তু তিনি একজন উচ্চাভিলাষী পুরুষের হস্তে শাণিত অস্ত্রের মতো হইয়া রহিয়াছেন বলিয়া তাঁহার অস্তিত্ব নিতান্ত তুচ্ছ করিবার মতো নহে। বয়সে তিনি গন্ধরাজ অপেক্ষা অনেক ছোট। শুনিয়াছি মাত্র বাইশ বৎসর বয়স তাঁহার। উপর-চালাক, দেমাকের মরাই, কিন্তু আসলে-নির্বোধ এই যুবতীটি যে খুব একটা রূপসী তাহাও নহেন। চক্ষু দুইটি বেশ বড় বড়, কিন্তু মুখের সহিত বেমানান, তারা দুইটি কালো নহে বাদামী। চক্ষু দুইটি ক্ষণকালও স্থির থাকে না, সর্বদাই ঘুরিতেছে। মহারাণীকে ঘূর্ণিতলোচনা আখ্যা দিলে অত্যুক্তি হয় না, চোখের দৃষ্টি হইতে মনে হয় মেয়েটি চপল এবং দুর্দান্ত। কপালটি বেশ উঁচু এবং অপ্রশস্ত। দেহের গঠন-সৌষ্ঠবও চমৎকার নহে। খুব রোগা এবং একটু কোল-কুঁজা ধরনের। সর্বদাই যেন সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়া আছেন। তাঁহার ধরন-ধারণ, কথাবার্তা, তাঁহার রুচি, এমন কি তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পর্যন্ত কোনটাই যেন স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। মনে হয় যেন অভিনয় করিতেছেন। আর অভিনয়টাও অপটু বলিয়া সমস্তটাই কুৎসিত এবং দৃষ্টিকটু। কোন বগী বা বিন্দী দ্রৌপদীর ভূমিকায় অবতরণ করিলে যে হাস্যকর ব্যাপার ঘটে, এ যেন তাহাই

ঘটিয়াছে। সত্যের সম্বন্ধে বা শালীনতা বিষয়ে ইহার কোনও নিষ্ঠা আছে বলিয়া মনে হয় না। সমাজে এই জাতীয় মেয়েরাই গোপনে প্রণয়ীপরিবৃত হইয়া সংসারের সুখশান্তি নষ্ট করে এবং হয়তো স্বামী-পরিত্যক্তা হইয়া অবশেষে স্বৈরিণী-জীবনের নরককুণ্ডে নিপাতিত হয়। মহারাণীর মধ্যে অসাধারণ কোনও গুণই নাই এবং ছিদ্রান্বেষী নারী-বিদ্বেষী ছাড়া আর কেহ যে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইবেন তাহাও মনে হয় না। কিন্তু সিংহাসনে বসিয়া এই রমণী কপিঞ্জলের মতো লোকের দ্বারা চালিত হইলে জনসাধারণের গুরুতর ক্ষতি ও অনিষ্ট সাধন করিতে পারে।

কপিঞ্জলই বর্তমানে এই হতভাগ্য রাজ্যের আসল রাজা। কপিঞ্জল ব্যক্তিটি জটিল চরিত্রের লোক। গর্জনগাঁওয়ে তিনি বিদেশী, সে হিসাবে এখানে তাঁহার পদ-মর্যাদা মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। তথাপি সে পদ-মর্যাদা তিনি যে ভাবে রক্ষা করিতেছেন তাহাকে ধৃষ্টতা ও দক্ষতার একটা আশ্চর্য কীর্তি ছাড়া আর কি বলা যায়। প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চতুর লোক তিনি। তাঁহার কথাবার্তা, তাঁহার মুখভাব, তাঁহার নীতি—সবই কপটতাপূর্ণ। মুড়া এবং ল্যাজা একসঙ্গে। অতিবড় বুদ্ধিমান লোকও ঠাহর করিতে পারিবেন না তাঁহার আসল অভিপ্রায়টা কি। তবু আমি সাহস করিয়া একটা আন্দাজ করিতেছি। মনে হয় তিনি দুই নৌকাতেই পা দিয়া অপেক্ষা করিতেছেন ভাগ্যের অনুকূল পবন কোন নৌকার পালে লাগে। যেটাতে লাগিবে সেইটাই তিনি বাহিবেন। বুদ্ধিমান লোকেদের উপর ভাগ্যবিধাতার কৃপা প্রায়ই অকৃপণ ধারায় বর্ষিত হয়।

অপদার্থ গন্ধরাজের প্রধানমন্ত্রীরূপে এবং প্রণয়-বিহ্বলা সুরূপিণীকে অস্ত্র এবং মুখপাত্রী হিসাবে ব্যবহার করিয়া কপিঞ্জল এখন স্বেচ্ছাচার-ক্ষমতা-দৃপ্ত এবং রাষ্ট্রীয় উন্নতি বিধানে বদ্ধপরিকর। রাজ্যের সমস্ত সমর্থ পুরুষকে তিনি সেনাদলে ভরতি করিয়াছেন।

অনেক কামান কেনা হইয়াছে এবং বিদেশ হইতে অনেক রণ-নিপুণ সেনানায়কও তাঁহার প্ররোচনায় গর্জনগাঁওয়ের সেনা-বিভাগে যোগদান করিতে প্রলুব্ধ হইয়াছেন। আন্তর্জাতিক রঙ্গমঞ্চে প্রচ্ছন্নভাষায় তর্জনগর্জন করিয়া এখন তিনি যাহা করিতেছেন তাহা গুণ্ডাকেই মানায়। তিনি ঘোষণা করিয়াছেন গর্জনগাঁও এবার দিগ্বিজয়ে বাহির হইবে। গর্জনগাঁওয়ের মতো ক্ষুদ্র রাজ্য তাহার পরিধি বিস্তার করিবে ইহা বাতুলতা বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু গর্জনগাঁওয়ের একটা সুবিধা আছে। যদিও সে আয়তনে ছোট কিন্তু পর্বত-অরণ্য পরিবৃত হইয়া এমন স্থানে সে অবস্থিত যে সামরিক দৃষ্টিতে তাহাকে নিরাপদই বলা চলে। তাহার পার্শ্ববর্তী ছোট ছোট রাজ্যগুলিও অরক্ষিত এবং অসহায়। যদি কোন সময়ে হিমাচল প্রদেশের শক্তিমান রাজ্যগুলি পরস্পরের হিংসায় অন্ধ হইয়া পড়ে, আর গর্জনগাঁও যদি সেই সুযোগে একটু তৎপরতা দেখায় তাহা হইলে অনায়াসেই তাহার রাজ্যের সীমানা এবং জনসংখ্যা দ্বিগুণ হইয়া যাইতে পারে। গর্জনগাঁওয়ের রাজধানী পার্বতীর রাজসভায় এখন ইহা লইয়াই জল্পনাকল্পনা চলিতেছে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি ইহাকে নিতান্ত অবাস্তব বলিয়াও মনে করি না। অনেক ছোট রাজ্য যে এই ধরনের সু:যোগ সুবিধার সহায়তা লইয়া বৃহৎ শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হইয়াছে ইহার উদাহরণ ইতিহাসে বিরল নহে। যদিও এখন হাওয়া বদলাইয়াছে এবং যদিও এখন দিগ্বিজয়ের কাহিনী পৌরাণিক আখ্যায়িকায় পর্যবসিত হইয়া আমাদের অবসর-বিনোদন করিতেছে, তবু একথাও অস্বীকার করা যায় না যে অপ্রত্যাশিত ঘটনা এখনও ঘটে, ভাগ্যের অঙ্গুলি-হেলনে এখনও অনেক রাজ্যের এবং জাতির উত্থান-পতন নির্ণীত হয়। গর্জনগাঁওয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল করবৃদ্ধি এবং স্বাধীন মতামতের কণ্ঠরোধ। তিন বৎসর পূর্বে যে দেশে সুখ-শান্তির প্রাচুর্য ছিল সে দেশ এখন নিষ্ক্রিয়, প্রাণহীন। দেশের সমস্ত স্বর্ণ অন্তর্ধান করিয়াছে,

দেশের সমস্ত নির্ঝরিণীচালিত যন্ত্রগুলি অচল। সমস্ত সমর্থ লোককে সেনাদলে যোগ দিতে বাধ্য করা হইয়াছে।

কপিঞ্জল এখানকার আপোষ-নিষ্পত্তির বিচারক। সে ভূমিকাতেও তিনি আর এক কাণ্ড করিতেছিলেন। রাজ্যের বড় বড় পান্থশালায় বিচারের ওজুহাতে অবতারের মর্যাদায় সম্বর্ধিত হইয়া তিনি সংঘবদ্ধ সভাগুলিতে যাহা করিতেছিলেন তাহা বিচার নহে, ষড়যন্ত্র, তাহা রাজার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার। অবশ্য সভা না বলিয়া এগুলিকে আড্ডা বলাই সঙ্গত। এখানে আসিবার বহু পূর্ব হইতেই আমি রাজতন্ত্রবিরোধী আন্দোলনের সমর্থক। কোথাও কোন মন্তব্য বা আচরণ দ্বারা ইহার প্রতিকূলতা আমি করি নাই। তাই এ ধরনের অনেক আড্ডায় আমার স্বচ্ছন্দ গতিবিধি ছিল। সুতরাং যাহা লিখিতেছি তাহা গুজব-মাত্র নহে, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। একটি সভায় গণতন্ত্রের সংবিধান কিরূপ হইবে তাহা লইয়া বিশদ আলোচনা চলিতেছিল। লক্ষ্য করিলাম সে আলোচনায় সকলেই কপিঞ্জলকেই সর্ববিষয়ে কর্ণধাররূপে মানিয়া লইতেছে। মনে হইল কপিঞ্জল ইহাদের সকলকেই সম্মোহিত করিয়াছে। তিনি প্রচার করিতেছেন যে মহারাণী সুরূপিণীর মোহিনীশক্তির বিরুদ্ধে তিনি আর কত যুদ্ধ করিবেন, তাঁহার শক্তির একটা সীমা আছে তো। নানারূপ ভুয়া যুক্তি দর্শাইয়া ইহাও তিনি বার বার বলিতেছেন ঠিক এই মুহূর্তে বিপ্লবের দামামা বাজানো সমীচীন হইবে না। কিন্তু তিনি যে রাজনীতিতে বিচক্ষণ এবং প্রজাদের হিতৈষী ইহা জাহির করিবার জন্য তিনি ইহাও বলিতেছেন যে দামামা না বাজাইলেও বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতি দরকার। প্রত্যেক সমর্থ লোককে তিনি সৈন্যদলে জোর করিয়া টানিয়া আনিয়াছেন, ইহাতে অনেকের মনে অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। সেই ক্ষতের উপর এই বলিয়া তিনি মলম লাগাইতেছেন যে সৈন্যদলে ভরতি হইলে সকলেরই একটা সামরিক শিক্ষা ও নিপুণতা হইবে—যাহা না থাকিলে কোনও বিদ্রোহই

কখনও সফল হয় না। বিদ্রোহ করিয়া এই রাজতন্ত্রকে ধ্বংস করাই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে প্রত্যেককেই শিক্ষিত সৈনিক হইতে হইবে। সেদিন আর একটা গুজব শুনিয়া অবাক হইলাম। গর্জনগাঁও নাকি নিরীহ প্রতিবেশী রাজ্য ভৈরঙ্গীকে আক্রমণ করিবে। মনে হইল—প্রজারা এইবার বোধহয় কপিঞ্জলের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া উঠিবে। অনিচ্ছুক নির্বিরোধী প্রতিবেশী ভৈরঙ্গীর উপর জোর করিয়া যুদ্ধ চাপাইয়া দেওয়া বর্বরতার নামান্তর মাত্র। গর্জনগাঁওয়ের প্রজারা নিশ্চয় ইহা সহ্য করিবে না। কিন্তু বাজারে গিয়া যাহা শুনিলাম তাহাতে আরও অবাক হইতে হইল। গর্জনগাঁওয়ের উদারপন্থী রাজনৈতিক দলও দেখিলাম কপিঞ্জলের জাদুমন্ত্রে বশীভূত হইয়া বলিতেছে—"যাক না, ছোঁড়াগুলো আসল যুদ্ধ কাকে বলে তা দেখে আসুক। হাতে-কলমে কাজ শেখাই তো ভালো।" সকলেরই মুখে এই কথা, সকলেই বর্বর কপিঞ্জলের ভুয়া যুক্তি মানিয়া লইয়াছে, সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ! সকলেরই মুখে শুনিলাম—"ওরা ভৈরঙ্গী আক্রমণ করে' হাতে-কলমে যুদ্ধটা শিখে আসুক। ভৈরঙ্গীকে আমাদের সীমানা-ভুক্ত করাই তো ভালো। তাতে আমাদের শক্তি বাড়বে। চাই কি এর পর আমরা আরও এগিয়ে যেতে পারব। আমাদের স্বাধীন গণতন্ত্র আরও শক্তিশালী হবে। ভারতবর্ষের সব রাজারাও যদি একজোট হ'য়ে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাহলেও আমাদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না কেউ।" সব শৃগালের মুখেই ওই একই—'হুক্কা হুয়া'। আমি কিসের বেশী প্রশংসা করিব ভাবিয়া পাইতেছি না—গর্জনগাঁওয়ের প্রজাপুঞ্জের সরলতার, না, ভাগ্যান্বেষী এই লোকটার ধৃষ্টতার। ধূর্তটা সত্যই নানা ছলনার জাল বিস্তার করিয়া গর্জনগাঁওয়ের সকলকে নিজের কুক্ষিগত করিয়াছে। অবশ্য এই সর্পিল বিপদসঙ্কুল পথে তিনি কতদিন নিরাপদে চলিতে পারিবেন তাহা জানি না। মনে হয় বেশীদিন পারিবেন না। কিন্তু ইহাও সত্য গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া তিনি এই জটিল গোলকধাঁধায়

স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছেন এবং যতদূর জানি, রাজসভায় এবং জনসাধারণের মধ্যে তাঁহার প্রভাব কখনও কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

আমার সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয়ের কিঞ্চিৎ সুযোগ ঘটিয়াছে। অদ্ভুত চেহারা ভদ্রলোকের। কদাকার গড়ন। প্রকাণ্ড নড়বড়ে' শরীর, মনে হয় শরীরের কোথাও যেন মজবুত বাঁধুনি নাই, লম্বাচওড়া খাপছাড়া তাঁবুর মতো একটা চেহারা। অথচ যে কোনও সময়ে ইচ্ছা করিলে তিনি এই শরীরটাকে টানিয়া টুনিয়া গুটাইয়া নৃত্যের আসরের উপযোগী করিয়াও তুলিতে পারেন। তাঁহার বর্ণ এবং মেজাজ দুইই কবিরাজী ভাষায়—পিত্তপ্রধান। চোখের দৃষ্টি সর্বদাই অপ্রসন্ন। ক্ষৌরীকৃত গণ্ড এবং চিবুক ঘননীল। চোয়ালটা যেন সামনের দিকে ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। দেখিলেই বোঝা যায় তিনি সকলকে ঘৃণা করেন, এমন কি তাঁহার দলের লোকদেরও। অথচ নিজে তিনি সাধারণ স্তরের উর্ধ্বে উঠতে পারেন নাই, সাধারণ লোকের মতই তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং প্রশংসালোলুপ। লক্ষ্য করিয়াছি কথাবার্তা বলিবার সময় নানারকম খবর সংগ্রহ করিবার জন্যই তিনি বেশী উৎসুক, নিজে তেমন কিছু বলিতে চান না, কেবল শুনিতে চান, বিশেষত খাঁটি কথা এবং সার সত্য শুনিবার আগ্রহটা খুবই প্রবল। মামুলী রাজনৈতিক নেতারা সাধারণত অদূরদর্শী হন, সে মানদণ্ডে মাপিলে কপিঞ্জলকে দূরদর্শী বলা চলে। গুণ তাঁহার আছে কিন্তু মহিমা নাই, লাবণ্য নাই, দ্যুতি নাই। সমস্তই যেন তাঁহার ওই জবড়জং চেহারার মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে। তাঁহার সহিত আমার অনেকবার সাক্ষাৎ হইয়াছে, আলাপ করিবার সময় তাঁহার সসম্ভ্রম ব্যবহারও লক্ষ্য করিয়াছি, কিন্তু তাঁহার ওৎ-পাতা-ভাবটা আমি সহ্য করিতে পারি নাই। প্রত্যেকবারই মনে হইয়াছে তিনি আমার আলাপ হইতে কৌশলে কি যেন বাহির করিয়া লইতে চান। মোট কথা লোকটাকে

ভদ্রলোক বলিয়া মনেই হয় না। কথাবার্তায় রসের অপেক্ষা কষই বেশী। শোভনতাও নাই। সুরূপিণী যে তাঁহার প্রেমাস্পদা এটা তিনি খুব সাড়ম্বরে বিজ্ঞাপিত করিতে চান। কোন ভদ্রলোক এরূপ করিত না, গন্ধরাজ যে তাঁহাকে এতদিন ধরিয়া সহ্য করিতেছেন ইহার প্রতিদানে কোনও ভদ্রলোক তাঁহাকে এমনভাবে অপমান বা অবজ্ঞাও করিত না। কপিঞ্জল এত অভদ্র যে গন্ধরাজের নানারকম হাস্যকর নামকরণ করিয়া সেটা বাজারে চালু করিয়াছেন। ক্যাবলাকান্ত, গন্ধ-গোকুল প্রভৃতি নাম লইয়া গর্জনগাঁওয়ের লোকেরা নিত্যই হাসা-হাসি করে। কপিঞ্জলের চরিত্রে এই ধরনের একটা গ্রাম্য চাষাড়ে ভাব বর্তমান, অথচ তাঁহার মনে মনে অহঙ্কারও খুব যে তিনি উচ্চকুলোদ্ভব একটা হোমরাচোমরা বুদ্ধিমান ব্যক্তি। গর্জনগাঁওয়ের রাজসভায় এই অসভ্য, কদর্য, স্বার্থপর জানোয়ারটা বিরাট দুঃস্বপ্নের মতো জাঁকাইয়া বসিয়া আছে।

ইহাও হয়তো সম্ভব যে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য লোকটা মাঝে মাঝে কোমলও হইতে পারে। যদিও ব্যক্তিগতভাবে আমি কোন প্রমাণ পাই নাই কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত যে এই কাষ্ঠপ্রতিম রাজনীতিবিদটি প্রয়োজন হইলে অনুগ্রহভিক্ষা করিবার জন্য যে কোনও লোকের কাছে যে কোনও ভাবে নিজেকে অবনত করিতে ইতস্তত করেন না। সম্ভবত এই জন্যই এখানে একটা গুজব প্রচলিত আছে যে গোপনে গোপনে কপিঞ্জল একটি খলিফা এবং খেলোয়াড় প্রেমিক। বিহার প্রদেশে চলিত কথায় যাহাকে 'লুচ্চা' বলে, তাহাই। সুরূপিণীর সঙ্গে তাঁহার সম্পর্কটা খুবই আশ্চর্যজনক। কপিঞ্জল গন্ধরাজের অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়, চেহারাতেও ঢের বেশী কুৎসিত, নারীদের চিত্ত জয় করিতে হইলে যে সব গুণ দরকার তাহাও তাঁহার মধ্যে নাই অথচ ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এই লোকটাই রাণীর সমস্ত চিত্ত এবং কর্মকে নিয়ন্ত্রিত

করিয়া লোকচক্ষে তাঁহাকে হেয় প্রতিপন্ন করিয়াছে। অসতী বলিয়া দুর্নাম হইয়াছে বলিয়াই তাঁহাকে হেয় বলিতেছি তাহা নহে, অনেক রমণীর কাছে অসতীত্বটাই অলঙ্কার স্বরূপ। কিন্তু এই রাজসভায় আর একটি শিথিল-সুনাম মহিলাও আছেন। রাণী রঞ্জাবতী তাঁহার নাম, জানি না তিনি কোন্ অজ্ঞাতকুলশীল রাজার বিধবা অথবা সধবা পত্নী, তাঁহার যৌবনও বিগতপ্রায়, দেহে রূপের রশ্মিও ম্লান হইয়া আসিয়াছে কিন্তু এসব সত্বেও তিনি এই রাজসভায় প্রকাশ্যভাবে এবং অবিসংবাদিতরূপে কপিঞ্জলের রক্ষিতা উপপত্নী-রূপে স্বীকৃতা। আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম আসল পাপীয়সীকে আড়াল করিবার জন্যই বোধহয় এই মহিলাকে ভাড়া করিয়া আনা হইয়াছে। কিন্তু রাণী রঞ্জাবতীর সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করিয়াই আমার এ ভ্রম দূর হইয়াছে। কাহারও কলঙ্ক ঢাকিবার বিন্দুমাত্র প্রবৃত্তি নাই কলঙ্কিনীর, কলঙ্ক ফলাও করিবার দিকেই তাঁহার ঝোঁক বেশী। তিনি যে ভাড়া-করা পরদামাত্র নহেন তাহাও বুঝিলাম যখন জানিলাম যে টাকা-কড়ি মান-সম্মান প্রতাপ-প্রতিপত্তি অর্থাৎ যে সব বখশিস এ ধরনের মেয়েদের প্রলুব্ধ বা ভূষিত করে—সে সব জিনিসের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র লোভ নাই। তিনি অনাচ্ছাদিত, নির্ভেজাল শয়তানী। গর্জনগাঁওয়ের রাজসভায় এই অনাবৃতা নগ্না প্রকৃতির সহিত আলাপ করিয়া আমার কিন্তু ভালই লাগিয়াছিল।

সুরূপিণীর উপর কপিঞ্জলের প্রভাব সুতরাং সীমাহীন। এই লোকটির স্তুতিতে বিগলিত হইয়া সুরূপিণী তাঁহার পবিত্র বিবাহ-বন্ধনকে কলঙ্কিত করিয়াছেন, জনসাধারণের শ্রদ্ধা হারাইয়াছেন কিন্তু যাহা সর্বাপেক্ষা বেশী আশ্চর্যজনক যে নারীসুলভ ঈর্ষা নারীত্বের প্রধান লক্ষণ তাহাও যেন তাঁহার মধ্যে নির্বাপিত। যদিও তিনি একটা আহামরি সুন্দরী নন, তবুও তিনি যুবতী তো, তিনি পিতৃকুল এবং শ্বশুরকুল উভয় দিক দিয়া একজন অভিজাত-

বংশীয়া রাজকুমারীও, তিনি ওই আধা-বুড়ী, মায়ের-বয়সী, নীচ-কুলোদ্ভবা রঙ্গাবতীর সদম্ভ প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন—ইহা বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার। বাস্তবিকই ইহা একটি রহস্য। গুপ্ত প্রণয়ের অগ্নি ইন্ধন পাইলে শেষে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে, বেশী দিন তাহা গুপ্ত থাকে না। এই হতভাগিনী সুরূপিণীর মতিগতি এবং চরিত্র দেখিয়া মনে হয় উচ্ছন্নের শেষ সীমা পর্যন্ত যাইতে ইনি কুণ্ঠিত হইবেন না সে সম্ভাবনাটা অন্ততঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

সাত

পড়তে পড়তে গন্ধরাজের নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হ'য়ে উঠেছিল। চোখের দৃষ্টি থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল ক্রোধের স্ফুলিঙ্গ। শেষে তিনি আর পড়তে পারলেন না—ঠেলে সরিয়ে দিলেন খাতাখানা। ক্রোধে আত্মহারা হ'য়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন।

"এ লোকটা দেখছি শয়তান"—বলে' উঠলেন তিনি—"এ লেখার যেমন ভাব তেমনি ভাষা। নানারকম কেচ্ছা সংগ্রহ করে' বই লিখেছে! আশ্চর্য! কোথায় একে রেখেছেন মহাধ্যক্ষ মশাই?"

"আমাদের পতাকা-বুরুজে রাখা হয়েছে ওঁকে"—উত্তর দিলেন কুজ্ঝটিকুমার—"ধীমান-মহলে আছেন উনি।"

"আমাকে নিয়ে চলুন সেখানে"—গন্ধরাজ বললেন,—তারপর আর একটা কথা মনে হওয়াতে প্রশ্ন করলেন—"এইজন্যেই কি বাগানে প্রহরীর সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে?"

"তা তো আমার জানা নেই। প্রহরীরা কোথায় থাকবে তা ঠিক করা তো আমার কর্তব্য নয় মহারাজ।"

গন্ধরাজ সক্রোধে তাঁর দিকে ফিরে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু ইন্দীবর তাঁর বাহুতে মৃদু স্পর্শ করায়, কিছু আর বললেন না।

"বুঝলাম। এখন নিয়ে চলুন আমাকে পতাকা-বুরুজে।"

মহাধ্যক্ষ প্রস্তুত হলেন সঙ্গে সঙ্গে। একটু পরেই বেরিয়ে পড়লেন দুজনে। গ্রন্থাগার থেকে পতাকা-বুরুজ নিতান্ত কাছে নয়, পথও জটিল। রাজপ্রাসাদের যে অংশ সম্প্রতি নির্মিত হয়েছে গ্রন্থাগারটি তাতেই অবস্থিত। কিন্তু পতাকা-বুরুজ—যার উপরে গর্জনগাঁওয়ের পতাকা ওড়ে—পুরাতন প্রাসাদের সমুচ্চ প্রাকার সংলগ্ন, বাগানের ঠিক ওপরে। নানাপ্রকার সিঁড়ি আর বারান্দা

অতিক্রম করে' তাঁরা অবশেষে একটা বাঁধানো প্রাঙ্গণের মতো জায়গায় এসে পড়লেন। তার একধারে একটা উঁচু পাথরের জাফরি-দেওয়া দেওয়ালের ভিতর দিয়ে বাগানের শোভা দেখা যাচ্ছিল, বিশেষ করে' সবুজ শোভা। ত্রিকোণ প্রাচীর সমন্বিত বড় বড় অট্টালিকার শ্রেণী ধাপে ধাপে উঠে গেছে চারিদিকে, আর পতাকা-বুরুজ সর্বোচ্চ শিখরে নীল আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে গর্বভরে। বুরুজের উপর বাসা তৈরি করছিল দাঁড়কাকেরা আর তাদের বাসার উপরে উড়ছিল গর্জনগাঁওয়ের পতাকা। বুরুজের সিঁড়ির নীচে একজন প্রহরী ছিল। সে সামরিক রীতিতে অভিবাদন জানাল। আর একটু উঠে দ্বিতীয় প্রহরীর দেখা পাওয়া গেল. আর একটু উঠে তৃতীয় প্রহরীর।

"এই মাটির ঢেলাটাকে দেখছি রত্নের মর্যাদা দিয়ে রক্ষা করা হচ্ছে"—একটু ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন গন্ধরাজ।

ধীমান-মহলের একটু ইতিহাস আছে। বিখ্যাত স্থপতি ধীমানের কোনও বংশধর এটি নাকি নির্মাণ করেছিলেন গন্ধরাজের প্রপিতামহের আমোলে এবং এটির নামকরণও তিনি করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত পূর্বপুরুষের নামানুসারে। ধীমান-মহলের ঘরগুলি বেশ বড় বড়। প্রচুর আলো-বাতাস। প্রত্যেক ঘর থেকেই বাগানের শোভা দেখা যায়। কিন্তু দেওয়ালগুলি খুব চওড়া (সেকালে এইরকমই রীতি ছিল) আর জানলাগুলিতে মোটা মোটা গরাদে লাগানো। কুজ্ঝটিকুমার প্রায় ছুটতে ছুটতে আসছিলেন গন্ধরাজের পিছু পিছু, গন্ধরাজের গতিবেগের সঙ্গে তাল রাখতে পারছিলেন না তিনি। গন্ধরাজ দ্রুতপদে পাঠাগারের এবং বিরাম-কক্ষের ভিতর দিয়ে গিয়ে একবারে অশনিপাতের মতো ঢুকলেন গিয়ে শয়নকক্ষে। ভগীরথ শর্মা স্নান সেরে গা মুছছিলেন। ভগীরথ শর্মার বয়স যদিও পঞ্চাশ, কিন্তু তিনি বেশ শক্তসমর্থ। চোখে মুখে সাহসের এবং আত্মপ্রত্যয়ের দীপ্তিও সুপরিস্ফুট। এই আকস্মিক

আবির্ভাবে বিশেষ বিচলিত হলেন না তিনি, বরং একটু যেন ব্যঙ্গ-ভরেই অভিবাদন করে' বললেন—"ও আপনি! এই আকস্মিক সম্মানবর্ষণের হেতু কি মহারাজ?"

"আপনি আমার অতিথি, আমি দু'হাত বাড়িয়ে আপনাকে সম্বর্ধনা করেছি, আপনি আমার অন্ন খেয়েছেন, আমার বাড়িতে সম্মানিত অতিথির মর্যাদায় স্থান পেয়েছেন। আমার আতিথ্যে কোনও ত্রুটি ছিল কি? সম্মানিত অতিথির কোনও অনুরোধ পালনে বিলম্ব ঘটেছিল কি? আপনি তার চমৎকার প্রতিদানও দিয়েছেন। এই যে—"

তিনি পাণ্ডুলিপিটি তুলে দেখালেন।

"মহারাজ কি ওটি পড়েছেন? খুবই আনন্দিত এবং সম্মানিত হলাম। কিন্তু ওটা খসড়া মাত্র, অনেক ত্রুটি আছে ওতে। আরও অনেক কিছু লিখতেও হবে। একথাটা অন্তত লিখতেই হবে যে মহারাজকে আমি অলস বলে' সমালোচনা করেছি তিনি আরক্ষী হিসাবে খুবই সতর্ক এবং কর্তব্যবোধে অপ্রিয় ঘৃণ্য কাজ করতেও পরাঙ্মুখ হন না। একথাটা আমাকে লিখতেই হবে। আমাকে বন্দী করার যে প্রহসনটা হ'য়ে গেল আর আপনি যে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে দর্শন দিয়ে আমাকে সম্মানিত করলেন—এসবও লিখব আমি। যে বঙ্গরাজ প্রসন্নপল্লবের পরিচয়পত্র নিয়ে আপনার রাজ্যে আমি প্রবেশ করেছিলাম তাঁকে আমি খবর পাঠিয়েছি আপনি আমার সঙ্গে কেমন সদ্ব্যবহার করেছেন। আমার বিশ্বাস, আপনি যদি আমাকে হত্যা না করেন, তাহলে আমি আপনার কারাগার থেকে এক সপ্তাহের মধ্যেই মুক্তি পাব, তা সেটা আপনাদের ভালো লাগুক বা না লাগুক। কারণ আমার ধারণা ভবিষ্যৎ গর্জনগাঁও সাম্রাজ্যের শক্তি এখনও তেমন প্রবল হয় নি যে সে সমরাঙ্গনে বঙ্গরাজের সম্মুখীন হতে পারে। আমি মনে করি আমাদের শোধ-বোধ হ'য়ে গেছে। আপনাকে কোনরকম জবাবদিহি দিতেও আমি

বাধ্য নই। আপনিই ভুল করছেন। আমি ওই খাতায় যা লিখেছি তার মধ্যে সত্যিই যদি প্রবেশ করতে পেরে থাকেন তাহলে আপনারই উচিত আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া। আমি আপনার চোখ খুলে দিয়েছি। আমি এইমাত্র স্নান সমাপন করেছি, এখনও কাপড়চোপড় পরা হয় নি, সেজন্য অনুরোধ করছি আপনি এখন বাইরে যান—”

ঘরে একটা টেবিল ছিল আর তার উপর শাদা কাগজও ছিল কিছু। গন্ধরাজ একটা আসন টেনে উপবেশন করে' একটা কাগজে ভগীরথ শর্মার ছাড়-পত্র লিখে ফেললেন খস্‌খস্‌ করে'। তারপর মহাধ্যক্ষের দিকে চেয়ে বললেন—“এটাতে মোহর দিয়ে দিন।”

কুজ্‌ঝটিকুমারের হাতে একটি লাল রঙের থলি ছিল। তিনি তার থেকে টিকিটের মতো কি একটা বার করে' সেঁটে দিলেন কাগজে। তাঁর বিচলিত মূর্তি এবং বেকুবের মতো হাবভাব সত্যই যেন প্রহসন করে' তুলল ব্যাপারটাকে। ভগীরথ শর্মা তির্যক-দৃষ্টিতে নীরবে উপভোগ করতে লাগলেন দৃশ্যটা। কুজ্‌ঝটিকুমারের আনুগত্যের এই অনাবশ্যক আতিশয্যে গন্ধরাজের কানের ডগা লাল হ'য়ে উঠল, কিন্তু তখন রাগটা হজম করা ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না। মহাধ্যক্ষ মশায় অবশেষে কার্যটি সমাধা করলেন এবং আদেশের অপেক্ষা না রেখে সইও করে' দিলেন।

গন্ধরাজ বললেন—“আপনি এবার আমার একটি ভালো গাড়ি ঠিক করবার ব্যবস্থা করুন। আপনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে গাড়িতে ভগীরথ শর্মার জিনিসপত্রগুলো তুলিয়ে দিন। গাড়িটা যেন ময়ূরমহলের সামনে অপেক্ষা করে। ভগীরথ শর্মা আজই বঙ্গদেশে ফিরে যাবেন।”

মহাধ্যক্ষ সাড়ম্বরে অভিবাদন করে' বিদায় নিলেন।

“এই আপনার ছাড়-পত্র”—ভগীরথ শর্মার দিকে চেয়ে গন্ধরাজ

বললেন—"আপনার প্রতি অসৌজন্য প্রকাশ করা হয়েছিল বলে' আমি আন্তরিক দুঃখিত।"

"বেশ, বঙ্গরাজের সঙ্গে আপনাদের আর যুদ্ধ হবে না।"

"না মশাই, অত সহজে আপনাকে রেহাই দেব না। শিষ্টাচারের দাবি আপনাকে মানতে হবে। এখন আপনি আর বন্দী নন। আপনি আমি দুজনেই এখন সমান। আমি আপনাকে বন্দী করবার আদেশ দিই নি। কাল অনেক রাত্রে আমি শিকার থেকে ফিরেছি। আপনাকে বন্দী করবার জন্যে দোষ দিতে পারবেন না, বরং যদি ইচ্ছে করেন মুক্তি দেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ দিতে পারেন।"

"কিন্তু আপনি আমার কাগজপত্রগুলো তো পড়েছেন—"

"সেটা আমার অন্যায় হয়েছে। তার জন্যে আমি ক্ষমাও চাইছি। আপনি তো জানেনই আমি দুর্বলচিত্ত, দুর্বলকে ক্ষমা করাই মহতের ধর্ম। আপনার কাগজপত্রও ইচ্ছে করে' পড়ি নি—অপ্রত্যাশিতভাবে আমার হাতে এসে গেছে। আপনি যা লিখেছেন তা যদি নির্দোষ গ্লানিহীন হ'ত—তাহলে আমি যা করেছি তাকে বড় জোর আপনি অবিমৃষ্যকারিতা বলতে পারতেন। কিন্তু আপনি যা লিখেছেন তা আমার আত্মসম্মানকে আঘাত করেছে।"

ভগীরথ শর্মার চোখের দৃষ্টিতে একটা হাসির ঝলক ফুটে উঠল। তিনি কিছু না বলে' অভিবাদন করলেন শুধু।

গন্ধরাজ বলতে লাগলেন—"আপনি এখন স্বাধীন, আপনাকে এখন আমি একটা অনুরোধ করতে চাই। আমার অনুরোধ আপনি আমার সঙ্গে একা ওই বাগানে চলুন।"

"মহারাজ যে মুহূর্তে আমার স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিয়েছেন"—ভগীরথ শর্মা সসম্ভ্রমে বললেন—"সেই মুহূর্ত থেকে আমি মহারাজের আদেশ পালন করতে প্রস্তুত। আমি এইমাত্র স্নান সেরে উঠেছি, এখনও পোশাক পরি নি। তবু যদি আপনি আদেশ করেন, এই ভাবেই আমি আপনার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত আছি।"

"অনেক ধন্যবাদ। আসুন তাহলে।"

অবিলম্বে বেরিয়ে পড়লেন দুজনে। গন্ধরাজ আগে আগে যেতে লাগলেন, ভগীরথ পিছু পিছু। বুরুজের সিঁড়ি ভাঙবার সময় তাঁদের পদশব্দে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল বুরুজের গম্বুজ। সিঁড়ি থেকে নেমে সেই জাফরি-কাটা দেওয়াল পেরিয়ে তাঁরা এসে পড়লেন বাগানের উন্মুক্ত বাতাসে। রৌদ্রকিরণে ঝলমল করছিল চতুর্দিক, শোভা বিকীর্ণ করছিল ফুলের দল। তারপর মীন-দীঘির পাশ দিয়ে দিয়ে যেতে লাগলেন তাঁরা। ছোট ছোট চিতল মাছ এবং আরও নানারকম মাছ লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছিল জল থেকে। সে-ও এক অপূর্ব দৃশ্য। তারপর তাঁরা আবার সিঁড়ি ভাঙতে লাগলেন। সিঁড়ির চারদিকে মরসুমী ফুলের ঝাঁক, আশেপাশে পাখীরা গান ধরেছে। সিঁড়ির শেষ ধাপে উঠে গন্ধরাজ থামলেন। সেখানে একটি ছোট দ্বার ছিল। সেই দ্বার দিয়ে দেখা যাচ্ছিল একটি সবুজ সমতল মাঠের আভাস। শ্বেতপাথরের তৈরী আসনও দেখা যাচ্ছিল কয়েকটি। এই সমতল মাঠে দাঁড়ালে নীচে সারি সারি অনেক গাছের শীর্ষভাগ দেখা যায়, আর তারও ওপারে দেখা যায় প্রাসাদশীর্ষে গর্জনগাঁওয়ের পীতবর্ণ পতাকা নীল আকাশে উড়ছে। সেই মাঠে ঢুকলেন তাঁরা।

"বসুন।"

একটি শ্বেতপাথরের আসন দেখিয়ে গন্ধরাজ বললেন। কোনও কথা না বলে' বসে' পড়লেন ভগীরথ শর্মা। গন্ধরাজ বসলেন না, তিনি তাঁর সামনে পায়চারি করতে লাগলেন, রাগে তাঁর ভিতরটা জ্বলছিল। পাখীদের অজস্র কাকলীও তাঁর কানে ঢুকছিল না।

"দেখুন"—অবশেষে ভগীরথের দিকে ফিরে গন্ধরাজ বললেন—"বঙ্গরাজের পরিচয়পত্রের কথা বাদ দিলে আপনি আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত আগন্তুক। আপনার মতিগতি আপনার চরিত্র আমি কিছুই জানি না। আমি জ্ঞানতঃ কখনও আপনার কোন

বিরুদ্ধাচরণ করি নি। আমাদের দু'জনের মধ্যে যে সামাজিক ব্যবধান আছে সে কথাও আমি ধর্তব্যের মধ্যে আনছি না। আপনি আমাকে একজন সাধারণ ভদ্রলোক হিসাবেই গণ্য করুন এখন। আমি আপনার পাণ্ডুলিপিটি আপনার বিনা অনুমতিতে পড়ে' অন্যায় করেছি। কৌতূহলবশেই আমি ও কাজ করেছিলাম। স্বীকার করছি এ কৌতূহল অশোভন, কিন্তু ওই পাণ্ডুলিপিতে আপনি যা লিখেছেন তা শুধু মিথ্যাই নয়, তা ভীরুতার পরিচায়ক। আপনার পাণ্ডুলিপি খুলে আমি দেখলাম—আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে আপনি যা লিখেছেন তা সব মিথ্যা"—উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে লাগলেন গন্ধরাজ —"হ্যাঁ মিথ্যা। ভগবান জানেন ওতে সত্যের লেশমাত্র নেই। আপনি ওর বাবার বয়সী, আপনি একজন ভদ্রলোক, শুনেছি আপনি বিদ্বান—আপনি ওই সব মিথ্যা কথার জঞ্জাল একত্র করে' তা প্রচার করতে উদ্যত হয়েছেন? শুনেছি আপনি যোদ্ধাও, যোদ্ধারা নারীদের সম্মান করে। এই কি তার প্রমাণ? কিন্তু ভুলে যাবেন না, ওর স্বামী এখনও জীবিত আছে। আপনি আপনার পাণ্ডু-লিপিতে লিখেছেন যে আমি অসিযুদ্ধে তেমন পারদর্শী নই। আপনাকে অনুরোধ করছি আমাকে একটু শিক্ষা দিয়ে দিন। পাশেই ওই একটা নির্জন স্থান আছে, কিছু দূরেই ময়ূরমহল, সেখানে আপনার জন্যে গাড়ি অপেক্ষা করছে। অসিযুদ্ধে আপনি যদি আমাকে মেরেও ফেলেন, কেউ তা জানতে পারবে না। আপনি তো নিজেই লিখেছেন আমার প্রজারা আমার বিশেষ খোঁজখবর রাখে না। মাঝে মাঝে গা-ঢাকা দিয়ে সরে' পড়াও আমার স্বভাব। আমার অনুপস্থিতি কেউ লক্ষ্য করবে না। যখন লক্ষ্য করবে তখন আপনি আমাদের রাজ্যের সীমানা নিরাপদে পেরিয়ে গেছেন। আসুন।"

ভগীরথ শর্মা বললেন, "মহারাজ, আপনি যা বলছেন তা অসম্ভব।"

"আমি যদি আপনাকে আঘাত করি?"

"সেটা ভীরুর মতো আঘাত হবে। কারণ আমি প্রত্যাঘাত করতে পারব না। কোন স্বাধীন রাজ্যের মহারাজার বিরুদ্ধে তরবারি উত্তোলন আমার পক্ষে অসম্ভব।"

"অথচ আপনি সেই মহারাজকে অনায়াসে অপমান করেছেন তো।"

"ক্ষমা করুন"—সবিনয়ে উত্তর দিলেন ভগীরথ শর্মা—"আমার প্রতি অবিচার করবেন না। আপনি মহারাজা, আপনার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হ'তে পারি না, কিন্তু আপনি মহারাজা বলেই আপনার আচরণের এবং আপনার মহারাণীর সমালোচনা করবার ন্যায্য অধিকার আমার আছে। আপনার সপক্ষে আপনার আইন আছে, সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী আছে, গুপ্তচরদের তীক্ষ্ণ চক্ষু আছে, কিন্তু আমাদের একটি মাত্র অস্ত্রই ভরসা—সেটি হচ্ছে, সত্য।"

"সত্য!"—সবিস্ময়ে বলে' উঠলেন গন্ধরাজ।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতায় কাটল।

"মহারাজ"—ভগীরথ শর্মাই নীরবতা ভঙ্গ করলেন—"আপনি আমড়া গাছে আম প্রত্যাশা করবেন না। আমি বৃদ্ধ এবং স্বভাবতই নিন্দুক। আমাকে কেউ গ্রাহ্য করে না, আমিও কাউকে করি না। কিন্তু আজ আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর বুঝেছি যে আপনার চেয়ে ভালো লোক আমি এ যাবৎ দেখি নি। আপনার সম্বন্ধে আমার মত বদলে গেছে এবং যা সাধারণত কেউ করে না তাই করছি, অর্থাৎ অসঙ্কোচে সেটা স্বীকার করছি আপনার কাছে। আপনার সামনেই ওই পাণ্ডুলিপি আমি ছিঁড়ে ফেলে দেব। যা লিখেছিলাম সেজন্য আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি, মহারাণীর কাছেও চাইছি। আমি আপনার কাছে শপথ করছি, এ বৃদ্ধের কথায় আপনি বিশ্বাস করতে পারেন, আমি আপনার কাছে শপথ করছি আমার বই যখন বেরুবে তখন তাতে গর্জনগাঁওয়ের নাম পর্যন্ত

থাকবে না। যদিও আমার বইয়ের ও অধ্যায়টা একটা জবর অধ্যায় ছিল, তবু ওটাকে বাদ দিয়ে দেব। মহারাজ পাণ্ডুলিপির অন্যান্য অধ্যায়গুলো যদি পড়তেন! আমি শকুনি—গলিত মাংস খেয়ে বেড়াই। অভাবও হয় না, সমস্ত পৃথিবীটাই তো ভাগাড়, সেটা কি আমার দোষ মহারাজ?"

"আপনার চোখের দৃষ্টি একটু বেশী বাঁকা নয় তো!"

"হ্যাঁ, হ'তে পারে। আমি কবি নই, আমি ছোঁক ছোঁক করে' পচা গন্ধ শুঁকে শুঁকে বেড়াই। আশা আছে ভবিষ্যতে হয়তো এ পৃথিবী স্বর্গরাজ্য হবে, কিন্তু এখন যে পৃথিবীকে দেখছি তার উপর বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। তাই আমি পচা-ডিমের গান গেয়ে বেড়াই। কিন্তু মহারাজ ফুল দেখলে আমি চিনতে পারি। আপনার সঙ্গে এই পরিচয়ের স্মৃতি আমার জীবনে মূল্যবান স্মৃতি হ'য়ে থাকবে। আজ সত্যিই এমন একজন রাজার দর্শন পেলাম যাঁর মধ্যে মনুষ্যো-চিত গুণ কিছু আছে। আমিও এককালে রাজসভায় ছিলাম, আমি একজন বিদ্রোহী সংস্কারকও, আমি আজ অন্তর থেকে আপনাকে সাধুবাদ করছি। আপনি যদি আমাকে হস্তচুম্বন করতে দেন, আমি অনুগৃহীত হব।"

"আরে হস্তচুম্বন কেন! আসুন আপনাকে আলিঙ্গন করি—"

দু'হাত বাড়িয়ে জাপটে ধরলেন তিনি ভগীরথকে। তারপর বললেন, "ময়ূরমহলের কাছেই আমার গাড়ি আপনার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। ওই গাড়িতে চড়েই আপনি চলে' যান এবার। আশা করি আমার এ অনুরোধ অগ্রাহ্য করবেন না। আপনি বঙ্গরাজ্যে নির্বিঘ্নে পৌঁছে যান ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি।"

"উৎসাহের চোটে আপনি একটা কথা ভুলে গেছেন মহারাজ। আমি এই সবে স্নান করে' উঠেছি। এখনও কিছু খাই নি।"

"ওহো, ঠিক তো! বেশ তাহলে আপনি যতক্ষণ ইচ্ছে থাকুন। কিন্তু একটা ব্যাপারে আপনাকে সতর্ক করে' দিই। এখানে আপনার

বন্ধুর চেয়ে আপনার শত্রুরা বেশী প্রবল। মহারাজ অবশ্যই আপনার সপক্ষে আছেন, তাঁর সদিচ্ছার কোনও অভাব নেই—কিন্তু আপনি তো আমার চেয়েও ভালো জানেন এখানকার হালচাল। এখন মহারাজই গর্জনগাঁওয়ের একমাত্র হর্তাকর্তা-বিধাতা নন।”

“কিন্তু তবু আপনি মহারাজ এখনও। কপিঞ্জল চট্ করে' কিছু করেন না, যা করেন র'য়ে স'য়ে ভেবেচিন্তে করেন। তাঁর কাজকর্ম সব অন্ধকারে গোপনে গোপনে। আলোয় আসতে ভয় পান তিনি। আর আপনার এখন যে পরিচয় পেলুম তাতে আমার ভয়ও ভেঙে গেছে। হয়তো আপনিই জয়ী হবেন শেষ পর্যন্ত—”

“বলেন কি! আপনার কথায় মনে বল পেলাম।”

“আমি আর ও ধরনের লেখা লিখব না। লোককে চেনবার ক্ষমতা আমার নেই। আমি আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম। একটা কথা কিন্তু মনে রাখবেন। একটা লাফ দেওয়া আর সমস্ত দিন একটানা ছুটে বেড়ানোতে তফাত আছে। আপনার চেহারা দেখে কিন্তু খুব ভরসাও হয় না আমার। আপনার ওই ছোট নাক, ওই চুল আর চোখের ওই নানা রঙের দৃষ্টি থেকে মনে হয় না যে আপনি একটানা কিছু করতে পারবেন। আপনি কবি, গদি আঁকড়ে থাকবার মতো ইতর মনোভাব আপনার নেই—”

“আমি তাহলে থিয়েটারের সখী মাত্র নই?”

“না মহারাজ। আমি যা লিখেছিলাম তার জন্যে আমি লজ্জিত। ওকথা আর আমাকে মনে করিয়ে দেবেন না। আমি দুর্মুখও নই, চাণক্যও নই, আমি অক্ষম চিত্রকর মাত্র। যা আঁকি প্রায়ই তা ঠিক হয় না। ও পাণ্ডুলিপি আপনি পুড়িয়ে ফেললে আমি বাধিত হব।”

আট

খুব খুশী হ'য়ে এরপর গন্ধরাজ মহারাণী সুরূপিণীর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে পা বাড়ালেন। অনুভব করলেন এ কাজটা আরও শক্ত। নিয়ম অনুসারে সোজা গিয়ে তাঁর কক্ষে ঢোকা যাবে না, পাশের ঘরে গিয়ে তাঁর সহচরী মারফত 'এত্তেলা' দিতে হবে আগে। রাজকীয় নিয়ম আর কেউ পালন না করুক রাজাকে করতেই হবে। তিনি যাওয়ামাত্র পরদা উঠে গেল এবং প্রতিহারী তাঁর নাম ঘোষণা করল। ভঙ্গীভরে সাড়ম্বরে প্রবেশ করলেন গন্ধরাজ। দেখলেন ঘরে অনেকে অপেক্ষা করছে। বেশীর ভাগই মহিলা। গর্জনগাঁওয়ের মহিলা-মহলে গন্ধরাজের খুব খাতির। একজন মহিলা রাণীকে খবর দেওয়ার জন্য পাশের ঘরে চলে' গেল। গন্ধরাজ নমস্কার বিনিময় করতে করতে এগিয়ে গেলেন অন্য মহিলাদের দিকে। হাসিমুখে প্রত্যেককেই তুষ্ট করবার চেষ্টা করতে লাগলেন আন্তরিকতার দ্যুতি বিকীর্ণ করতে করতে। এই যদি তাঁর একমাত্র কর্তব্য হ'ত তাহলে তিনি আদর্শ নৃপতি বলে' নিশ্চয়ই গণ্য হতেন। মহিলার পর মহিলা তাঁর সুমিষ্ট আলাপে বিগলিত হতে লাগলেন।

একজনকে বললেন, "কি কাণ্ড বলুন তো। আপনার বয়স বাড়ছে, না কমছে? রোজই যেন আপনাকে আগের চেয়ে বেশী সুন্দর দেখাচ্ছে।"

"আপনার রঙ্ কিন্তু তামাটে হ'য়ে যাচ্ছে, মহারাজ। না, এ বিষয়ে আমার একটু অহঙ্কার আছে, আমাদের দুজনেরই গায়ের রঙ্ আগে একরকম ছিল। আমি সে রঙটা বজায় রাখবার চেষ্টা করেছি, মহারাজ কিন্তু রোদে রোদে ঘুরে কালো হ'য়ে যাচ্ছেন—"

"শুধু কালো নয়, কাফ্রীর মতো কালো। সুন্দরীদের ক্রীতদাস হ'তে হ'লে ওই রঙই তো মানানসই। গভীরা দেবী, আমাদের

অভিনয় আবার কবে হবে? এইমাত্র একজনের কাছে শুনলাম যে আমি নাকি অত্যন্ত বাজে অভিনেতা।"

"ও মা,"—গভীরা দেবী বলে' উঠলেন—"কোন্ গাড়োল একথা বলতে সাহস করেছে—"

"গাড়োল নয়, চমৎকার লোক, বিচক্ষণ ব্যক্তি।"

"হতেই পারে না। মহারাজ গন্ধর্বদের মতো অভিনয় করেন।"

"মানছি, তোমার কথা ঠিক। মিথ্যাকথা এমন মনোরমভাবে আর কে বলতে পারে? কিন্তু যে ভদ্রলোকটির কথা বলছি তিনি বোধহয় আমাকে মানুষের মতো অভিনয় করতে দেখলে বেশী খুশী হতেন। গন্ধর্ব টন্ধর্ব তাঁর পছন্দ নয়।"

এ কথায় হাসির একটা গুঞ্জন উঠল। গন্ধরাজ ময়ূরের মতো তাঁর পেখম বিস্তার করলেন। নারী-সঙ্গ-মধুর এই সহৃদয় পরিবেশ গন্ধরাজের বড় প্রিয়।

"অঞ্জনা দেবী, আপনার খোঁপাটি তো চমৎকার সাজিয়েছেন দেখছি।"

"হ্যাঁ, সবাই তাই বলছে"—একজন মন্তব্য করলেন।

"আপনার যে ভালো লেগেছে তাতেই আমি খুশী—"

অঞ্জনা দেবী ভঙ্গীভরে অভিবাদন করলেন গন্ধরাজকে। সঙ্গে সঙ্গে কটাক্ষের একটা বিজলীচমকও খেলে গেল তাঁর চোখ দুটিতে।

"সত্যিই চমৎকার। কাঞ্চীর আমদানী? না, মিথিলার? এই কি আধুনিক ধরন?"

"একেবারে আনকোরা আধুনিক। মহারাজ আসবেন বলেই আজ এভাবে সেজেছি। সকালে উঠেই কেমন যেন আনন্দের জোয়ার লাগল মনে। আপনার আগমনের পূর্বাভাস। এমন করে' আমাদের ছেড়ে চলে' যান কেন মহারাজ—এ ভারী অন্যায় কিন্তু—"

"ফিরে আসার আনন্দলাভ করবার জন্যে। আমার স্বভাব

অনেকটা কুকুরের মতো। খাওয়ার হাড়টাকে পুঁতে রেখে যাই, তারপর ফিরে এসে আবার সেটাকে খুঁড়ে আবিষ্কার করে' আনন্দ পাই।"

"হাড়! এ কি উপমার ছিরি। বনে বনে ঘুরে বন্যস্বভাব হয়ে গেছে মহারাজের—আশা করি আমার স্পষ্ট কথায় রাগ করবেন না।"

"অনুরাগের অণুটুকু যে পর্বত-প্রমাণ। তা সরিয়ে ফেলবার সামর্থ্য কোথায়! তবে জেনে রাখুন, কুকুররা ওই করে। ওই তাদের প্রিয় কাজ। আরে, শ্রীমতী রঞ্জাবতীও রয়েছেন দেখছি—"

গন্ধরাজ ভিড় সরিয়ে অলিন্দের কাছে বাতায়নবর্তিনী মহিলাটির দিকে অগ্রসর হলেন।

রঞ্জাবতী এতক্ষণ একটি কথাও বলেন নি। একটু যেন বিমর্যই বোধ হচ্ছিল তাঁকে। গন্ধরাজকে আসতে দেখে তাঁর চোখে আলো ফুটল। তন্বী দীর্ঘাঙ্গী মহিলাটি, অনেকটা যেন পরী-পরী ভাব, মনে হয় এখনি বুঝি উড়ে চলে' যাবে। তাঁর সুন্দর মুখখানি উদ্দীপ্ত হ'য়ে আরও সুন্দর হ'য়ে উঠল, মৃদু হাসি চিকমিক করে' উঠল চোখে মুখে ঠোঁটে গালে। গায়িকা হিসাবেও তাঁর সুনাম খুব। কথা বলবার সময় তাঁর কণ্ঠস্বর নানা গ্রামে ওঠা-নামা করে, উদারা থেকে তারা পর্যন্ত যে কোনও পর্দায়। যখন চুপি চুপি কথা বলেন তখনও সঙ্গীতের মৃদু গমক শোনা যায়, যখন জোরে কথা বলেন বা হাসেন তখন তো সে সঙ্গীত ঝরণার মতো উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে। বহুমূল্য রত্ন একটি, নানা রঙের লীলা তাঁর সর্বাঙ্গ ঘিরে। ছলনাময়ীও, নিজের রূপকে লুকিয়ে রাখতে জানেন, তারপর সহসা ক্ষণিক সোহাগের অভিনয়ে সেটাকে শাণিত তরবারির মতো আস্ফালন করে' অভিভূতও করে' দিতে পারেন দর্শককে। দেখতে সাধারণ একটি ছিপছিপে রূপসী মেয়ে, কিন্তু পরমুহূর্তেই ফুলের

মতো রূপে রসে গন্ধ বিকশিত হ'য়ে মনোহারিণী হ'য়ে উঠতে পারেন রঙ্গাবতী। অবাঞ্ছিত প্রণয়ভিক্ষুদের জন্য একটি ছোরাও লুকিয়ে রাখেন তিনি সর্বদা। গন্ধরাজের দিকে একটি হাস্য-দীপ্ত শর নিক্ষেপ করে' তিনি বললেন, "যাক্ অবশেষে আমার কাছে এলেন আপনি মহারাজ! জানি প্রজাপতিকে পোষা যায় না তবু—যাক্—আপনার হস্ত-চুম্বনের অনুমতি পাব তো?"

"আমিই তোমার হস্ত-চুম্বন করব রঙ্গাবতী।"

গন্ধরাজ অভিবাদন করে' এগিয়ে গেলেন এবং রঙ্গাবতীর হস্ত-চুম্বন করলেন।

"আমার একটি আবদারও আপনি রাখেন না।"

"রাজসভার খবর কি বল? তোমার কাছেই তো সব খবর পাই বরাবর।"

"পচা-ডোবার আবার খবর কি! সব নিঝ্‌ঝুম, সব ঘুমে ঢুলু-ঢুলু। মনে হ'চ্ছে অনন্তকাল ধরে' সবাই ঘুমুচ্ছে। জাগরণের কোথাও কোনও সাড়া তো পাই না, কোথাও কোনও উত্তেজনা নেই। সেই কতকাল আগে আমার শিক্ষয়িত্রী আমার কান মলে' দিয়েছিলেন, তারপর থেকে উত্তেজনা-জনক আর তো কিছু ঘটে নি। কিন্তু না, নিজের প্রতি আর আপনার ওই জাদুমন্ত্রমুগ্ধ ভাগ্যহত রাজপ্রাসাদের প্রতি কিছু অবিচার করলাম বোধহয়। বলছি সব —কিন্তু এই শেষ, মনে রাখবেন সেটা—"

মুখের কাছে রঙীন পাখাটি তুলে ধরে' এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে নিপুণ বর্ণনা-কুশলতায় সব বলে' গেলেন তিনি। অন্য মহিলারা এ দেখে দূরে সরে' গেলেন একটু। কারণ সবাই জানেন যে রঙ্গাবতীর সঙ্গে গন্ধরাজের সম্পর্ক বেশ একটু ঘনিষ্ঠ। কাছে-পিঠে থাকাটা শোভন নয়। তবু রঙ্গাবতী গলার স্বর বেশ একটু খাটো করে' চুপি চুপি বলতে লাগলেন সব, জানলার ধারে গন্ধরাজের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে।

গন্ধরাজ হেসে বললেন—"একটা কথা বোধহয় তুমি জান না। তোমার মতো মনোরমা নারী পৃথিবীতে আর নেই।"

"সত্যি? এত বড় আবিষ্কার করে' ফেলেছেন আপনি?"

"হ্যাঁ। বয়স যতই বাড়ছে ততই সত্যকে স্পষ্ট করে' দেখতে পাচ্ছি!"

"বয়স? বয়স তো বিশ্বাসঘাতক। আপনি বয়সে বিশ্বাস করেন? দিন মাস সন তারিখ ও সব তো মিথ্যা মায়া।"

"হয়তো তাই। তোমার সঙ্গে আমার ছ'বছর ধরে' বন্ধুত্ব। কিন্তু বয়সের ছাপ তো তোমার উপর পড়ে নি। তোমার তারুণ্য আজও অম্লান। তুমি যেন নিত্য নূতন হ'চ্ছ।"

"এটা কিন্তু চাটুবাক্য হ'ল মহারাজ"—তারপর হঠাৎ সুর বদলে—"না, চাটুবাক্য কেন, আমি নিজেও তো তাই মনে করি। এক সপ্তাহ আগে আমি আমার পরীক্ষকের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। আমার পরীক্ষক কে জানেন তো? আয়না। পরীক্ষক বললে—'না, এখনও দেরি আছে'। প্রতিমাসে একবার করে' আমি পরীক্ষকের সামনে দাঁড়াই। দুরু দুরু বক্ষে বিস্ফারিত চক্ষে। যেদিন আয়না বলবে—'আর নয়। এইবার সময় হয়েছে'—জানি না সেদিন আমি কি করব।"

"আন্দাজ করতে পারছি না"—ইতস্তত করে' উত্তর দিলেন গন্ধরাজ।

"আমিও পারছি না। কত কি করতে পারি। আত্মহত্যা, জুয়া-খেলা, সন্ন্যাসিনী হ'য়ে যাওয়া, আত্মজীবনী লেখা, কিংবা রাজনীতির সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়া—"

"ওটা বড় বাজে জিনিস। ওতে কি তোমার মন ভরবে?"

"না, খুব বাজে নয়। ওটা আমার ভালোই লাগে। রাজনীতি পরচর্চারই বড় দাদা। পরচর্চার মতো মনরোচক আর কি আছে বলুন। ধরুন যদি আপনাকে বলি মহারাণী সুরূপিণী প্রত্যহ

কপিঞ্জলের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে' বেরিয়ে যান কামান পরিদর্শন করতে—তাহলে এটাকে কি বলবেন, রাজনীতি, না, পরচর্চা? নির্ভর করবে কেমন করে' কি ভাষায় বললাম তার উপর। ঘটনাগুলোকে কমিয়ে বাড়িয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে বাঁকিয়ে চুরিয়ে ছেঁটে কেটে রূপান্তরিত করবার যে শিল্প-কৌশল, তার জাদুকরী হবার ক্ষমতা আমার আছে। আপনার অনুপস্থিতিতে রোজই তারা একসঙ্গে সর্বত্র বেড়িয়েছে—"

গন্ধরাজের মুখে ছায়া নামল, কিন্তু উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠলেন রঞ্জাবতী।

"এ খবরটা জল্পনা-জগতের ছোট্ট কাদাখোঁচা একটা, কিন্তু যদি বলি তারা যেখানেই গেছে সেখানেই প্রজারা জয়ধ্বনি করেছে—অমনি কাদাখোঁচা ময়ূর হ'য়ে যাবে। তখন দামী রাজনৈতিক খবর হবে এটা—"

"প্রসঙ্গ বদলাও। ভালো লাগছে না ওসব কথা।"

"আমিও তাই ভাবছিলুম। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ ছেড়ে রাজনীতিই আলোচনা করা যাক। জানেন? এই যুদ্ধটা এত জনপ্রিয় হয়েছে যে মহারাণী যেখানেই যান সেখানেই জয়ধ্বনিতে আকাশ গমগম করে।"

"হয়তো করে। সবই সম্ভব। হয়তো যুদ্ধই হবে, কিন্তু বিশ্বাস কর কার সঙ্গে হবে কেন হবে তা আমি অন্তত জানি না।"

"অথচ আপনি এটা সহ্য করছেন। আমি নীতি-টিতির ধার ধারি না মহারাজ, আমি অকপটে স্বীকার করছি ভীরু ভেড়ার চেয়ে হিংস্র বাঘকে আমি বেশী ভালবাসি। দোহাই আপনার, ওই ভেড়া-ভাব পরিত্যাগ করুন। আমাদের অনুভব করতে দিন যে সত্যিই রাজার মতন রাজা আছেন আমাদের। মেয়েলীপনা মোটেই ভালো লাগছে না।"

"রঞ্জাবতী, আমার ধারণা ছিল তুমি ওদের দলের।"

"মহারাজ, আপনার যদি দল থাকত তাহলে আপনার দলেই থাকতাম আমি। আপনার কি কোন উৎসাহ নেই? ইতিহাসে চাণক্যের কথা পড়েছি, তিনি মৌর্য চন্দ্রগুপ্তকে সম্রাট করেছিলেন। আমি যদিও মেয়েমানুষ, কিন্তু আমিও সে ক্ষমতা রাখি মহারাজ। গর্জনগাঁওয়ের রাজকুমারকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি অন্তত।"

"কোনদিন হয়তো তোমার সাহায্য চাইব আমাকে চাষী গৃহস্থ-রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে।"

"হেঁয়ালি না কি?"

"তাই ধরে' নাও। আর খুব ভালো হেঁয়ালি।"

"তাহলে আমিও একটা হেঁয়ালি বলি। কপিঞ্জল কোথায় এখন?"

"আমাদের প্রধানমন্ত্রী? তিনি নিশ্চয় তাঁর কর্ম-কক্ষে আছেন।"

"ঠিক। কর্ম-কক্ষেই আছেন তিনি"—রঞ্জাবতী পাখা দিয়ে মহারাণী স্বরূপিণীর ঘরটা দেখিয়ে দিলেন—"আপনি আর আমি পাশের ঘরে আছি। আপনি হয়তো ভাবছেন আপনার উপর আমার দয়ামায়া কিচ্ছু নেই। কেবল আপনাকে আঘাত করছি। কিন্তু পরীক্ষা করে' দেখতে পারেন, তাহলেই আপনার ভুল ভেঙে যাবে। আমাকে কোনও একটা কাজ দিন, কিংবা কোনও প্রশ্ন করুন। আপনার জন্য হেন কাজ নেই যা করতে আমি প্রাণপণ না করতে পারি, হেন গোপন খবর নেই যা আপনার কাছে না প্রকাশ করতে পারি।"

"না, রঞ্জাবতী, সেসব কিছু করব না। তোমার বন্ধুত্বকে আমি এত মূল্যবান বলে' মনে করি যে কোনও নোংরামির মধ্যে তোমাকে টেনে নিয়ে যেতে চাই না।"

গন্ধরাজ আর একবার রঞ্জাবতীর হস্ত-চুম্বন করলেন।

"জান? যখন যুদ্ধ হয়, দু'দলের সৈন্যরা যখন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে

থাকে, তখন আড়ালে আবডালে শত্রু-পক্ষের সৈন্যের সঙ্গে বন্ধুত্বও হয় কারো কারো। কিন্তু তা বলে' তারা কেউ নিজের দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে না। না, আমি কিছু জানতে চাই না।"

"মহারাজ"—বাঁকা হাসি হেসে বললেন রঞ্জাবতী—"আপনার মতো সবাই যদি উদার হ'ত তাহলে নারী-জন্ম সার্থক হ'ত আমাদের।"

কিন্তু তাঁর ভাবভঙ্গীতে মনে হ'ল তিনি একটু যেন আহত হয়েছেন গন্ধরাজের কথায়। তিনি অন্য রকম কিছু ঘটবে আশা করেছিলেন। তিনি প্রত্যাঘাত করবার ছুতো খুঁজতে লাগলেন মনে মনে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সেটা পেয়ে প্রফুল্ল হ'য়ে উঠলেন।

"মহারাজ এবার আমাকে ছুটি দিন, আর বেশীক্ষণ আমার কাছে থাকবেন না। কথাটা হয়তো অশোভন স্পর্ধার মতো শোনাচ্ছে, কিন্তু কি করি বলুন, আমার ভালুকটা যে বড় হিংসুকে।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ আমি যাচ্ছি। কৈকেয়ীর নির্দেশে রামরা সর্বদাই বনবাসে যেতে প্রস্তুত! চললুম। কিন্তু জেনে রাখ আমি চিরকালই তোমার বশম্বদ বন্ধু থাকব। শিস্ দিয়ে ডাকলেই চলে' আসব কুকুরের মতো—"

গন্ধরাজ সরে' গেলেন। গভীরা দেবী আর অঞ্জনা দেবীর সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন আবার। রঞ্জাবতী অস্ত্র-কুশলা। তিনি জানেন তাঁর কোন অস্ত্রটি কোথায় কিভাবে লাগসই হবে। গন্ধরাজের হৃদয়ে তিনি একটি মোক্ষম তীর হেনেছিলেন। কপিঞ্জল ঈর্ষা-পীড়িত হ'তে পারে—এটা তো একটা পরম প্রীতিকর প্রতিশোধ। গন্ধরাজও রঞ্জাবতীকে যেন নূতন আলোকে দেখলেন। ওকে কেন্দ্র করে' কারও ঈর্ষা জাগতে পারে না কি!

রঙ্গাবতী ঠিক কথাই বলেছিলেন। গর্জনগাঁওয়ের মহামহিম প্রধানমন্ত্রী সত্যই মহারাণী সুরূপিণীর প্রসাধন-কক্ষে বসে' ছিলেন তখন। প্রসাধন শেষ হয়েছিল, সুরূপিণী সুসজ্জিতা হ'য়ে বসে' ছিলেন একটি দীর্ঘ দর্পণের সমুখে। ভগীরথ শর্মার বর্ণনা নিদারুণ-ভাবে সত্য। কিন্তু বর্ণনা হিসাবে সত্য হলেও ওটা যে বিদ্বেষপূর্ণ কুৎসা তাও বুঝতে দেরি হয় না। ভগীরথ শর্মার নারী-বিদ্বেষী মনের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি ওই বর্ণনাটি। সুরূপিণীর কপালটা উঁচু ঠিকই, কিন্তু মোটেই তা বেমানান নয়। তিনি ঈষৎ কোলকুঁজো তা-ও অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু তাঁর প্রতিটি অঙ্গ নিটোল, যেন নিপুণ শিল্পীর গড়া। তাঁর হাত, পা, কান, কমনীয় গ্রীবার উপর তাঁর সুন্দর ছোট্ট মাথাটি, তাঁর মুখের এবং চিবুকের ডোল সবই চমৎকার, কোথাও ছন্দপতন ঘটে নি। তিনি হয়তো তিলোত্তমার মতো সুন্দরী নন, কিন্তু তিনি প্রাণবন্ত, চঞ্চল, বর্ণময়ী, হাজার রকম মাধুর্যের উৎস। তাঁর চোখ দুটি একটু বেশী চঞ্চল বটে, একটু যেন বেশী ঘূর্ণ্যমান, কিন্তু প্রতিটি ঘূর্ণন অর্থপূর্ণ। তাঁর সর্বাঙ্গের মধ্যে চোখ দুটিই সব চেয়ে সুন্দর, সে চোখের দৃষ্টিতে তাঁর মনোভাবের প্রকাশ নেই কিন্তু। সে দৃষ্টি যা বলছে তা যেন তাঁর মনের কথা নয়। তাঁর অপরিণত কঠিন হৃদয়ে যে কামনা নিহিত তা নারীসুলভ নয় তা পারুষ্যধর্মী, তা ক্ষমতালাভের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু তাঁর চোখের দৃষ্টি কখনও উদ্ধত কখনও মিনতিভরা, কখনও প্রদীপ্ত কখনও বিগলিত। দৃষ্টিতে যেন লোলুপ কুহকিনীর ছলনা। হ্যাঁ, ছলনাময়ী তিনি সত্যিই। তিনি যে পুরুষ নন, পৌরুষের মহিমায় তিনি যে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠতে

পারছেন না এই ক্ষোভে তিনি তাঁর নারীত্বকে কেন্দ্র করেই যথেচ্ছাচার করবার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন, নিজের প্রভুত্ব কায়েম করতে চাইছেন গুপ্ত অভিসন্ধির পথে, খেয়াল-খুশির মেঘে ভেসে ভেসে চাইছেন নিজের প্রভাব প্রতিপত্তির বর্ষণে চতুর্দিক ভাসিয়ে দিতে। তিনি কাউকে ভালবাসেন না, কিন্তু তিনি চান সকলে তাঁর পদানত হ'য়ে থাকুক। যে কোনও সাধারণ মেয়েরই এই আকাঙ্ক্ষা বোধহয়। ইতিহাসে এ রকম নজির আছে। প্রেমান্ধ প্রণয়ীকে সিংহের মুখে ফেলে দিয়ে মজা দেখেছেন প্রণয়িনী। কিন্তু প্রকৃতি ছলনাময়ী। তিনি শুধু পুরুষের জন্যেই ফাঁদ পাতেন না, নারীর জন্যেও পাতেন।

মার্জার যে ভঙ্গীতে ওত পেতে ব'সে সেই ভঙ্গীতে কপিঞ্জল তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে গুটিয়ে বসেছিলেন একটি নীচু কেদারায় একটু ঝুঁকে। তাঁর কাঁধ দুটো উঁচু হ'য়ে উঠেছিল, নীলাভ প্রচণ্ড গণ্ডে আর চোয়ালে, পীতাভ চোখের দৃষ্টিতে যে ভাব ফুটে উঠেছিল তাতে মনে হচ্ছিল যদিও তাঁর ভঙ্গীটা ওত পাতার মতো, কিন্তু ইচ্ছেটা বোধহয় তোষামোদ করবার। তাঁর শক্তিব্যঞ্জক মুখভাবে যা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল তাতে ফুটে উঠেছিল দস্যুসুলভ স্পর্ধা, নির্জলা স্পর্ধা, কোনও আবরণ তাতে ছিল না। গোপন করবার বিন্দুমাত্র প্রয়াসও ছিল না। স্বরূপিণীর দিকে চেয়ে যে হাসিটি তিনি হাসলেন তা মোহন, কিন্তু মার্জিত নয়।

বললেন, "এবার আমার বোধহয় ওঠা উচিত। মহারাজকে পাশের ঘরে অপেক্ষা করিয়ে রাখাটা আর উচিত হচ্ছে না। অবিলম্বে একটা মীমাংসায় আসা দরকার।"

"মীমাংসাটা পরে করলে হয় না? এখনই করতে হবে?"

"হ্যাঁ, এখনই, আর দেরি করা চলে না। মহারাণী নিজেই সেটা বুঝতে পারছেন। গোড়ায় গোড়ায় সাপকে নকল করা চলতে পারে কিন্তু শেষমুহূর্তে সিংহের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। মহারাজ

যদি এখন না আসতেন তাহলে ভালো হ'ত, কিন্তু আমরা অনেকদূর এগিয়ে গেছি এখন ফেরা অসম্ভব।"

"ভাবছি, হঠাৎ মহারাজ এলেন কেন। বিশেষ করে' আজকেই আসার হেতুটা কি!"

"যারা সব ভণ্ডুল করে' দেয় তাদের তো ওই স্বভাব। ঠিক সময়টিতে হাজির হ'য়ে সব পণ্ড করে' দেবে। কিন্তু ভাববার কিছু নেই। ভেবে দেখুন কত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে আমরা কতটা এগিয়েছি। এখন একটা আহাম্মক এসে— কিন্তু না—"

কপিঞ্জল মৃদু হেসে তাঁর আঙ্গুলগুলোতে ফুঁ দিলেন ভঙ্গীভরে।

"কিন্তু ওই আহাম্মকই"—উত্তর দিলেন মহারাণী—"এখনও গর্জনগাঁওয়ের মহারাজ—"

"সেটা আপনার মরজির জন্যে। আর যতক্ষণ আপনি প্রশ্রয় দেবেন ততক্ষণ উনি মহারাজ থাকবেনও। প্রকৃতির একটা নিয়ম আছে, শক্তিময়ীর কাছেই শক্তি থাকে, বীর-ভোগ্যা বসুন্ধরা। উনি যদি আপনার সঙ্গে টক্কর দিতে আসেন তাহলে সেই মাটির হাঁড়ি আর পিতলের হাঁড়ির গল্পের পুনরাবৃত্তি হবে—"

"আপনি আমাকে হাঁড়ি বলছেন! এটা কিন্তু অশোভন" হেসে ফেললেন সুরূপিণী।

"আপনার কীর্তি পুরোপুরি কায়েম করবার জন্যে এখন অনেক উপমা ব্যবহার করতে হবে আমাকে। পার হ'তে হবে অনেক সিঁড়ি—তারপর অবশ্য—"

আনন্দে সুরূপিণীর মুখটা প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠল।

"গন্ধরাজ কিন্তু এখনও সিংহাসনে আসীন আছেন, চাটুকার মশাই, আপনি কি বিদ্রোহ করতে বলেন? আপনি? তাঁর প্রধানমন্ত্রী—?"

"বলবার তো আর কিছু নেই মহারাণী। যা হবার তা তো হ'য়েই গেছে। গন্ধরাজ এখন শুধু কাগজেকলমে মহারাজা, আসল শাসনকর্ত্রী তো আপনি, মহামান্যা মহারাণী সুরূপিণী দেবীই তো রাজ্য চালাচ্ছেন—"

তাঁর দিকে অনুরাগ-ভরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাইলেন কপিঞ্জল। সুরূপিণীর অন্তরে দোলা লাগল। ফুলে উঠল বুকটা। বিরাটকায় তাঁর এই ক্রীতদাসের দিকে চেয়ে ক্ষমতার মদিরা পান করলেন তিনি। ক্রীতদাসটি কিন্তু বলেই চললেন—শয়তানি ধূর্ততা যদিও তাঁকে মানাচ্ছিল না ঠিক—কিন্তু তবু তিনি বললেন—"একটি দোষ আছে কিন্তু মহারাণীর। তাঁর সমুজ্জ্বল সুমহৎ ভবিষ্যতে সেটি যে বিপজ্জনক ছায়াপাত করেছে তা দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। বলব সেটা কি? আপনি কি আমার বেয়াদবি ক্ষমা করবেন? দোষটি আপনার মধ্যেই আছে মহারাণী—আপনার হৃদয় অতি কোমল।"

"ঠিকই বলেছেন, আমি একটু ভীরু। ধরুন আমাদের বিচারে যদি ভুল হ'য়ে থাকে, যদি আমরা হেরে যাই?"

"হেরে যাব, মহারাণী?"—তিক্ত ব্যঙ্গ সহকারে উত্তর দিলেন কপিঞ্জল। "খরগোশের কাছে কুকুর কখনও হেরে যায়? সীমান্তে আমাদের পাঁচ হাজার সশস্ত্র সৈনিক মজুত আছে, পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই পাঁচ হাজার সৈন্য রুদ্রার সিংহদ্বারে আঘাত হানবে; ভৈরঙ্গীতে দেড় হাজারের বেশী সেনা নেই। এ তো অঙ্কের ব্যাপার। জয় আমাদের সুনিশ্চিত। আমাদের বাধা দেবে কে—"

"কিন্তু এতে বাহাদুরি কি আছে। একে আপনি গৌরব বলছেন? এ তো একটা শিশুকে ধরে' প্রহার করার মতো। এতে সাহসের পরিচয় কোথায়?"

"মহারাণী, সাহসটা রাজনৈতিক। আমাদের এই পদক্ষেপ লঘু নয় খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর দ্বারা সমস্ত উত্তর ভারতের দৃষ্টি আমরা আকর্ষণ করব, এই প্রথম আকর্ষণ করব। এর আগে আমরা নগণ্য

ছিলাম। এর পর তিন মাসের মধ্যে যে সব সন্ধি-চুক্তি হবে তার উপর নির্ভর করবে আমাদের উত্থান কিংবা পতন। ওই সব সন্ধি-চুক্তির সময় আপনার পরামর্শের উপরই ভরসা করতে হবে আমাদের"—গম্ভীরভাবে বলে চললেন তিনি—"আপনাকে যদি আমি কাজ করতে না দেখতাম, সে সময় আপনার উর্বর মস্তিষ্কের পরিচয় যদি না পেতাম, তাহলে সত্যি বলছি, এই আসন্ন বিপদে ভয়ে আমার বুক কাঁপত। বুদ্ধির ক্ষেত্রে, কৌশলের ক্ষেত্রে, প্রেরণার ক্ষেত্রে, আমাদের অক্ষমতা স্বীকার করতেই হবে। মনে করুন বিদুলার কথা, মনে করুন কৈকেয়ীর কথা, মনে করুন দ্রৌপদীর কথা। ভারতের বাইরে যে সব দেশ আছে—ফরাসীদের দেশ, রুষ দেশ, ইংরেজদের দেশ, স্পেন দেশ—যাদের আমরা ম্লেচ্ছ, ফিরিঙ্গী বা গুরুও বলি—তাদের দেশেও শুনেছি মহিমময়ী নারীদের প্রতিভাই হয় প্রকাশ্যে না হয় অন্তরালে রাজত্বের শাসনরজ্জুকে সবল হস্তে ধরে' আছে। তাঁদের যে সম্মান পাওয়া উচিত ছিল সে সম্মান হয়তো তাঁরা পান নি, তাঁদের আহম্মক স্বামীরা বা সেনাপতিরা বা মন্ত্রীরা হয়তো তা পেয়েছেন, অনেকে হয়তো হৃদয়ের দুর্বলতার জন্যও তাঁদের ন্যায্য সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়েছেন—কিন্তু সত্য কখনও অম্লান হয় নি, কখনও হবে না।"

এই ঐতিহাসিক বক্তৃতায় সুরূপিণী কিন্তু বিশেষ বিচলিত হলেন না। মনে হ'ল তিনি যা ঠিক করেছিলেন তা যেন আর ভালো লাগছিল না তাঁর। তিনি তাঁর অর্ধনিমীলিত চক্ষুর ফাঁক দিয়ে কপিঞ্জলের দিকে তাকিয়ে ঈষৎ অবজ্ঞাভরেই বললেন, "সত্যি, কি ছেলেমানুষ এই পুরুষরা। লম্বাচওড়া কথা বলতে পেলে আর কিছু চায় না। রাজনৈতিক সাহস! আপনাকে যদি পোড়া কড়াই মাজতে হ'ত তাহলে সেটাকে আপনি নিশ্চয় গার্হস্থ্য সাহস বলতেন।"

"বলতাম, যদি সে কড়াইটাকে ভাল করে' মাজতে পারতাম!"

কপিঞ্জলও দমবার পাত্র নন—"যে কোনও গুণকে ভালো নামেই

আমি ভূষিত করতে চাই, করাটাই উচিত, বিশেষণই গুণের উৎকর্ষ বাড়ায়, গুণ সব সময়ে মনোহর না-ও হ'তে পারে।"

"বেশ আমাদের সাহসটাকে পরীক্ষা করে' দেখা যাক। কৌশাম্বী থেকে ঠাকুমা আমাদের পিঠ চাপড়েছেন, কপিলবাস্তুর জ্যাঠামশাই আমাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, আমাদের পরিবারের যে যেখানে আছেন সবাই বাহবা বাহবা বলেছেন। এই কি আমাদের সাহসের সম্বল? আপনার কথা শুনে আশ্চর্য হ'য়ে যাচ্ছি আমি মন্ত্রীমশাই?"

"মহারাণীর মনটা আজ ভালো নেই দেখছি।"

কপিঞ্জল পুনরায় আরম্ভ করলেন।

"বিপদটা যে কোথায় তা তিনি ভুলে গেছেন। আমরা চারিদিক থেকে উৎসাহ পেয়েছি তা ঠিক, কিন্তু মহারাণী ভালো ক'রেই জানেন ও সব উৎসাহের ভিত্তি চোরা-বালির উপর; মহারাণী এ-ও জানেন যে প্রকাশ্য জনসভায় এইসব গোপন ইশারার কথা বলা যায় না, অনেক সময় তা চেপে যেতেও হয়। কিন্তু বিপদ যে সমূহ তাতেও সন্দেহ নেই।"

যে জিনিসটাকে তিনি চাপা দিতে চেয়েছিলেন সেইটেকে আবার খুঁচিয়ে তুলতে বাধ্য হচ্ছেন বলে' মনে মনে ক্ষুব্ধ হ'লেন তিনি, কিন্তু থামতে পারলেন না।

"বিপদটা ঠিক যুদ্ধসংক্রান্ত নয়, কিন্তু তবু সেটা উপেক্ষণীয়ও নয়, অবশ্য সহজেই এ বিপদ কাটিয়ে ওঠা যাবে এ বিশ্বাস আমার আছে। যদি আমাদের সৈন্যদলের উপর নির্ভর করতে হ'ত তাহলে একটু মুশকিলই হ'ত। কারণ আপনি ঠিকই ধরেছেন অভিজিৎ এখনও সেনাপতি হিসাবে তার যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারে নি। কিন্তু সন্ধি-চুক্তি-কূটনৈতিক কৌশলের ক্ষেত্রে আমাদের নির্ভর করতে হবে নিজেদেরই উপর। সেইখানেই বিপদ, কিন্তু আপনার সাহায্য পেলে সে বিপদকে আমি গ্রাহ্যই করি না—"

"তা হ'তে পারে"—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন মহারাণী—"কিন্তু আমি বিপদ দেখছি অন্য জায়গায়। আমাদের প্রজারা—ওই লক্ষ্মীছাড়ারা—ওরা যদি হঠাৎ বিদ্রোহ করে' বসে—তাহলে? উত্তর ভারতের লোকেরা কি ভাববে যখন তারা দেখবে যে আমরা যখন অপরের রাজত্ব আক্রমণ করতে যাচ্ছি, তখন আমাদের নিজেদেরই সিংহাসন টলমল?"

"না, মহারাণী"—হেসে উত্তর দিলেন কপিঞ্জল—"আপনিও ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না এতে আশ্চর্য হচ্ছি। প্রজারা অসন্তুষ্ট কেন? অর্থাভাবে আর খাজনার চাপে। একবার যদি আমরা ভৈরঙ্গী দখল করতে পারি, খাজনা মাপ করে' দেব, ছেলেরা বীরত্বের মুকুট আর লুটের মাল নিয়ে ফিরে আসবে ঘরে ঘরে শৌর্যবীর্যের মহিমায় বুক ফুলিয়ে, তখন আর কোন গ্লানি থাকবে না কারো মনে। তারা বলাবলি করবে, মহারাণী ঠিকই করেছিলেন, কি মাথা, কি দূরদৃষ্টি তাঁর, আর তো আমাদের অভাব নেই। অবশ্য, মহারাণীর কাছে এসব বলার মানে হয় না। কিন্তু মহারাণীই তো আমাকে এ পথ দেখিয়েছেন। তাঁরই নির্দেশে দুর্গম পথের যাত্রী হয়েছি আমি।"

"মন্ত্রী মশায়"—সুরূপিণী যেন একটু ঝাঁজের সঙ্গেই বললেন—"প্রায়ই আপনি আপনার নিজের কেরামতিটা মহারাণীর উপর আরোপ করেন দেখছি।"

এই অতর্কিত খোঁচায় কপিঞ্জলের ব্যক্তিত্ব টলমল করে' উঠল। কিন্তু তা ক্ষণকালের জন্য। পরমুহূর্তেই তিনি সামলে নিলেন নিজেকে।

"করি না কি! হয়তো করি। মহারাণীর মধ্যেও এ প্রবণতা লক্ষ্য করেছি।"

তিনি এমন সহজভাবে বললেন কথাগুলো এবং তা এমন সঙ্গত মনে হ'ল যে সুরূপিণী স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। তাঁর অহমিকার ভিত্তিটাই যেন কেঁপে উঠেছিল, আত্মস্থ হ'য়ে আরাম পেলেন।

"কিন্তু কোন কাজই তো এগোল না। ওদিকে গন্ধরাজ পাশের ঘরে অপেক্ষা করছে। কি ভাবে সম্মুখসমরে অগ্রসর হব তাই তো মাথায় আসছে না, সেনাপতি মশাই একটু উপদেশ দেবেন? কি ভাবে তার সঙ্গে কথাবার্তা কইব, আর সে যদি রাজপরিষদে যেতে চায় তাহলেই বা আমরা কি করব—"

"এখন, মানে এখনকার মতো, আমি মহারাণীকে মহারাজের কাছে রেখে যাচ্ছি। মহারাণীর উপর আমার আস্থা আছে। তাঁর কাজকর্ম আমি দেখেছি। মহারাজকে নাট্যশালায় পাঠিয়ে দিন না, অবশ্য বুঝিয়ে সুজিয়ে"—তারপর বললেন—"মহারাণী যদি এখন মাথাধরার অভিনয় করেন, কেমন হয়?"

"মাথাধরার অভিনয়? কক্ষনো না। যে সৈন্য যুদ্ধ করতে জানে সে কখনও পালায় না, যে নারী পুরুষকে আয়ত্তে আনতে জানে সে-ও কখনও রণে ভঙ্গ দেয় না। বীর তার অস্ত্রকে কলঙ্কিত করে না।"

"তাহলে মহারাণীর কাছে একটি বিনীত প্রার্থনা করে' বিদায় নি। মহারাণীর একটি মাত্র গুণের অভাব আছে—করুণা। করুণাময়ীর অভিনয় করুন তাহলে—বেচারার শিকার টিকার নিয়ে একটু আলোচনা করুন। রাজনীতির ধার দিয়েও যাবেন না। অভিনয় করুন রাজ্যের শুষ্ক কর্তব্যপালন করবার পর তাঁর সঙ্গ পেয়ে যেন আপনি বর্তে গেলেন। মহারাণীর কি এ রণ-নীতি পছন্দ হ'ল?"

"ওর জন্যে আমি ভাবছি না"—স্বরূপিণী উত্তর দিলেন—"কিন্তু রাজপরিষদ—তার কি হবে?"

"রাজপরিষদ?"—কপিঞ্জল হেসে উঠলেন এবং গন্ধরাজের স্বর এবং ভঙ্গী হুবহু নকল করে' ঘরের মধ্যে এক চক্কোর পায়চারি করে' শুরু করলেন—"আজ পরিষদে কি কি কাজ আছে? আরে মহাধ্যক্ষ মশাই যে—গোঁফে কলপ লাগিয়েছেন দেখছি। হেঁ হেঁ আমাকে

ঠকাতে পারবেন না। কলপের ব্যাপারে আমি একজন ওস্তাদ। তাছাড়া আমার চোখ রাজার চোখ, ঠকানো শক্ত। এ কাগজগুলো কিসের? ও, তাই তো। হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয় নিশ্চয়। কিন্তু আমি বাজি রেখে বলতে পারি আপনারা কলপের ব্যাপারটা ধরতে পারেন নি কেউ। ওরে বাবা এতগুলো কাগজ! আপনিই সই করুন, আপনাকে তো অধিকার দেওয়াই আছে। কিন্তু দেখুন, আপনার কলপের রহস্যটা আমি ধরে' ফেলেছি। ফেলি নি?" এই পর্যন্ত বলে' কপিঞ্জল থামলেন। তারপর নিজের কণ্ঠস্বরে বললেন, "এটা বলতে হবে আমাদের মহারাজা তাঁর পরিষদের সভ্যদের খুব আমোদে রাখেন আর রক্ষাও করেন। এটা কম সৌভাগ্য নয়।"

এই পর্যন্ত বলে' কপিঞ্জল যখন মহারাণীর দিকে দৃষ্টি ফেরালেন তখন দেখলেন তিনি যেন জমে' গেছেন।

"মন্ত্রীমশায়, আপনি দেখছি রসিক লোক। কিন্তু আপনি বিস্মৃত হয়েছেন কোথায় আপনি দাঁড়িয়ে আছেন। এতক্ষণ আমাকে যে সব পরামর্শ দিলেন এবং যে সব অভিনয় করলেন তা একটাও হয়তো কাজে লাগবে না। কারণ আপনার প্রভু, গর্জনগাঁওয়ের মহারাজা গন্ধরাজ অত সহজে ভোলবার লোক নন। তিনিও অনেক সময় শক্তি এবং বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে থাকেন।"

মনে মনে জ্বলে' উঠলেন কপিঞ্জল। ভাঁড়দের অহমিকাও গগনচুম্বী হয় আর তাতে আঘাত লাগলে অত্যন্ত মর্মান্তিক হয় সেটা তাদের কাছে, বিশেষত কপিঞ্জল যে উদ্দেশ্যে এ ভাঁড়ামির অবতারণা করেছিলেন সেটা তুচ্ছ নয়, অতিশয় গভীর। তাই স্বরূপিণীর এই আঘাতটা বড়ই বাজল মনে। কিন্তু কপিঞ্জল লৌহ-মানব। বাইরে কোন কিছু প্রকাশ করলেন না। সাধারণ ভাঁড় হ'লে সরে' পড়তেন, কিন্তু তিনি তা-ও করলেন না, নিজের হাল ধরে' অটল হ'য়ে রইলেন।

মৃদু হেসে বললেন, "তাই নাকি। তাহলে শক্তি এবং বুদ্ধির

সাহায্যেই লড়তে হবে তাঁর সঙ্গে। উন্মত্ত ষাঁড়কে থামাতে হ'লে তার শিং দুটোই চেপে ধরতে হবে।"

"দেখা যাক"—ওড়নাটা ঠিক করে' নিয়ে ওঠবার উপক্রম করলেন সুরূপিণী। চটলে অপরূপ দেখায় সুরূপিণীকে। রাগ, ঘৃণা, বদমেজাজ গয়নার মতো মানায় তাঁকে। সুরূপিণীকে সত্যিই সুরূপিণী বলে' মনে হ'তে লাগল।

"ভগবান করুন, ওদের যেন ঝগড়া হ'য়ে যায়"—মনে মনে ভাবলেন কপিঞ্জল—"ঝগড়া না হ'লে দজ্জালিনিটাকে দলে টানা যাবে না। এখানে আর আমার থাকা উচিত হচ্ছে না। মহারাজকে এবার আসতে দেওয়া উচিত। নারদ—নারদ—"

কপিঞ্জল নতজানু হ'য়ে সুরূপিণীর হস্ত চুম্বন করলেন। বাত ছিল হাঁটুতে ব্যথা লাগল একটু। কিন্তু তিনি সসম্ভ্রমে বললেন "মহারাণী, আপনার ভৃত্যকে এবার বিদায় দিন। রাজপরিষদের বৈঠকের জন্য অনেক কিছু করতে হবে আমাকে এখন।"

"যান—"

সুরূপিণী উঠে দাঁড়ালেন। কপিঞ্জল পিছনের গোপন একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন তাড়াতাড়ি। সুরূপিণী ঘণ্টা বাজালেন এবং সহচরীকে আদেশ দিলেন মহারাজকে খবর দিতে।

দশ

কতো মহৎ সদিচ্ছা নিয়েই না গন্ধরাজ তাঁর স্ত্রীর কক্ষে প্রবেশ করলেন। পিতার মমত্ববোধ, কোমল অনুভূতির পসরা, নীতি-বচনের মালা কিছুরই অভাব ছিল না—অনেক আশা নিয়েই প্রবেশ করলেন তিনি। সুরূপিণীও যে খুব বিরূপিণী ছিলেন তা নয়। গন্ধরাজ তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিঘ্ন হ'য়ে দাঁড়িয়ে সব ভণ্ডুল করে' দেবে এ ভয়ও আর ছিল না, কারণ তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষার সিঁড়িগুলোর পরিচয় পেয়ে বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন তিনি। কপিঞ্জলের উপর তিনি যে কেবল অপ্রসন্নই হয়েছিলেন তাই নয় তাঁর সম্বন্ধে একটা বিভীষিকাও সঞ্চারিত হয়েছিল তাঁর মনে। লোকটিকে তিনি যেন মোটেই সহ্য করতে পারছিলেন না আর। তাঁর নির্লজ্জ দাসসুলভ আচরণ থেকে এবং যে অশোভন মনোযোগ তিনি তাঁর প্রতি বর্ষণ করছেন তার অসৌজন্য থেকে তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে লোকটা আসলে বর্বরই। কিন্তু তবু প্রশ্রয় দিচ্ছিলেন তাকে কারণ যে ভালুক পোষে সে ভালুকের গায়ের গন্ধের জন্য তাকে ছেড়ে দেয় না। তাছাড়া তিনি গোপনে ঈর্ষাজনক এমন দু'একটা খবর পেয়েছিলেন যার থেকে বুঝেছিলেন লোকটা দুমুখো সাপও। এটা মিথ্যা নয় অবশ্য যে তিনি তাঁর সঙ্গে প্রণয়ের অভিনয় করেন, অবশ্য সেটা অভিনয়ই, আর কপিঞ্জল যেটা করেন সেটা সুরূপিণীর অহঙ্কারকে তোয়াজ। এখনি তিনি যে তাঁর সামনে তাঁর স্বামীকে নকল করে' ভাঁড়ের অভিনয় করলেন এবং যে ঘৃণ্য অবস্থায় পড়ে' তাঁকে সেটা মুখ বুজে দেখে যেতে হ'ল—এর জ্বালাটা তাঁর মনে জ্বলছিল তখনও, তাছাড়া বোঝার মতো কি যেন একটা চেপেছিল তাঁর বিবেকের উপর। গন্ধরাজ যখন ঘরে ঢুকলেন তখন সুরূপিণীর

মনের ভাবটা দোষী-দোষী, গন্ধরাজ তাঁকে এইসব নোংরামি থেকে বাঁচাবেন এই আশায় সুরূপিণী সাগ্রহে এগিয়ে গেলেন।

কিন্তু অদৃষ্ট মাঝে মাঝে পরিহাস করেন। এমন সাক্ষাৎকারও ফলপ্রসূ হ'ল না। ঘরে ঢুকেই গন্ধরাজের খটকা লাগল একটা। তিনি দেখলেন কপিঞ্জল চলে' গেছে, কিন্তু আয়নার খুব কাছ ঘেঁষে তখনও সেই চেয়ারটা আছে যেটায় বসেছিলেন তিনি। খচ্ করে' লাগল মনে। লোকটা সুরূপিণীর প্রসাধনকক্ষে এতক্ষণ তো ছিলই, যাবার সময়েও চোরের মতন গোপনে চলে' গেছে! যে সহচরী তাঁকে নিয়ে এসেছিল, একটু রূঢ়কণ্ঠে তাকে বাইরে যেতে বললেন।

"এস, এস, বস"—সুরূপিণী এগিয়ে গেলেন তাড়াতাড়ি। গন্ধরাজের রূঢ় কণ্ঠস্বরে সব কেমন যেন এলোমেলো হ'য়ে গেল। চেয়ারটার দিকে যে দৃষ্টিতে তিনি চেয়েছিলেন তা-ও একটু বিচলিত করল সুরূপিণীকে।

"সুরূপিণী, আমি তোমার এ ঘরে এত কম এসেছি যে এখানে আগন্তুকের বেশী কোন দাবি নেই আমার।"

"তুমি তো নিজেই নিজের পছন্দ মতো সঙ্গী-সাথীর সঙ্গে থাকতে ভালবাস।"

"সেই কথাই বলতে এসেছি"—গন্ধরাজ উত্তর দিলেন—"চার বছর আমাদের বিয়ে হ'য়েছে। এই চার বছরে আমি নিজেও সুখী হই নি, তোমাকেও সুখী করতে পারি নি। আমি ভালো করেই জানি আমি তোমার স্বামী হবার যোগ্য নই। আমি তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়, আমার কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, আমি খামখেয়ালী বিদূষক। তুমি যে আমাকে ঘৃণা কর তা আমার অবিদিত নেই, এর জন্যে তোমাকে দোষও দিই না আমি সুরূপিণী। কিন্তু সুবিচার করতে হ'লে তোমার ভেবে দেখা উচিত তোমার প্রতি আমি কি আচরণ করেছি। যখন আমি দেখলুম এই ক্ষুদ্র রঙ্গমঞ্চে

মহারাণীর ভূমিকায় অভিনয় করতে তোমার খুব ভালো লাগছে, সঙ্গে সঙ্গে কি আমি আমার খেলনার বাক্সটা, মানে গর্জনগাঁওয়ের এই রাজত্বটা তোমাকে দিয়ে দিই নি? যেই আমি অনুভব করলাম স্বামী হিসেবে তুমি আমাকে পছন্দ করছ না অমনি কি আমি সরে' দাঁড়াই নি? তোমাকে এতটা স্বাধীনতা আর কোনও স্বামী দিতে পারত কি? তুমি হয়তো বলবে আমি হৃদয়হীন, আমার কোনও অনুরাগ নেই, আমি খেয়ালখুশীর হাওয়ার মুখে উড়ে বেড়িয়েছি, আমার চাল-চলন অদ্ভুত তাই আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পার নি। মানছি সেটা। আমি দায়িত্ব এড়িয়ে গেছি, কিন্তু এটা এবার বুঝতে পারছি, দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া সহজ বটে, কিন্তু সঙ্গত নয়। হয়তো আমি তোমার স্বামী হিসাবে একটু বুড়ো, হয়তো তোমার পছন্দর মাপকাঠির মাপে আমার অযোগ্যতা ধরা পড়েছে, কিন্তু তবু সুরূপিণী এটা বোধহয় আমার ভোলা অন্যায় হ'য়েছে যে দেশে তোমাকে এনেছি সে দেশের আমি রাজা, তুমি যখন এসেছিলে তখন তুমি বালিকামাত্র, নিতান্ত শিশু। সেদিক থেকেও আমার কর্তব্য ছিল, কিন্তু সেসব কর্তব্য আমি পালন করি নি।"

বয়োজ্যেষ্ঠ হিসাবে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি নির্ঘাত মনকে বিরূপ করে' তোলে।

"কর্তব্য!"—হেসে উঠলেন সুরূপিণী—"তোমার মুখে কর্তব্যের কথা! শুনে সত্যিই হাসি পাচ্ছে গন্ধরাজ! হঠাৎ আজ এ খেয়াল? চাকরানীদের সঙ্গে প্রেম কর না গিয়ে আর মহারাজা হবার শখ যদি হ'য়ে থাকে, পুতুল-মহারাজা হও না। উপভোগ কর জীবনটা, যা বরাবর করে' এসেছ। কর্তব্য আর রাজত্বের ভার আমাদের উপর থাক।"

'আমাদের' কথাটা গন্ধরাজের কানে বাজল।

"উপভোগ? উপভোগের চরম করেছি আমি। কিন্তু তবু এর একটা দিকও আছে আর সেটাও বিবেচ্য। তোমার ধারণা আমি

শিকার নিয়েই উন্মত্ত। কিন্তু এমন এক দিন ছিল যখন যাকে লোকে সম্ভবত ভদ্রতা করেই আমার শাসন-ব্যবস্থা বলত তাতে আমি গভীরভাবে নিজেকে নিবিষ্ট করেছিলাম। একটা দাবি আমি করব, আমার সুরুচি আছে, জীবন্ত সুখ আর একঘেয়ে প্রণালীবদ্ধ জীবন যাপনের তফাত আমি বুঝতে পারি। শিকার, রাজসিংহাসন আর তোমার সঙ্গসুখের মধ্যে কোনটা আমার প্রিয় তা আমি অনায়াসে ঠিক করে' নিতাম, যদি তা ঠিক করবার সুযোগ আমার থাকত। তোমাকে যখন পেয়েছিলাম তখন তুমি বালিকা ছিলে, অর্ধ-স্ফুট কুঁড়ি একটি—"

"কি সর্বনাশ! প্রণয়ের অভিনয় শুরু হ'ল না কি?"

"দেখ, আমার একটি মাত্র গুণ, আমি হাস্যজনক কিছু করি না। আমি যা করছি তা রীতিমত দাম্পত্য-ব্যাপার। প্রণয় অভিনয় নয়। কিন্তু এর গোড়ার দিকটা যখন মনে পড়ে তখন দুঃখ হয়, এর চেয়ে মৃদু ভাষায় তার বর্ণনা করতে পারি না। সুবিচার কর সুরূপিণী: এই সব পুরোনো কাহিনীর স্মৃতি টেনে আনছি বলে' তুমি হয়তো আমাকে অসভ্য ভাবছ। কিন্তু একটু সুবিচার কর, সৌজন্যর খাতিরেও স্বীকার কর যে অতীতের সেই দিনগুলোর জন্য তুমিও দুঃখিত।"

"আমি কোনও কিছুর জন্য দুঃখিত নই"—সুরূপিণী বলে' উঠলেন—"আমি আশ্চর্য হ'য়ে যাচ্ছি। আমার ধারণা ছিল তুমি সুখী।"

"সুখের নানা চেহারা। কেউ বিদ্রোহ করে' সুখী হয়, কেউ বা ঘুমিয়ে। মদ, নিত্যনূতন পরিবর্তন, দেশভ্রমণ এ সবেও সুখ আছে। ধর্মেও আছে নাকি শুনেছি। ওপথে আমি অবশ্য চেষ্টা করে' দেখি নি কখনও। লোকে এ-ও বলে, সাবেক ধরনের, অনাড়ম্বর দাম্পত্য-জীবনেও নাকি আর এক রকম সুখের সন্ধান পাওয়া যায়। সুখী, হ্যাঁ বলতে পার তুমি—আমি সুখী, কিন্তু একটা কথা বলছি যখন

তোমাকে প্রথমে বিয়ে করে' এনেছিলাম তখন আমি আরও সুখী ছিলাম—"

একটু যেন জোর করে' হেসে সুরূপিণী বললেন, "তাহলে সে সুখ তোমার বেশী দিন ভালো লাগে নি বলতে হবে। দেখতে দেখতে তোমার মনের সুর বদলে গেল।"

"না, কিছুই বদলায় নি। সুরূপিণী, তোমার মনে আছে কি পথে আসতে আসতে ঝোপের মধ্যে গোলাপ দেখে যখন তোমার ভালো লেগেছিল তখন আমি ঘোড়া থেকে নেমে তুলে এনে দিয়েছিলাম সেগুলো? তখন সন্ধ্যা হচ্ছিল, আকাশে তখন স্বর্ণমহোৎসব, পাখিরা ডাকতে ডাকতে ফিরছিল নিজেদের বাসায়। ন'টি, হ্যাঁ ন'টি লাল গোলাপ তুলে দিয়েছিলাম তোমাকে এবং প্রত্যেকটির জন্য তুমি আমাকে চুমু দিয়েছিলে একটি। আমার মনে হয়েছিল যে প্রত্যেকটি গোলাপ এবং প্রত্যেকটি চুম্বনের জন্য আমাদের ভালবাসা অন্ততঃ এক বছর অম্লান থাকবে। কিন্তু দেড় বছর কাটতে না কাটতে সব শেষ হ'য়ে গেল। কিন্তু সুরূপিণী তোমার কি ধারণা যে আমার হৃদয়ও বদলে গেছে—"

"আমি জানি না"—মনে হ'ল সুরূপিণীর কণ্ঠস্বরে একটা যন্ত্র যেন কথা কইল।

"না, বদলায় নি"—গন্ধরাজ বলতে লাগলেন—"কিন্তু আমি জানি প্রেমের ব্যাপারে, এমন কি বিবাহিত স্বামীর পক্ষেও, এটা স্বীকার করা হাস্যকর যে সে সুখ-স্বপ্ন ভেঙে গেছে, চাইবারও আর কিছু নেই। ক্ষমা কর, চোরাবালির উপর সে স্বপ্নের প্রাসাদ গড়েছিলাম ঃ না, তোমার দোষ দিচ্ছি না, দোষটা হয়তো আমারই, সে চোরাবালি হয়তো আমারই অক্ষমতা। কিন্তু অনেক আশা নিয়ে গড়েছিলাম, এখনও তার ধ্বংসস্তূপ পড়ে আছে।"

"এত কবিত্ব কেন হঠাৎ"—হাসতে হাসতে সুরূপিণী বললেন। তাঁর হাসির মধ্যেও যেন প্রচ্ছন্ন কান্নার সুর বেজে উঠল। একটা

নামহীন বেদনা, অজানা আকুতি ধীরে ধীরে মূর্ত হ'তে লাগল যেন মনের মধ্যে।

"তোমার আসল উদ্দেশ্যটা কি ?"

"বলছি, কিন্তু বলতে কষ্ট হ'চ্ছে। কিন্তু বলতেই হবে—দেখ স্নুরূপিণী, যাই ঘটে' থাকুক, তবু আমি তোমার স্বামী, হয়তো বোকা, হয়তো অযোগ্য, কিন্তু তবু আমি তোমাকে এখনও ভালবাসি। কিন্তু মনে রেখো"—হঠাৎ দৃঢ় পরুষকণ্ঠে বলে' উঠলেন গন্ধরাজ—"আমি অনুনয় করতে আসি নি। প্রেম দিয়ে আমাকে যদি গ্রহণ করতে না পার, করুণা দিয়ে পারবে না। করুণা আমি চাই না, তা আমি প্রত্যাখ্যান করব। ঈর্ষা ? ঈর্ষার কোন সঙ্গত কারণ তো দেখতে পাই নি। যে কুকুরটা বিচালির গাদার উপর বসে' গরুকে বঞ্চিত করছে তার আচরণ কুকুরদেরই বিচার্য, কুকুররাই তাকে উপহাস করুক, আমি কিছু বলব না। কিন্তু জগতের চক্ষে আমি এখনও তোমার স্বামী, স্বামীর প্রতি যে ব্যবহার করা উচিত তা কি তুমি করেছ ? আমি নিজেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে রেখে তোমাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছি, তোমার কোনও ইচ্ছা অপূর্ণ রাখি নি। প্রতিদানে কি দিয়েছ তুমি আমাকে ? তুমি তো মাত্রা ঠিক রাখতে পার নি, হিসেব করে' চল নি, অবিবেচকের মতো যা তা করে' বসে আছ। কিন্তু আমরা যেখানে আছি, সেখানে সকলের দৃষ্টি আমাদের উপর, পান থেকে চুন খসবার জো নেই, শোভনতা শালীনতা এসব বজায় রাখতেই হবে। কেলেঙ্কারি হয়তো সহজে এড়ানো যায় না, কিন্তু ওর দংশন সহ্য করা শক্ত।"

"কেলেঙ্কারি!"—প্রায় যেন চীৎকার করে' উঠলেন স্নুরূপিণী—"তাহলে কেলেঙ্কারির কথা বলতেই তুমি এসেছ, তাই এত ভণিতা—"

"যা অন্তর থেকে অনুভব করছি, তাই বলবার চেষ্টা করেছি। আমি বলেছি আমি তোমাকে ভালবাসি—যদিও সে ভালবাসা

তোমার কাছে মূল্যহীন—কোনও স্বামীর পক্ষে এই তিক্ত সত্যটা মেনে নেওয়া শক্ত। কিন্তু তবু আমি কোনও কিছু গোপন না রেখে সব তোমাকে বলেছি যাতে তোমার মনে কোনও আঘাত না লাগে। যখন বলতে আরম্ভ করেছি তখন শেষ পর্যন্ত সব বলব।"

"হ্যাঁ, বলতেই হবে। কিসের কেলেঙ্কারি?"

গন্ধরাজের মুখটা লাল হ'য়ে উঠল।

"যা বলতে বাধ্য হচ্ছি তা না বলাই ভালো ছিল। আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, কপিঞ্জলের সঙ্গে মেলামেশাটা একটু কম কর।"

"কপিঞ্জলের সঙ্গে? কেন!"

"ওইটেই কেলেঙ্কারির কারণ, সুরূপিণী। চারদিকে টি টি পড়ে' গেছে। নিদারুণ যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছি আমি। আমার বিশ্বাস তোমার বাবা মা যদি শোনেন তাঁরাও পাবেন।"

"তোমার মুখেই প্রথম একথা শুনলাম। এজন্যে তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।"

"হয়তো না-শোনার একটা হেতু আছে। তোমার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে আমিই বোধহয় একমাত্র ব্যক্তি—"

"আমার বন্ধুবান্ধবদের কথা থাক। তারা ভিন্ন জাতের লোক। তুমি এসে সাড়ম্বরে তোমার ভাবাবেগের তুফান বইয়ে দিলে। কতদিন পরে এলে বল তো? শেষবার কবে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল? তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার রাজ্য আমি শাসন করেছি, কারও সাহায্য না নিয়ে। যা পুরুষের কাজ তা করে' করে' আমি যখন ক্লান্ত এবং তোমার খেয়াল-খুশির খেলা খেলে তুমিও যখন শ্রান্ত—তখন তুমি এসে দাম্পত্য-প্রণয়ের খুঁটিনাটি নিয়ে তিরস্কার আর বক্তৃতার আড়ম্বর করছ। একটা কথা তোমার মনে রাখা উচিত রাজ্যশাসনের কাজ চালিয়ে বধূর ভূমিকায় নিখুঁত থাকা

যায় না। আমরা, রাজারাজড়ারা, কেলেঙ্কারির আবহাওয়াতেই তো অভ্যস্ত। তুমি একজন মহারাজা, তোমার এ কথাটা জানা উচিত ছিল, লোকনিন্দাই তো আমাদের অঙ্গের ভূষণ। তোমার এ ব্যবহারের প্রশংসা করতে পারলাম না। ওই কুৎসা কি তুমি বিশ্বাস কর ?"

"করলে আমি কি এখানে আসতাম—"

"বিশ্বাস কর কি না আমি জানতে চাই"—হঠাৎ যেন ক্ষেপে গেলেন সুরূপিণী—"যদি বিশ্বাস করে' থাক—ধর যদি বিশ্বাস করে' থাক—"

"তাহলেও আমি সে বিশ্বাসকে অবিশ্বাসে রূপান্তরিত করা আমার কর্তব্য বলে' মনে করতাম।"

"বুঝতে পেরেছি। নীচতা ছাড়া তোমার মধ্যে আর কিছু নেই।"

"সুরূপিণী"—অবশেষে গন্ধরাজ যেন জেগে উঠলেন—"থাক্, ঢের হ'য়েছে। তুমি জেদ করে' আমাকে ভুল বুঝছ, আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিচ্ছ ইচ্ছে করে'। তোমার বাবা মায়ের নামে, আমার নামে আমি তোমাকে বলছি—সাবধান হও।"

"এটা কি অনুরোধ মহারাজ ?"

"ইচ্ছে করলে আমি আদেশ করতেও পারতুম।"

"আইন অনুসারে বন্দীও করতে পার আমাকে। তা না করা পর্যন্ত তোমার কথা মানতে পারব না।"

"এতদিন যা করে' এসেছ তাই করবে ?"

"ঠিক তাই করব। এই প্রহসন শেষ হ'য়ে গেলেই আমি প্রধান মন্ত্রী কপিঞ্জলকে ডেকে পাঠাব। বুঝতে পেরেছ ?"

এই বলে' উঠে পড়লেন সুরূপিণী, বললেন—"এ ছাড়া আর আমার কোনও বক্তব্য নেই।"

"একটি অনুরোধ তাহলে করব আবার"—গন্ধরাজ শান্ত কণ্ঠেই বললেন, যদিও তাঁর ভিতরটা রাগে পুড়ে যাচ্ছিল—"তোমার হাতটা

বাড়িয়ে দাও। চল একসঙ্গে আর একবার আমাদের এই পুরোনো বাড়িটা ঘুরে আসি। বেশীক্ষণ সময় লাগবে না। এই আমার শেষ অনুরোধ।”

“শেষ? ভালই তো, শুনে খুশী হলাম। চল—”

হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি, গন্ধরাজও ধরলেন সেটা, উভয় পক্ষেই যেন সাড়ম্বর অভিনয় হ'ল একটা। কপিঞ্জল যে গোপন দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল সেই দরজাটা দিয়ে হাত ধরাধরি করে' বেরিয়ে গেলেন তাঁরা। বাগানের ধারে দু'একটা জনবিরল লম্বা দালান পার হ'য়ে গন্ধরাজের ঘরগুলোর কাছে এসে হাজির হ'লেন অবশেষে। প্রথম ঘরটিই অস্ত্রাগার, নানা দেশের নানা রকম অস্ত্র টাঙানো আছে সেখানে। ঘরের সামনেই বেশ বড় একটা নির্জন ছাদ।

“তুমি কি হত্যা করবে বলে' আমাকে এনেছ?”—প্রশ্ন করলেন সুরূপিণী।

“না, শুধু দেখাবার জন্য। চল, পার হ'য়ে যাই এটা।”

এর পরেই গ্রন্থশালা। সেখানে একজন বৃদ্ধ কঞ্চুকী বসে' ঢুলছিলেন। রাজদম্পতীকে দেখে শশব্যস্তে উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করলেন তিনি, জিজ্ঞাসা করলেন কোন আদেশ আছে কি না।

“এখানেই থাকুন আপনি, যদি কিছু দরকার হয়—”

এরপরই ছবির ঘরে ঢুকলেন তাঁরা। সামনেই সুরূপিণীর ছবিটা ঘরটাকে আলো করে' টাঙানো ছিল। বধূবেশিনী সুরূপিণী, মাথায় লাল লাল গোলাপ ফুলগুলো যেন জীবন্ত। গন্ধরাজ কোন কথা না বলে' সেদিকে আঙুল তুলে দেখালেন। সুরূপিণীও চোখ তুলে দেখলেন নীরবে। এরপরই তাঁরা দামী মাদুর-পাতা একটা বড় দালানে প্রবেশ করলেন। সে দালানে চারটি ঘরের চারটি দরজা। একটি দরজা গন্ধরাজের শয়নকক্ষের, আর একটি সুরূপিণীর

ঘরের। এখানে এসে গন্ধরাজ সুরূপিণীর হাত ছেড়ে দিলেন। এতক্ষণ ছাড়েন নি। হাত ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে খিল লাগিয়ে দিলেন ঘরে।

"এ ঘরে অনেকদিন ভিতর থেকে খিল পড়ে নি, বাইরে থেকেই পড়েছে" বললেন গন্ধরাজ।

"একটা খিলই যথেষ্ট"—তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন সুরূপিণী— "বাস্, এই তো ? না, আর কিছু করবে।"

"না, আর কিছু করবার নেই। তোমাকে কি আবার ফিরে রেখে আসব ?"

"তোমার সঙ্গে নয়, কপিঞ্জলের সঙ্গে আমি ফিরে যেতে চাই।"

গন্ধরাজ কঞ্চুকীকে ডাকলেন।

"প্রধান মন্ত্রী কপিঞ্জল যদি প্রাসাদে থাকেন, বল মহারাণী তাঁকে ডাকছেন।"

কঞ্চুকী চলে' গেলেন।

"তোমাকে খুশী করতে আর কিছু করতে পারি কি সুরূপিণী ?"

"না, আর কিছুর দরকার নেই। আমার খুশির ভরা উপচে উঠেছে।"

"এইবার"—গন্ধরাজ বলতে লাগলেন—"সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দিলাম তোমাকে। আমাকে বিয়ে করে' বড়ই দুঃখ পেয়েছ তুমি।"

"দুঃখ !"—এই একটি কথা কেবল উচ্চারণ করলেন সুরূপিণী।

"অনেকে এই দুঃখের ভার লঘু করতে চেষ্টা করেছে, আমি আরও হালকা করে' দিলুম। হ্যাঁ, আর একটা কথা, আমার পিতৃপুরুষের নামটা এখনও তোমার নামের সঙ্গে জুড়ে রইল। ও নামের যেন কোনও অমর্যাদা না হয় এইটি শুধু দেখো !"

"কপিঞ্জল আসতে বড়ই দেরি করছেন তো"—সুরূপিণী এর জবাবে এই শুধু বললেন।

"সুরূপিণী, সুরূপিণী"—আর কিছু বলতে পারলেন না গন্ধরাজ।

সুরূপিণী একটা জানলার কাছে এগিয়ে গিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইলেন। একটু পরেই কঞ্চুকী খবর দিলেন কপিঞ্জল এসেছেন। কপিঞ্জল যখন ভিতরে প্রবেশ করলেন তখন তাঁর চোখ কপালে উঠেছে, মুখ বিবর্ণ। আকস্মিক অপ্রত্যাশিত এই আহ্বানে তিনি যেন ঈষৎ দিশাহারা হ'য়ে পড়েছেন মনে হ'ল। সুরূপিণী ঘুরে দাঁড়ালেন জানলা থেকে। তাঁর চোখে মুখে হাসি চিকমিক করছে। গাল আর কানের পাশ দুটো লাল হ'য়ে ছিল তখনও, এ ছাড়া তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্বের আর কোন চিহ্ন বোঝা যাচ্ছিল না। গন্ধরাজকেও ঈষৎ বিবর্ণ দেখাচ্ছিল কেবল, কিন্তু তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নি।

"মন্ত্রীমশায়"—গম্ভীর ভাবে বললেন তিনি—"একটু কষ্ট দিলাম আপনাকে। আপনি মহারাণীকে তাঁর কক্ষে পৌঁছে দিয়ে আসুন।"

হাত বাড়িয়ে দিলেন কপিঞ্জল, যদিও তখনও তিনি অকূল পাথারে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন মনে মনে। সুরূপিণী হাসিমুখে তাঁর হাত ধরলেন এবং পাশাপাশি যেন পাল তুলে বেরিয়ে গেলেন ছবিঘরের ভিতর দিয়ে।

তাঁরা চলে' যাওয়ামাত্রই গন্ধরাজ বুঝতে পারলেন ব্যর্থ হ'য়ে গেল সব, হেরে গেলেন তিনি। তিনি যা করবেন ভেবে এসেছিলেন ঠিক তার উল্টোটা হ'য়ে গেল। বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। এই চরম নিদারুণ পরিণতিটার মধ্যে হাসির উপাদান আছে, হঠাৎ এটা বুঝতে পেরে হো হো করে' হেসেও উঠলেন, যদিও রাগে তাঁর বুক পুড়ে যাচ্ছিল। তারপরই দুঃখ হ'ল খুব, তীক্ষ্ণ মর্মন্তুদ দুঃখ। কিন্তু দুঃখও বেশীক্ষণ রইল না। সব কথা মনে পড়ল যখন তখন রাগ হ'ল আবার, ভয়ঙ্কর রাগ। মন-স্থির করতে পারছিলেন না তিনি। নিজের মতিভ্রম আর নপুংসকতার গ্লানি হঠাৎ যেন দাউ

দাউ করে' জ্বলে' উঠল আগুনের মতো। অস্থির হ'য়ে উঠলেন। নিজের প্রতিই করুণা হ'তে লাগল।

বাঘের মতো পরিক্রমণ করতে লাগলেন তিনি ঘরের মধ্যে। মনে হ'তে লাগল মুহূর্তের মধ্যে হয়তো ভয়ানক একটা কিছু করে' বসবেন। পিস্তল যেমন হঠাৎ খুন করে' পরমুহূর্তেই পদাহত হ'য়ে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়, মনে হ'ল তিনিও বুঝি করে' ফেলবেন তেমনি কিছু একটা। লম্বা দালানটায় পায়চারিই করে' যেতে লাগলেন তিনি, নানা অনুভূতির দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত হ'য়ে রুমালটা দু'হাতে ছিঁড়তে ছিঁড়তে। সমস্ত চেতনাকে একাগ্র উদগ্র করে' তিনি মনে মনে কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে চাইছিলেন। পিস্তলে গুলি ভরাই ছিল। ঈর্ষার তাড়না যখন মনের কোমল বৃত্তিগুলোর উপর কশাঘাত করছিল, যখন সুরূপিণীর নানাভঙ্গীর বহ্নি-মূর্তি মানসচক্ষে ভেসে উঠছিল, তখন ভয়াবহ হ'য়ে উঠছিল তাঁর আর্ত মুখ-ভাব। ঈর্ষাকে তিনি আমোলে আনতে চাইছিলেন না, কিন্তু দংশন করতে ছাড়ছিল না তা। এই মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যেও তিনি ভাবতে পারছিলেন না যে সুরূপিণী সত্যিই দোষী। সুরূপিণী কলঙ্কিনী নয় এই বিশ্বাস-কেই তিনি প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে' থাকতে চাইছিলেন ; কিন্তু সন্দেহ তবু উঁকি মারিছিল, সম্ভাবনাকে তিনি অস্বীকার করতে পারছিলেন না, আর সেই জন্যেই ছটফট করে' ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, নানা দুঃখের বোঝার উপর এই সন্দেহের শাকের আঁটিটা দুর্বহ মনে হচ্ছিল তাঁর।

এমন সময় দুয়ারে টোকা পড়ল। কুঞ্চুকী এসে একটি ছোট চিঠি দিলে তাঁকে। চিঠিটা নিয়ে হাতের মুঠোর মধ্যে পিষে ফেললেন সেটাকে, পড়লেন না। যেমন পরিক্রমণ করছিলেন তেমনি করতে লাগলেন। উদ্দাম ঝড় তেমনি বইতে লাগল মনের মধ্যে। কিছুক্ষণ পরে তাঁর চৈতন্য হ'ল চিঠিতে কি আছে সেটা

পড়ে' দেখা উচিত। পেন্সিলে লেখা একলাইন চিঠি ইন্দীবর ভারতী পাঠিয়েছেন--

রাজপরিষদের অধিবেশন গোপনে এবং অবিলম্বে আহূত হয়েছে।

ই. ভা.

নিয়মিত সময়ের পূর্বে এবং গোপনে পরিষদের অধিবেশন ডাকবার মানে? একটি মানেই প্রতিভাত হ'ল গন্ধরাজের মনে। পাছে অধিবেশনে উপস্থিত হ'য়ে তিনি কিছু বাধা দেন সেই ভয়ে এ কাজ করা হয়েছে। ভয়েঃ কথাটা বড় আরামদায়ক মনে হ'ল। ইন্দীবর—তাঁর বন্ধু ইন্দীবর ভারতী—যে তাঁকে বরাবর খামখেয়ালী গ্রাম্য লোক বলে' ভেবে এসেছে—সে-ও তাঁকে সময়ে খবরটা দিয়ে সতর্ক করে' দিয়েছেঃ মানে, ইন্দীবরও তাঁর কাছে কিছু প্রত্যাশা করছে। বেশ, তাকে হতাশ করবেন না গন্ধরাজ। রাহুগ্রস্ত চন্দ্র এবার রাহুমুক্ত হয়ে পূর্ণ মহিমায় আত্মপ্রকাশ করবে আকাশে। তিনি তাঁর পরিচারককে ডাকলেন। পোশাক-পরিচ্ছদ ঠিক করে' নিলেন সাড়ম্বরে। গোঁফের ডগা পাকিয়ে আতর লাগালেন তাতে, ঠিক করে' নিলেন অবিন্যস্ত কেশদাম, অলঙ্কৃত করলেন নিজেকে। তারপর মনোহর বেশে এগিয়ে গেলেন একাই পরিষদকক্ষের দিকে।

এগারো

ইন্দীবর ভারতী ঠিকই খবর দিয়েছিলেন। ভগীরথ শর্মাকে মুক্তিদান, মহাধ্যক্ষ কুজ্ঝটিকুমারের দুরু-দুরু-হৃদয়ের সভয় নিবেদন এবং পরিশেষে সুরূপিণীর সঙ্গে গন্ধরাজের সাক্ষাৎকার—এই সমস্ত বিবেচনা করে' ষড়যন্ত্রকারীরা শেষে সাহস করে' ভীরুর মতো গোপনে এবং অসময়ে রাজপরিষদের অধিবেশন আহ্বান করাই ঠিক করেছিলেন। একটু তাড়াহুড়ো করতে হয়েছিল অবশ্য, রাজপোশাক পরিহিত পরিচারকদের চিঠি নিয়ে ছুটোছুটি করতে হয়েছিল নানা দিকে। অবশেষে সাধারণ সময়ের এক ঘণ্টা পূর্বে পরিষদকক্ষে সদস্যরা এসে সমবেত হলেন।

সদস্যসংখ্যা খুব বেশী নয়। কপিঞ্জল সদস্যসংখ্যা অনেক কমিয়ে দিয়েছিলেন। যাঁরা রাজ্যের 'হাতিয়ার' তাঁরাই অধিষ্ঠিত ছিলেন সদস্যপদে। পাশের একটি টেবিলে তিনজন সম্পাদক বসে' ছিলেন। সুরূপিণী ছিলেন সভানায়িকা। তাঁর ডান দিকে ছিলেন কপিঞ্জল, বাঁ দিকে কুজ্ঝটিকুমার। আর একদিকে ছিলেন কোষাধ্যক্ষ শঙ্করদেব, গম্ভীরা দেবীর স্বামী। তাঁর পাশে ছিলেন অঞ্জনা দেবীর স্বামী রঘু বর্মন। আর তাঁদের মধ্যে সকলের বিস্ময় উৎপাদন করে' বসেছিলেন ইন্দীবর ভারতী। গন্ধরাজই তাঁকে সদস্যপদে মনোনীত করেছিলেন অনেক আগে। অন্য কোনও কারণে নয়, সদস্যের বেতন পেলে তাঁর জীবনটা আর একটু স্বচ্ছন্দ হবে এই জন্য। তিনি কখনও কোনও অধিবেশনে আসতেন না, তাই সদস্যপদ থেকে তাঁকে বরখাস্ত করবার কথা কপিঞ্জলের মনেই হয়নি। অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁকে এই অধিবেশনে উপস্থিত দেখে সবাই যেন বিব্রত বোধ করছিলেন একটু। কপিঞ্জল ভ্রূকুটিকুটিল মুখে চেয়েছিলেন তাঁর দিকে। তাঁর পাশে রঘু বর্মন বসে' ছিলেন, কপিঞ্জলের চোখের

দৃষ্টি দেখে তিনি ইন্দীবরের কাছ থেকে সরে' বসলেন একটু। তাঁর মনে হ'ল যার উপর কপিঞ্জল প্রসন্ন নন তাঁর কাছে বসাটা নিরাপদ নয় ঠিক।

"মহারাণী"—কপিঞ্জল বললেন—"দেরি হ'য়ে যাচ্ছে, এবার আমরা কাজ আরম্ভ করব কি?"

"হ্যাঁ অবিলম্বে।"

"মহারাণী, একটু বাধা দিচ্ছি, ক্ষমা করবেন"—ইন্দীবর বললেন— "আপনারা হয়তো জানেন না মহারাজা রাজধানীতে ফিরে এসেছেন।"

"জানি, কিন্তু তিনি অধিবেশনে আসবেন না"—তাঁর কানের পাশটা লাল হ'য়ে উঠল একটু—"মহাধ্যক্ষ মশাই আমাদের প্রস্তাব-গুলো এবার পড়া হোক একে একে। ভৈরঙ্গীর সম্বন্ধে একটা প্রস্তাব আছে না?"

একজন সম্পাদক একটা কাগজ এগিয়ে দিলেন।

"হ্যাঁ, এই যে সেই প্রস্তাব। পড়ব কি?"

"পড়বার দরকার নেই। ওতে কি আছে আমরা জানি। মহারাণীর সমর্থন আছে তো?"

"নিশ্চয়ই"

"তাহলে ওটা 'পঠিত' বলে' ধরে' নেওয়া হোক। মহারাণী কি স্বাক্ষর করবেন?"

মহারাণী স্বাক্ষর করলেন। কপিঞ্জল, রঘু বর্মন, শঙ্করদেব তার পর স্বাক্ষর করলেন একে একে। তারপর কাগজটা ইন্দীবরের দিকে বাড়িয়ে দিলেন তাঁরা। ইন্দীবর সই না করে ধীরে সুস্থে পড়তে শুরু করে' দিলেন প্রস্তাবটা।

"আমাদের সময় বড় কম, ভারতী মশায়,"—অসভ্যের মতো বলে উঠলেন কপিঞ্জল—"যে প্রস্তাবে স্বয়ং মহারাণীর সমর্থন আছে তাতে স্বাক্ষর করতে যদি আপনার আপত্তি থাকে, তাহলে কাগজটা

পাশের লোককে দিন। কিংবা যদি ইচ্ছা করেন আপনি সভাকক্ষ থেকে চলে' যেতেও পারেন।"

"মাপ করবেন, আপনার অনুরোধ রক্ষা করতে পারলাম না, মন্ত্রী মশায়। আমি আবার বলছি আমাদের মহারাজা এখনও পরিষদে আসেন নি"—এই বলে' আবার তিনি শান্তভাবে পড়তে শুরু করলেন। বাকী সকলে রাগে গরগর করতে করতে পরস্পরের মুখের দিকে চাইতে লাগলেন ব্যর্থ আক্রোশে। পড়া শেষ করে' অবশেষে তিনি বললেন, "মহারাণী এবং সদস্যগণ, এ প্রস্তাবটি তো যুদ্ধঘোষণা ছাড়া আর কিছু নয় দেখছি।"

"আর কিছু নয়!"—সুরূপিণীর চোখের দৃষ্টিতে আগুন জ্বলে' উঠল।

"গর্জনগাঁওয়ের মহারাজা এখন এখানে আছেন। আমি চাই—হ্যাঁ, জোর দিয়েই বলছি—আমি চাই যে তাঁকে খবর দিয়ে এখানে ডেকে আনা হোক। কেন বলছি তা নিয়ে বাগবিস্তার করা আমি নিরর্থক মনে করি। আশা করি এই বদ মতলবের জন্য—যা বিশ্বাসঘাতকতারই নামান্তর—আপনারা সবাই মনে মনে লজ্জিত।"

সমুদ্রের মতো উত্তাল হ'য়ে উঠল পরিষদ। নানা রকম চীৎকার উঠল। কপিঞ্জল সগর্জনে বলে' উঠলেন—"আপনি মহারাণীকে অপমান করছেন।"

এর কোন জবাব না দিয়ে ইন্দীবর শান্ত কণ্ঠে কেবল বললেন—"আমার প্রতিবাদ থেকে এক চুলও আমি নড়ব না।"

কলরব যখন তুমুল হ'য়ে উঠেছে তখন সভ্যকক্ষের কপাটটা খুলে গেল। প্রতিহারী ঘোষণা করল—"মহারাজ এসেছেন।" মৃদু হাসতে হাসতে খুব সহজ স্বচ্ছন্দ চালে প্রবেশ করলেন গন্ধরাজ। ফুটন্ত ডালের হাঁড়িতে যেন তেল পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে প্রত্যেকেই বসে' পড়লেন নিজের নিজের জায়গায়। কুজ্‌ঝটিকুমার ভান করলেন

যেন তিনি কাগজপত্র নিয়েই মগ্ন ছিলেন, গম্ভীরভাবে কাগজপত্রই ওলটাতে লাগলেন। এই কপটতায় কিন্তু একটা জিনিস বিস্মৃত হলেন সকলে। মহারাজকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন না কেউ।

"সভাসদগণ"—থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন গন্ধরাজই।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন সদস্যরা। আচরণের এই গাফিলতিতে সবাই আরও যেন ঘাবড়ে গেলেন, বিশেষ করে' যাঁরা দুর্বলচিত্ত, তাঁরা।

গন্ধরাজ ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন টেবিলের দিকে। তারপর আবার থামলেন একটু। কুজ্‌ঝটিকুমারের দিকে চেয়ে বললেন—"অধিবেশনের সময় যে আপনারা বদলেছেন তা আমাকে জানানো হয় নি কেন?"

"মহারাজ..." মহাধ্যক্ষ বললেন, "মহামান্যা মহারাণী..."

আর কিছু বলতে পারলেন না তিনি, থেমে গেলেন আমতা আমতা করে'।

সুরূপিণী বললেন—"আমার ধারণা ছিল তুমি পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেবে না।"

এক মুহূর্তের জন্য চারিচক্ষুর মিলন হ'ল, সুরূপিণীর চক্ষু নত হ'ল পরমুহূর্তেই। এই মিথ্যাচারের আহুতিতে তাঁর অন্তর্নিরুদ্ধ ক্রোধবহ্নি আরও যেন জ্বলে' উঠল।

"এবার আপনারা বসুন সবাই"—গন্ধরাজ নিজের আসনে উপবেশন করলেন।

"আমি অনেকদিন এখানে ছিলাম না। অনেক কাজ নিশ্চয় জমে' গেছে। কিন্তু কাজে হাত দেবার আগে কোষাধ্যক্ষ শঙ্করদেবকে অনুরোধ করছি তিনি অবিলম্বে আমাকে রাজকোষ থেকে দশ হাজার টাকা এনে দিন আগে। আমার নামে খরচ লিখে রাখুন এটা—"

শঙ্করদেব সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন।

"দশ হাজার টাকা!"—স্বরূপিণী প্রশ্ন করলেন—"কিসের জন্য ?"

হেসে উত্তর দিলেন গন্ধরাজ—"আমার নিজেরই দরকার আছে।"

কপিঞ্জল টেবিলের নীচে পা চালিয়ে খোঁচা দিলেন শঙ্করদেবকে। শঙ্করদেব তো তাঁর হাতের পুতুলমাত্র। তিনি শুরু করলেন—"মহারাজ যদি জানান যে কি বাবদ টাকাটা খরচ হবে—"

"মহারাজের জবাবদিহি তলব করবার অধিকার কে দিলে আপনাকে!" সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন গন্ধরাজ।

শঙ্করদেব অসহায় ভাবে চাইলেন প্রভু কপিঞ্জলের দিকে। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এলেন তাঁর সাহায্যে। মধুর কণ্ঠে প্রতিটি কথা ওজন করে' করে' বললেন—"শঙ্করদেবের আচরণে মহারাজের আশ্চর্য হওয়ার সঙ্গত কারণ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু আমি জানি আপনার সম্মান ক্ষুণ্ন করবার কল্পনাও উনি করতে পারেন না। কিন্তু ওঁর উচিত ছিল গোড়াতেই ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা আপনাকে। বর্তমানে আমাদের রাজকোষ অর্থশূন্য, যা অর্থ ছিল তা নিঃশেষ হ'য়ে গেছে, মানে সেটা অন্য একটা দরকারী ব্যাপারে আটকে পড়েছে। সেটা কি তা আপনাকে বলছি। আশা করি এক মাসের মধ্যে নিঃসন্দেহে আমরা মহারাজের আদেশ পালন করতে পারব। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে, ওই সামান্য দশ হাজার টাকাও দিতে আমাদের রাজকোষ অক্ষম। মহারাজকে হতাশ করতে হ'ল বলে' আমরা আন্তরিক দুঃখিত। আপনার আদেশ পালন করতে আমাদের আগ্রহের অভাব নেই, কিন্তু বর্তমানে আমাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।"

"কোষাধ্যক্ষ মশাই, রাজকোষে এখন কত অর্থ আছে ?"—ভ্রূকুঞ্চিত করে' প্রশ্ন করলেন গন্ধরাজ।

"মহারাজ"—প্রতিবাদের ভঙ্গীতে উত্তর দিলেন শঙ্করদেব—"রাজকোষের প্রতিটি কপর্দক এখন নিতান্ত প্রয়োজন আমাদের—"

"আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাচ্ছেন, শঙ্করদেব"—বিদ্যুতের দীপ্তি চমকে উঠল গন্ধরাজের দৃষ্টিতে। পাশের টেবিলের দিকে চেয়ে বললেন, "সম্পাদক মশাই, রাজকোষের হিসাবের খাতাটা আমাকে দিন তো।"

শঙ্করদেব বিবর্ণ হ'য়ে গিয়েছিলেন ঃ কুজ্ঝটিকুমার ভাবছিলেন এইবার তাঁর পালা। মনে মনে ভগবানকে ডাকছিলেন তিনি। কপিঞ্জল মার্জারের মতো ওত পেতে লক্ষ্য করে' যাচ্ছিলেন সব। ইন্দীবর একটু অবাক হয়ে চেয়েছিলেন গন্ধরাজের দিকে। গন্ধরাজের পৌরুষের প্রমাণ পেয়ে মনে মনে খুব খুশী হয়েছিলেন তিনি, কিন্তু বুঝতে পারছিলেন না এই সঙীন গুরুতর পরিস্থিতিতে টাকা-কড়ি নিয়ে কথাবার্তার অর্থ কি? নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে এভাবে শক্তির অপব্যয় করা কি ঠিক হ'চ্ছে?

গন্ধরাজ হিসাবের খাতাটা দেখছিলেন।

বললেন, "দেখছি রাজকোষে এখন এক লক্ষ টাকা রয়েছে—"

"হ্যাঁ, ঠিক তাই"—কপিঞ্জল বললেন—"কিন্তু বাজারে এখন আমাদের যা দেনা আছে, যদিও সৌভাগ্যক্রমে সবটা নগদ দেনা নয়, তা এই এক লাখ টাকায় শোধ হবে না। সেইজন্যে রাজকোষ থেকে এখন একটি কপর্দকও অন্য বাবদে খরচ করা চলবে না। করলে ঘোরতর অপরাধ হবে সেটা। যদিও খাতায় এক লাখ টাকা দেখছেন, আসলে কিন্তু রাজকোষ শূন্য। যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম কেনবার জন্যে আমাদের একটা প্রস্তাবও উত্থাপিত হবে আজ—"

"যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম?" বিস্ময়ের চমৎকার অভিনয় করে' বলে' উঠলেন গন্ধরাজ—"যতদূর মনে পড়ছে গত মাঘ মাসে আমরা কিছু যুদ্ধের সরঞ্জাম কিনেছিলাম।"

"আরও কেনবার প্রয়োজন ঘটেছে। আমরা সম্পূর্ণ একটা গোলন্দাজবাহিনী সজ্জিত করেছি; পাঁচশ' বন্দুক কেনা হয়েছে, কিছু কামানও, তাছাড়া মালবাহী অশ্বতরও সাতশো কিনতে

হয়েছে। এর বিস্তারিত বিবরণ প্রস্তাবে লেখা আছে। ধূর্জটিপ্রসাদ অনুগ্রহ করে' প্রস্তাবটা দিন তো—"

ধূর্জটিপ্রসাদ আর একজন সম্পাদক। তিনি তাড়াতাড়ি প্রস্তাব-পত্রটা বাড়িয়ে ধরলেন।

"ব্যাপার শুনে মনে হ'চ্ছে আমরা যেন যুদ্ধযাত্রা করছি।"

"হ্যাঁ, করছিই তো"—সুরূপিণী বললেন।

"যুদ্ধ!"—উত্তেজিত বিস্মিত কণ্ঠে বললেন গন্ধরাজ—"কার সঙ্গে যুদ্ধ? গর্জনগাঁওয়ের শান্তি তো বহু শতাব্দী ধরে' অটুট আছে। কে আমাদের আক্রমণ করেছে, কে আমাদের অপমান করতে সাহস করলে?"

ইন্দীবর বললেন, "মহারাজ, এই দেখুন যুদ্ধঘোষণার চরমপত্র। এই চরমপত্রে যখন সকলের স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হচ্ছিল, তখনই সৌভাগ্যক্রমে আপনি এসে পড়লেন।"

গন্ধরাজ কাগজটা তাঁর সামনে টেবিলে রাখলেন। এবং আঙুল দিয়ে টেবিলে বাজনা বাজাতে বাজাতে পড়তে লাগলেন সেটা।

"আমাকে কিছু না জানিয়েই কি আপনারা এই চরমপত্রটা পাঠাবেন ঠিক করেছিলেন?"

রঘু বর্মন ব্যাপারটাকে ঈষৎ লঘু করবার প্রয়াস পেলেন।

"শ্রীযুক্ত ইন্দীবর ভারতী এর প্রতিবাদ করেছেন। সই করেন নি তিনি।"

"এ বিষয়ে যা কিছু চিঠিপত্র লেখালেখি হয়েছে সব আমাকে দিন।"

সম্পাদক মশাই সব তাঁকে দিয়ে দিলেন। তিনি তখনই নিবিষ্টচিত্তে আগাগোড়া পড়তে শুরু করে' দিলেন। ধৈর্যসহকারে অনেকক্ষণ পড়লেন। সদস্যরা বোকার মতো বসে' মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন কেবল। যে সম্পাদক তিনটি পাশের টেবিলে ছিলেন, মনে হ'ল তাঁদের একটু স্ফূর্তি হয়েছে। রাজপরিষদে

এ ধরনের গণ্ডগোল বিরল, কিন্তু যখন হয় তখন বেশ লাগে তাঁদের।

পড়া শেষ হ'লে গন্ধরাজ বললেন, "পড়ে' বড়ই দুঃখ পেলাম। ভৈরঙ্গীর 'উর্বরা' জনপদের উপর আপনারা যে দাবি জানিয়েছেন তা ভিত্তিহীন এবং অন্যায়। ন্যায়ের বিন্দুমাত্র সমর্থন নেই ওতে। এমন কি বৈঠকখানায় বসে' ও নিয়ে ঘোঁট করবার মতোও মালমসলা নেই ওতে। আর এই নিয়ে আপনারা যুদ্ধঘোষণা করতে চাইছেন? আশ্চর্য কাণ্ড!"

"ঠিকই বলেছেন মহারাজ"—কপিঞ্জল উত্তর দিলেন সঙ্গে সঙ্গে—অন্যায়কে ন্যায় বলে' প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা যে হাস্যকর তা বোঝবার মতো বুদ্ধি তাঁর আছে। বললেন, "ঠিকই বলেছেন মহারাজ। 'উর্বরা'র উপর আমাদের দাবিটা ছুতো মাত্র, ভান শুধু—"

"ও, তাই না কি! মহাধ্যক্ষ মশাই, আপনি কলমটা নিন, যা বলছি তা লিখুন। রাজপরিষদ"—তিনি বলতে শুরু করলেন, তারপর হঠাৎ থেমে সদস্যদের দিকে চেয়ে বললেন—"আমি যে মাঝে পড়ে' সব থামিয়ে দিলাম সে কথাটা অবশ্য আমি গোপনই রাখব"—তারপর সুরূপিণীকে সম্বোধন করে' বললেন—"আমার অগোচরে তোমরা যে এতবড় একটা কাণ্ড লুকিয়ে করতে যাচ্ছিলে, সে সম্বন্ধেও আমি নীরব থাকব! আমি যে ঠিক সময়ে এসে পড়তে পেরেছি, এতেই আমি খুশী। হ্যাঁ লিখুন—রাজপরিষদ সমস্ত ব্যাপারটি পুনরায় পর্যালোচনা করিয়া এবং ভৈরঙ্গী হইতে প্রাপ্ত শেষ চিঠিটি পাঠ করিয়া সানন্দে ঘোষণা করিতেছে যে তাঁহাদের সহিত ভৈরঙ্গীর মহামান্য রাজপরিষদে অভিব্যক্ত মতের বিন্দুমাত্র অনৈক্য নাই। তাঁহাদের অভিমত এবং সৌজন্যকে আমরা শ্রদ্ধা-সহকারে সানন্দে স্বীকার করিয়া লইলাম। লেখা হয়েছে? এইটেই একটু ভাল করে' গুছিয়ে লিখে ভৈরঙ্গীতে পাঠিয়ে দিন।"

"মহারাজ, এ বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে। যে সব চিঠিপত্র আপনি পড়লেন সে সবের নেপথ্যে যা আছে তা মহারাজ পুরোপুরি জানেন না। আপনি যদি এখন এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন তাহলে গুরুতর অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আপনার ওই চিঠি যদি পাঠানো হয় তাহলে ভৈরঙ্গীর সঙ্গে গর্জনগাঁওয়ের যে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে' উঠেছে তা বানচাল হ'য়ে যাবে।"

"গর্জনগাঁওয়ের কূটনৈতিক সম্পর্ক! মন্ত্রীমশায়, আপনি মাত্রাবোধ হারিয়ে ফেলেছেন মনে হ'চ্ছে। শরবতের পেয়ালায় কেউ কি ছিপ ফেলে বা জাল ফেলে মাছ ধরবার চেষ্টা করে?"

"মহারাজ যদি কিছু মনে না করেন তাহলে একটা কথা আমাকে বলতে অনুমতি দিন। শরবতের পেয়ালায় বিষ থাকতে পারে এ কথাটা মনে রাখা উচিত। আমরা রাজ্য বাড়াবার জন্যেই যে এ যুদ্ধ করতে যাচ্ছি তা নয়, আমাদের গৌরব বাড়াবার জন্যেও নয়। মহারাজ ঠিকই বলেছেন, ক্ষুদ্র গর্জনগাঁওয়ের পক্ষে ও সব দুরাকাঙ্ক্ষা শোভা পায় না। কিন্তু গর্জনগাঁওয়ের মধ্যেই নানা রকম দল হয়েছে, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং আরও নানারকম তন্ত্র মাথা চাড়া দিয়েছে, বড় দল ছোট দল নানা রকম দল গজিয়ে উঠেছে আপনার সিংহাসনের চারিপাশে।"

"সে কথা আমি শুনেছি, মন্ত্রীমশাই"—গন্ধরাজ বললেন—"কিন্তু আপনি যখন বলছেন তখন তার গুরুত্ব আছে এ কথা আমি অস্বীকার করব না।"

"আপনার একথা শুনে সম্মানিত হলাম মহারাজ"—কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হ'য়ে কপিঞ্জল বলে' চললেন—"এই সব কথা ভেবেই আমরা আমাদের পররাষ্ট্রনীতি ঠিক করেছি। গর্জনগাঁওয়ের লোকেদের মনটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া নিতান্ত দরকার, বেকারদের কাজ পাওয়া অত্যন্ত দরকার। আপনার শাসনকে জনপ্রিয় করতে হ'লে এসব প্রয়োজন। আরও প্রয়োজন খাজনা

কমিয়ে দেওয়া, একবারে যতটা বেশী সম্ভব কমিয়ে দেওয়া। এই যুদ্ধ—অবশ্য খুব বাড়িয়ে না বললে এটাকে যুদ্ধ বলা যায় না—এই যুদ্ধ কিন্তু এসব সমস্যার সমাধান করতে পারবে, রাজপরিষদের তাই মনে হয়েছিল। যুদ্ধের প্রস্তুতিই লোকের মনে একটা সাড়া জাগিয়েছে। এ যুদ্ধে আমাদের যদি জয় হয় তাহলে আমাদের আশা নিশ্চয়ই ফলবতী হবে এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। আশার অতিরিক্তও হয়তো হবে।"

"আপনি অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি, মন্ত্রীমশাই"—গন্ধরাজ বললেন—"আপনার কথা শুনে আমি মুগ্ধ হ'য়ে গেছি। এ যাবৎ আপনার সম্যক সমাদর আমি করি নি।"

একথা শুনে সুরূপিণীর চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। তিনি ভাবলেন বাজি মাৎ হ'য়ে গেছে। কপিঞ্জল কিন্তু অপেক্ষা করতে লাগলেন মনে মনে সশস্ত্র হ'য়ে। দুর্বল যখন বিদ্রোহ করে তখন সহজে তাকে নোয়ানো যায় না—এ জ্ঞান তাঁর ছিল।

গন্ধরাজ বললেন, "রাজ্যরক্ষার জন্য যে সৈন্যবাহিনীর তোড়জোড় আপনারা করেছিলেন আর যাতে আমাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে আপনারা মত করিয়েও নিয়েছিলেন—তারও গোপনে গোপনে এই উদ্দেশ্য ছিল না কি!"

"আমার বিশ্বাস তাতে সুফলই ফলেছে"—উত্তর দিলেন কপিঞ্জল—"কুচকাওয়াজ করা, ঘোড়ায় চড়ে' পাহারা দেওয়া—এসব জিনিস জনসাধারণকে ভুলিয়ে রাখে বই কি। কিন্তু একটা কথা আমি স্বীকার করব যখন রাজ্যরক্ষা সৈন্যবাহিনীর ব্যবস্থা হল, তখন কিন্তু আমি ভাবতে পারি নি যে রাজ্যের বিদ্রোহী দল এতদূর এগিয়ে গেছে। আর এ-ও আমাদের ধারণা ছিল না যে এই রাজ্যরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে গণতান্ত্রিক দলের বেশ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে।"

"আছে না কি?"—গন্ধরাজ প্রশ্ন করলেন—"আশ্চর্য! এ কথা কেন মনে হচ্ছে আপনার।"

"মনে হচ্ছে, কারণ নেতারা ঠিক করেছিলেন যে রাজ্যরক্ষা বাহিনীর সৈন্যরা জনসাধারণের মধ্যে থেকে নির্বাচিত হবেন। সুতরাং যদি সিংহাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণ বিদ্রোহ করে তাহলে এই সৈন্যবাহিনীর উপর আস্থা রাখা যাবে না। ওরা হয়তো বিশ্বাসঘাতকতা করবে।"

"ও"—গন্ধরাজ বললেন—"এইবার বুঝতে পারছি।"

"মহারাজ তাহলে বুঝতে পেরেছেন ?"—বিনয়ে বিগলিত হ'য়ে কপিঞ্জল বললেন—"কি বুঝেছেন তা কি খুলে বলবেন মহারাজ।"

"বিদ্রোহের ইতিহাস"—গন্ধরাজ নীরস কণ্ঠে উত্তর দিলেন, তারপর বললেন—"যাক্ আপনি এসব থেকে কি সিদ্ধান্তে এসেছেন ?"

"আমার সিদ্ধান্ত মহারাজ মোটেই জটিল নয়"—কপিঞ্জল খোঁচাটা হজম করে' অকম্পিত কণ্ঠে বললেন—"যুদ্ধ জনপ্রিয়, লোকে যুদ্ধ চায়। কাল যদি যুদ্ধের গুজবটার প্রতিবাদ হয় অনেকেই হতাশ হবে, আর এখন চারিদিকে যে রকম উত্তেজনা সামান্য ফুলকি পড়লেই দাবানল জ্বলে' উঠবে দাউ দাউ করে' চতুর্দিকে। বিপদ ওইখানেই। বিদ্রোহ তো আসন্ন, আমরা একটা আগ্নেয়গিরির শিখরে বসে' আছি, যে কোনও মুহূর্তে বিস্ফোরণ হ'তে পারে।"

"তাই যদি হয় তাহলে এখন আমাদের একত্রিত হ'য়ে সম্মানজনকভাবে বাঁচবার উপায় চিন্তা করতে হবে।"

ইন্দীবর ভারতী যখন যুদ্ধ-প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন তখন থেকে স্বরূপিণী মাত্র গুটি কয়েক কথা বলেছিলেন। আরক্তবদনে আনমিত নয়নে, মেঝের উপর মাঝে মাঝে অধীর ভাবে পা ঠুকে আত্মসংবরণ করে' বীরের মতো নীরবে বসেছিলেন তিনি। কিন্তু গন্ধরাজের এই কথায় হঠাৎ তিনি আত্মসংযম হারিয়ে ফেললেন।

"উপায়!—তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে' উঠলেন তিনি—"তোমার বোঝবার

অনেক আগেই তা আবিষ্কৃত হয়েছে। কাগজ তো তোমার সামনেই পড়ে' রয়েছে। অবিলম্বে সই করে' দাও, অযথা দেরি কোরো না।"

"মহারাণী" স্নিগ্ধ কিন্তু স্পষ্ট কণ্ঠে গন্ধরাজ বললেন—"আমি শুধু 'উপায়' বলি নি। সম্মানজনক উপায় বলেছি। আমার মতে এবং প্রধান মন্ত্রীর বিবরণ অনুসারে এক্ষেত্রে যুদ্ধ মোটেই বাঞ্ছনীয় সদুপায় নয়। আমরা যদি গর্জনগাঁওয়ের প্রজাদের সুশাসন করতে অসমর্থ হ'য়ে থাকি সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি ভৈরঙ্গীর লোকের রক্তপাত করে' করতে হবে? না, সুরূপিণী, আমার দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে তা হ'তে আমি দেব না। কিন্তু যে সব কথা আজ আমি প্রথম শুনলাম—কেন আজই প্রথম শুনলাম তার জবাবদিহি আমি চাইছি না কারো কাছে—কিন্তু যা শুনলাম তা আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—এ সমস্যার সমাধান আমাকে করতেই হবে যেমন করে' হোক।"

"কিন্তু যদি না পার?"

"না পারলে তার ফল আমি নিজেই ভোগ করব। বিদ্রোহের অঙ্কুর দেখা দিলেই আমি সমস্ত প্রজাদের আমন্ত্রণ করে' বলব, তোমরা যদি বল আমি এখনই সিংহাসন ত্যাগ করছি।"

রোষভরে হেসে উঠলেন সুরূপিণী—"এই লোকের জন্যে আমরা খেটে মরছি! রাজ্যে কি পরিবর্তন এসেছে তা আমরা বললাম, উনি বললেন আমি উপায় উদ্ভাবন করব। উপায়টা কি? সিংহাসন-ত্যাগ! যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তোমার রাজ্য চালাচ্ছে শেষ মুহূর্তে এসে তাদের সব কাজ পণ্ড করে' দিতে তোমার লজ্জা করে না? তুমি এতদিন কি করেছ তা কি তোমার মনে নেই? আমি একা এখানে থেকে তোমার মানমর্যাদা রক্ষা করবার চেষ্টা করেছি, ভালো ভালো বিজ্ঞ লোকেদের পরামর্শ নিয়েছি, তুমি তো কেবল শিকার করে' ফুর্তিতে দিন কাটিয়েছ। অনেক ভেবেচিন্তে,

অনেক দূরদর্শিতা সহকারে আমি এতদিন ধ'রে যে উপায় ঠিক করে রেখেছি, তুমি হঠাৎ একদিন সকালে এসে তা সব পণ্ড করে' দিয়ে বাহাদুরি দেখাচ্ছ”—হঠাৎ সুরূপিণীর বাক্‌রোধ হ'য়ে গেল ক্ষণকালের জন্য। সামলে নিয়ে আবার তিনি শুরু করলেন—“সব তছনচ করে' দিয়ে আবার তো তুমি তোমার খেয়াল-খুশির স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবেঃ আবার আমরা যখন খেটেখুটে ভেবেচিন্তে সব ঠিকঠাক করব, তখন ফের তুমি হঠাৎ এসে সব উলটে-পালটে দেবে। যা করবার তোমার বুদ্ধি নেই, যা জানবার জন্যে তুমি কোনও চেষ্টা কখনও কর নি তা ভেঙেচুরে দিতে এতটুকু সঙ্কোচ হয় না তোমার! এ আর সহ্য করা যায় না। আশ্চর্য, তোমার কি এতটুকু হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান নেই? যে সিংহাসনে বসবার তোমার একটুও যোগ্যতা নেই সেই সিংহাসনের সুযোগে তুমি যা-খুশি করবে? সিংহাসনে বসে' অমন সদম্ভে আদেশ জারি করতে তোমার লজ্জা করে না? তোমার জানা উচিত তোমার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ কেউ তোমার আদেশ পালন করে না। কি তুমি? এই রাজপরিষদে সত্যিই কি তোমার কোনও মর্যাদার আসন আছে। এখানে এসেছ কেন! তোমার ইয়ার-বকসিদের কাছে ফিরে যাও না তুমি। তুমি যে কত বড় মহারাজা তা আর কারও জানতে বাকি নেই, রাস্তার লোকেরা পর্যন্ত তা নিয়ে হাসাহাসি করছে—”

এই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে ভীত চকিত হয়ে গেলেন সকলে।

কপিঞ্জল সন্তর্পণে মৃদু কণ্ঠে বললেন—“মহারাণী আত্মসংবরণ করুন।”

“যা বলবার আমাকেই বলুন আপনি। মহারাণীর কানের কাছে ওসব ফুসফুস গুজগুজ আমি সহ্য করব না”—ধমকে উঠলেন গন্ধরাজ।

সুরূপিণী কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

“মহারাজ”—কপিঞ্জল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—“মহারাণীর—”

"আপনি যদি আর এ বিষয়ে একটি কথা উচ্চারণ করেন আপনাকে আমি বন্দী করব কপিঞ্জলদেব—"

"মহারাজই সর্বেসর্বা—"

অভিবাদন করে' সরে' দাঁড়ালেন কপিঞ্জল।

"এ কথাটা সর্বদাই মনে রাখবেন। মহাধ্যক্ষ মশাই, আপনি সব কাগজপত্র নিয়ে আমার ঘরে আসুন। আর আপনারা এখন যেতে পারেন, রাজপরিষদ আমি ভেঙে দিলাম।"

নমস্কার করে' গন্ধরাজ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর পিছু পিছু গেলেন কুজ্‌ঝটিকুমার আর সম্পাদক তিনজন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মহারাণীর সহচরীবৃন্দ এসে ঘরে ঢুকলেন মহারাণীকে সামলাবার জন্য।

বার

আধঘণ্টা পরে কপিঞ্জল পুনরায় দেখা করলেন সুরূপিণীর সঙ্গে।

"মহারাজ এখন কোথা"—প্রশ্ন করলেন সুরূপিণী।

"তিনি মহাধ্যক্ষের সঙ্গে রয়েছেন। আর তাজ্জব ব্যাপার, সত্যিই কাজ করছেন তিনি—"

"আমাকে যন্ত্রণা দেওয়াই ওঁর একমাত্র কাজ। উঃ কি পতন! কি লজ্জা! এমন তুচ্ছ কারণে আমাদের অত বড় পরিকল্পনাটা নষ্ট হ'য়ে গেল! এখন তো আর উপায় নেই।"

"উপায় আছে মহারাণী। হতাশ হবেন না। বরং এই ঘটনার পর আর একটা পথ আমরা দেখতে পেয়েছি। আপনি আত্মস্থ হয়েছেন, মহারাজের স্বরূপ স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছেন এবার। আপনার অতি-কোমল হৃদয়ের যে দুর্বলতা পরদার মতো এতদিন সত্যকে আবৃত করে' ছিল সেটা সরে' গেছে। রাজ্যের সব ব্যাপারেই এতদিন আপনি যে তীক্ষ্ণ বাস্তব-বুদ্ধির পরিচয় বরাবর দিয়ে এসেছেন এ ব্যাপারেও এবার আশা করি তার পরিচয় পাব আমরা। যতক্ষণ গর্জনগ্রামের মহারাজা হিসেবে তাঁর কর্তৃত্ব আস্ফালন করবার অধিকার ছিল ততক্ষণ সাম্রাজ্যের স্বপ্নটা স্বপ্নই ছিল আমার কাছে। অনেক ভেবেচিন্তেই আমি এ পরিকল্পনা করেছিলাম, এ রকম সংঘাত যে আসবে তা-ও আমি ভেবেছিলাম এবং তার জন্যে প্রস্তুতও আছি। আমি নির্ভর করে' আছি দুটি সত্যের উপর ঃ আমি জানি আপনিই মহারাণী, আদেশ করবার জন্মগত অধিকার একমাত্র আপনারই, আর আমি আপনার সেবক, আদেশ পালন করবার জন্মগত অধিকার আমার। অদ্ভুত যোগাযোগ ঘটেছে একটা—সক্ষম হাতের সঙ্গে শাণিত হাতিয়ারের আশ্চর্য সমন্বয় এটা! গোড়া থেকেই আমি জানতাম এবং এখনও আমি জানি যে উত্তরাধিকারের

ছাপ-মারা কোনও বাজে রাজার সাধ্য নেই যে এই অদ্ভুত যোগা-যোগকে বিচূর্ণ করে।”

“আপনি বলছেন, আদেশ করবার জন্মগত অধিকার আমার আছে! আমার চোখের জল কি দেখতে পান নি?”

“বীরাঙ্গনারাও মাঝে মাঝে চোখের জল ফেলে। আপনার চোখের জলে স্ফুলিঙ্গ দেখে শিউরে উঠেছি আমি। বুকটা কেঁপে উঠেছিল, আমার মতো লোকেরও আত্মবিস্মৃতি ঘটেছিল ক্ষণকালের জন্য। কিন্তু তার আগে যা ঘটেছিল, আপনি কি মনে করেন তা দেখেও কি আমি অভিভূত হই নি? আপনার ওই ওজস্বিনী ভর্ৎসনা, ওই আত্মসম্বৃত ভাষণ!—সত্যিই রাজকীয় মহিমায় উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছিলেন আপনি।”

কয়েক মুহূর্ত চুপ করলেন তিনি।

তারপর শুরু করলেন আবার—“হ্যাঁ দেখবার মতো দৃশ্য হয়েছিল একটা। আপনাকে দেখে আমি যেন আনন্দের মদিরা পান করছিলাম। নকল করতে চেষ্টা করছিলাম আপনার ওই শান্ত সৌম্য ভাব: অদ্ভুত প্রেরণা জাগছিল প্রাণে, যে কোনও লোকেরই জাগত: যে কোনও বুদ্ধিমান লোকই আপনার যুক্তি সমর্থন করত। কিন্তু মহারাণী, যা অনিবার্য তাই ঘটেছে, এর জন্যে দুঃখও নেই। আসুন খোলাখুলি সব আলোচনা করি এবার, আমাকে অন্ততঃ অকপটভাবে সব বলবার অনুমতি দিন। জীবনে দুটি জিনিসকে আমি ভালোবেসেছি—গর্জনগাঁওকে আর তার অধিশ্বরীকে”—এই বলে' তিনি সুরূপিণীর হস্ত চুম্বন করলেন—“হয় আমাকে মন্ত্রিত্ব বর্জন করতে হবে—যে দেশকে আমি স্বদেশ বলে' বরণ করেছি, যে মহারাণীকে সেবা করব বলে' স্বপ্ন দেখেছি তা ত্যাগ করে' চলে যেতে হবে—কিংবা—”

আবার থামলেন তিনি।

“হায় কপিঞ্জলদেব, এরপর আর তো 'কিংবা' নেই।”

"না, মহারাণী, সে কথা মানব না। আমাকে সময় দিন। আপনাকে প্রথম যখন আমি দেখেছিলাম তখন আপনার বয়স খুব কম ছিল। আপনার মধ্যে যে শক্তি প্রচ্ছন্ন আছে তা সকলের চোখে পড়ত না। কিন্তু মাত্র দুবার আপনার সঙ্গে আলাপ করবার সম্মান এবং সুযোগ পেয়ে আমি বুঝে নিলাম যে আমার সম্রাজ্ঞীকে আমি আবিষ্কার করেছি। আমারও কিছু প্রতিভা আছে উচ্চাকাঙ্ক্ষাও আছে। কিন্তু আমার প্রতিভাটা সেবকের প্রতিভা—আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেবার জন্যে আমি এমন একজনকে খুঁজছিলাম যিনি শাসন করতে পারেন, যিনি শক্তির উৎস। আমাদের দুজনের আশ্চর্য এই মিলনের এইটেই হ'ল মূল কথা। আমরা একজন আর একজনের পক্ষে অপরিহার্য। প্রভু ভৃত্যকে চিনেছে, যন্ত্রী চিনেছে যন্ত্রকে, আমাদের এ যোগাযোগ অদ্ভুত, আমরা দুজনে মিলে হয়েছি সম্পূর্ণ। লোকে বলে বিধির নির্বন্ধে বিবাহ হয়। কিন্তু এই যে বিশুদ্ধ বুদ্ধির মিলন—এই যে মানসিক অন্তরঙ্গতা যার জোরে আমরা সাম্রাজ্যের বনিয়াদ স্থাপন করব তাও কি তুচ্ছ করবার মতো? বিবাহ-বন্ধনের চেয়ে তা কি কম শিথিল? তাছাড়া আরও কথা আছে। আমাদের যখন পরিচয় হ'ল তখনই আমরা চিনতে পেরে-ছিলাম পরস্পরকে, বুঝতে পেরেছিলাম আমরা দুজনেই বৃহত্তর আকাশে ওড়বার জন্যে প্রস্তুত, আমাদের আলাপে আলোচনায় আমাদের সে আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়েছিল নানা বর্ণে নানা রূপে। দুটি বালক বালিকার মতো আমরা যেন এক সঙ্গে বেড়ে উঠেছিলাম—হ্যাঁ মহারাণী, মনের দিক থেকে বিচার করলে একথা একটুও অতিরঞ্জিত নয়। আপনার সঙ্গে যতদিন দেখা হয় নি ততদিন আমার জীবন অর্থহীন ছিল, অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম খালি। আপনারও কি তাই ছিল না মহারাণী? কিন্তু আমাদের দেখা হওয়ার পর আপনার দৃষ্টির পরিধি অনেক বেড়ে গেছে। মানসচক্ষে এখন আপনি আশা-রঞ্জিত সেই সম্বর্ধনাও দেখতে পেয়েছেন যার দিকে ধীরে ধীরে

এগুচ্ছি আমরা, যার জন্যে আমরা নিজেদের গড়েছি, নিজেদের প্রস্তুত করেছি।"

"ঠিক বলেছেন আপনি"—স্বরূপিণী বললেন—"আমিও তা অনুভব করছি। কিন্তু আপনার প্রতিভাই এসব সম্ভব করেছে, মহত্ত্বে আপনার অন্তর্দৃষ্টি আচ্ছন্ন বলে' সেটা বুঝতে পারছেন না। আমি কিই বা করেছি। আমি রাণী, সেই হিসেবে, সিংহাসনের সমর্থনটুকুই আমি আপনাকে দিতে পেরেছি, অকুণ্ঠভাবে দিয়েছি অবশ্য। আমি সানন্দে এবং সোৎসাহে আপনার সমস্ত চিন্তার অংশীদার হয়েছি। আপনি আমার উপর নির্ভর করতে পেরেছেন, নিশ্চিন্ত হ'তে পেরেছেন যে আমার দিক থেকে অন্যায় কিছু হবে না, কোন বাধাও আসবে না। বলুন, আবার বলুন আমি আপনাকে সত্যিই সাহায্য করতে পেরেছি। পেরেছি কি ?"

"না, মহারাণী, শুধু সাহায্য নয়, আপনি আমাকে নির্মাণ করেছেন। আপনিই আমার প্রেরণা। আমরা যখন রাজ্যবিষয়ে পরিকল্পনা রচনা করেছিলাম, তখন আমি প্রতিপদে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম আপনার মননশীলতা দেখে, আপনার তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পেয়ে, আপনার সহিষ্ণুতা ও পরিশ্রম করবার ক্ষমতা দেখে—যা অনেক পুরুষের চরিত্রেও দুর্লভ। আমি আপনাকে তোষামোদ করছি না মহারাণী, আপনি জানেন আমি যা বলছি তা সত্য। আপনি একদিনও কি বিশ্রাম করেছেন ? কোনও তুচ্ছ আমোদ-প্রমোদে কি কালহরণ করেছেন ? আপনি তরুণী, আপনি রূপসী, কিন্তু আপনার জীবন কেটেছে বুদ্ধির ক্ষেত্রে—হয় উচ্চতর বুদ্ধির চর্চায়, না হয় বিরক্তিকর বুদ্ধির দ্বন্দ্বে। এর পুরস্কার আপনি পাবেন। ভৈরঙ্গীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে আপনার সাম্রাজ্যের সিংহাসন স্থাপিত হবে।"

"তার মানে ? কি বলছেন আপনি"—প্রশ্ন করলেন স্বরূপিণী —"সব কি শেষ হ'য়ে যায় নি ?"

"না মহারাণী। আমরা দুজনে একই কথা ভাবছি।"

"কপিঞ্জলদেব, সত্যি আমি আর কিছু ভাবছি না। ভাবতে পারছি না। চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে গেছি আমি।"

"আপনি অভিমানে অভিভূত হয়েছেন মহারাণী। প্রকৃতি যাঁদের ভাবপ্রবণ কোমল হৃদয় দেন তাঁরা অপমানে বা অবজ্ঞায় সহজে কাতর হ'য়ে পড়েন। আপনি তাই হয়েছেন। আপনি বুদ্ধির আলোকে ব্যাপারটা দেখুন এবং বলুন কি দেখছেন।"

"আমি তো সর্বনাশ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।"

"আপনার মনে একটি কথা নিশ্চয়ই জ্বলজ্বল করে' জ্বলছে—"সিংহাসনত্যাগ'।"

"ও! ভীতু কাপুরুষটা আমার কাঁধে সমস্ত ভার চাপিয়ে মজা করে' বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিল আর যখন চরমক্ষণ এল তখন আমাকে পিছন থেকে ছোরা মেরে বসল। অপদার্থ! ওর মধ্যে কিছু নেই, ভদ্রতা, ভালবাসা, সাহস কিচ্ছু নেই। অনায়াসে তার স্ত্রীকে, তার মর্যাদাকে, তার সিংহাসনকে, তার পিতৃপুরুষের সম্মানকে ভুলে গেল।"

"হ্যাঁ, 'সিংহাসনত্যাগ'—ওই কথাটার মধ্যেই আমি যেন আশার আলোক দেখতে পাচ্ছি একটু।"

"আপনি কি ভাবছেন তা বুঝতে পারছি। কিন্তু যা ভাবছেন তা বাতুলতা, নিছক বাতুলতা। আমি মোটেই জনপ্রিয় নই, সবাই আমাকে গালাগালি দেয়। আপনি তা জানেন। প্রজারা ওঁর দুর্বলতাকে হয়তো ক্ষমা করতে পারে, হয়তো ভালওবাসতে পারে, কিন্তু আমাকে কখনও নয়। আমাকে ঘৃণা করে সবাই।"

"জনসাধারণের কৃতজ্ঞতার ওই তো রূপ মহারাণী। কিন্তু আমরা বাজে কথা বলে' সময় নষ্ট করছি। আমি যা ভাবছি তা পরিষ্কার করে' এইবার বলি। যে লোক বিপদের সময় সিংহাসন ত্যাগের কথা ভাবে, আমার মতে, সে তো বিষধর জন্তু।

আমার এ রূঢ়তা মাপ করবেন মহারাণী। এখন কথার লালিত্য নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নয়। ভীরু যদি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে তাহলে সে আগুনের চেয়েও ভয়ঙ্কর। আমরা আগ্নেয়গিরির উপর বসে' আছি। গন্ধরাজ যদি নিজের মতলবে চলেন তাহলে এক সপ্তাহ যেতে না যেতে গর্জনগাঁও নিরীহ লোকের রক্তে ভেসে যাবে। আপনি জানেন আমি যা বলছি তা মিথ্যা নয়, এই নিদারুণ সম্ভাবনার কথা আমরা দুজনেই ভেবেছি। ওঁর কাছে এটা কিছুই নয়, উনি সিংহাসন ত্যাগ করে' চলে যাবেন। হায় ভগবান, এই দুর্ভাগা দেশের ভার কি লোকের হাতেই দিয়েছ তুমি! এদেশের পুরুষের জীবন, নারীদের সম্ভ্রম···"

মনে হ'ল বলতে বলতে তাঁর বাকরোধ হ'য়ে গেল। কিন্তু পর-মুহূর্তেই তিনি সামলে নিলেন নিজেকে।

"কিন্তু মহারাণী আপনি তো অমন দায়িত্বজ্ঞানহীন নন, আমিও আপনার সঙ্গে আছি। এই আসন্ন বিপদের মুখে আমি বলছি, এবং আপনিও নিশ্চয় তার সমর্থন করবেন—এই আসন্ন বিপদের মুখে আমরা নীরব দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না, আমরা অনেক দূর এগিয়ে গেছি, এখন থামা অসম্ভব। সম্মান এবং কর্তব্যের আহ্বানে, আমাদের নিজেদের জীবনের নিরাপত্তার জন্যও আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।"

সুরূপিণী ভ্রূকুঞ্চিত করে' চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। তারপর বললেন, "আমিও সেটা অনুভব করছি। কিন্তু তা হবে কি করে'? ক্ষমতা তো ওর হাতে।"

"ক্ষমতা মহারাণী? ক্ষমতা সৈন্যদের হাতে" উত্তর দিলেন কপিঞ্জল এবং সুরূপিণী কোন কথা বলবার আগেই তাড়াতাড়ি বললেন—"আমাদের বাঁচতে হবে। আমাকে বাঁচাতে হবে আমার মহারাণীকে আর মহারাণীকে বাঁচাতে হবে তাঁর মন্ত্রীকে আর আমাদের সম্মিলিত চেষ্টায় বাঁচাতে হবে ওই বাতুল মহারাজাকে।

বিদ্রোহ শুরু হ'লে উনিই হবেন প্রথম বলি। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি জনতা তাঁর দেহটাকে টুকরো টুকরো করে' ছিঁড়ছে। গর্জনগাঁও, দুর্ভাগা গর্জনগাঁও—তার কি দশা হবে তারপর? না, মহারাণী, আপনাকে এগিয়ে আসতে হবে, আপনিই শক্তির প্রতীক, আপনার ক্ষমতা অসীম, সে ক্ষমতা আপনি ব্যবহার করুন। তা না হ'লে বিবেকের কাছে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে।"

"দেখিয়ে দিন কেমন করে' কি করব! ধরুন ওঁকে যদি কোনও রকমে আটকাই বিদ্রোহীরা তো সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আক্রমণ করবে।"

কপিঞ্জল ভান করলেন যেন এ কথাটা উনি ভাবেন নি।

"হ্যাঁ, তা সত্যি। আপনি যত পরিষ্কারভাবে দেখতে পান, আমি ততটা পাই না। কিন্তু তবু উপায় নিশ্চয় একটা আছে, সেটা বার করতেই হবে।"

উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা করে' রইলেন তিনি।

"না, গোড়াতেই তো বলেছি, আর কোন উপায় নেই। আমাদের সব আশা-আকাঙ্ক্ষার শেষ হ'য়ে গেছে—শেষ করে' দিয়েছে ওই হতভাগা খামখেয়ালী, চপল চঞ্চল যথেচ্ছাচারী লোকটা। কালই হয়তো সে আবার ফিরে যাবে তার চাষাড়ে হৈ-হল্লার মধ্যে—"

কপিঞ্জল দেখলেন ঝড়ের সময় যে কোনও বন্দরে আশ্রয় নেওয়াই সমীচীন। যেটা পাওয়া গেল সেটাও বা মন্দ কি!

"কি বোকা আমি, কথাটা এতক্ষণ আমার মনেই পড়ে নি। মহারাণী, আপনার অজ্ঞাতসারেই আপনি সমস্যার সমাধান করে' দিয়েছেন।"

"কি রকম? খুলে বলুন।"

নিজেকে একটু সামলে নিলেন কপিঞ্জল। তারপর একটু হেসে বললেন, "মহারাজাকে আর একবার শিকার করতে পাঠাতে হবে।"

"যায় তবে তো। গিয়ে যদি আর না ফেরে, সেখানেই যদি থেকে যায় তাহলে আরও ভালো হয়।"

"হ্যাঁ, থেকে গেলে খুব ভালো হয়।"

কপিঞ্জল এমনভাবে চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলো বললেন যে সুরূপিণীর কানে বেসুরো ঠেকল তা। তাঁর মুখের চেহারা বদলে গেল হঠাৎ। কপিঞ্জল লক্ষ্য করলেন সেটা এবং তাড়াতাড়ি বললেন, "না, আশঙ্কার কিছু নেই। এবার উনি গাড়ি করে' আমাদের বিদেশী রক্ষী পরিবৃত হ'য়ে শিকারে যাবেন। থাকবেন গিয়ে শূলপাণিতে। জায়গাটা স্বাস্থ্যকর, পাহাড়টাও বেশ উঁচু, শূলপাণির জানলাগুলো ছোট ছোট, লোহার গরাদ-দেওয়া। বোধহয় এই উদ্দেশ্যেই কেউ কোন সময়ে তৈরি করেছিল ওটা। আমরা অঙ্গ-প্রদেশের সেনাপতিকে ওঁর সঙ্গে পাঠাব। লোকটা গোঁয়ার গোছের। কোনও ভাঁওতায় ভুলবে না। মহারাজ যে এখানে নেই তা কে ধরতে পারবে? সবাই ভাববে তিনি শিকারে গেছেন। বুধবারে একদিনের জন্য ফিরে এসেছিলেন, বৃহস্পতিবারে আবার চলে' গেছেন। এ রকম তো প্রায়ই যান, বুঝতে পারবে না কেউ। ইতিমধ্যে আমরা যুদ্ধটা আরম্ভ করে' দি। নির্জনবাস অবশ্য মহা-রাজের বেশী দিন ভালো লাগবে না। তারপর আমাদের জয় যখন আসন্ন হ'য়ে আসবে, কিংবা তখনও উনি যদি বেঁকে থাকেন, তাহলে তারও কিছু দিন পরে বিশেষ একটা শর্ত করে' ওঁকে আমরা মুক্তি দেব। ফিরে এসে উনি আবার অভিনয়-টভিনয় নিয়ে মেতে যাবেন—এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—"

সুরূপিণী গুম হ'য়ে বসে' রইলেন। মনে হ'ল ভাবছেন। তার পর হঠাৎ বললেন, "তা না হয় হ'ল। কিন্তু ভৈরঙ্গীর রাজদরবারে যে বন্ধুত্বসূচক প্রস্তাবটা পাঠানো হ'চ্ছে তার কি হবে?"

"সে প্রস্তাব রাজ্যপরিষদ থেকে শুক্রবারের আগে বেরুবে না। মহারাজ অবশ্য ব্যক্তিগত চিঠি লিখতে পারেন, কিন্তু রাজকর্মচারীরা

এমন কি দূতেরাও সবাই আমারই তাঁবে। ওরা আমার বাছাই করা লোক মহারাণী। আটঘাট বেঁধে কাজ করাই আমার নিয়ম।"

"হ্যাঁ, তাইতো মনে হচ্ছে"—লোকটার উপর ক্ষণিকের জন্য একটা বিতৃষ্ণা জাগল, মাঝে মাঝে যেমন জাগে,—চুপ করে' রইলেন একটু, তারপর বললেন, "কপিঞ্জলদেব, আমি অতটা করতে, মানে অতটা চরমে যেতে চাই না। এ আমার ভালো লাগছে না।"

"আমারও লাগছে না। মহারাণীর অনিচ্ছার হেতু কি তা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু উপায় কি বলুন? ও পথ ছাড়লে আমরা যে অসহায় একেবারে।"

"তা বুঝতে পারছি, কিন্তু এটা বড়ই আকস্মিক হবে না? তাছাড়া এটা যে মহা অপরাধ, রাষ্ট্রীয় আইনভঙ্গ—"

"ভাল করে' তলিয়ে দেখুন একটু। অপরাধটা আসলে কার?"

"ওরই অপরাধ"—উত্তেজিত কণ্ঠে বলে' উঠলেন সুরূপিণী—"ভগবানের কাছে ও-ই অপরাধী। এ সবের জন্যে ওকেই আমি দায়ী করছি। কিন্তু তবু—"

"ওঁর তো কোনও অনিষ্ট করতে চাইছি না আমরা।"

"তা জানি।"

সুরূপিণীর কণ্ঠস্বরে কিন্তু আন্তরিকতার সুর বাজল না।

তারপর ইতিহাসের চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে সাহসী বীরেরা চিরকাল যেমন সৌভাগ্যলক্ষ্মীর আনুকূল্য ও সাহায্য পেয়েছেন এ ক্ষেত্রেও তেমনি হ'ল। ঠিক সময়ে তিনি রথ থেকে নেমে এলেন। মহারাণীর একজন সহচরী খবর পাঠালেন যে জরুরী দরকারে তিনি একবার ভিতরে আসতে চান। একটি লোক প্রধানমন্ত্রীর জন্য না কি একটি চিঠি এনেছে। দেখা গেল পেন্সিলে লেখা এক লাইন চিঠি, চতুর কুজ্‌ঝটিকুমার গন্ধরাজের তীক্ষ্ণদৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে কোন-ক্রমে লিখে পাঠিয়েছেন চিঠিটি। কুজ্‌ঝটিকুমার মহাভীতু লোক,

ভয়ই তাঁকে উঠ-বোস করায়। তিনি যে এতটা সাহস করতে পেরেছেন এটা সত্যিই আশ্চর্য ব্যাপার। চিঠিতে কেবল একটি মাত্র খবর সংক্ষেপে লেখা ছিল—"এর পর থেকে মহারাজ নিজেই সব কাগজে সই করবেন। মহারাণীর সই আর চলবে না।"

গত তিন বছর ধরে' সুরূপিণীই মহারাজের হয়ে সমস্ত কাগজ-পত্রে সই করেছেন। আজ থেকে তাঁর সে অধিকার কেড়ে নেওয়া হ'ল? এর পর কোনও সরকারী কাগজে আর তাঁর স্বাক্ষর থাকবে না? এটা সামান্য অপমান নয়,—তাঁর মনে হ'ল এটা জনসাধারণের চক্ষে তাঁকে হীন প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা। তিনি একবারও ভাবলেন না কেন এটা করা হ'ল, গুলি খেয়ে আহত বাঘ যেমন সগর্জনে লাফিয়ে ওঠে তিনিও তেমনি উঠলেন।

"যথেষ্ট হয়েছে। আমি আদেশপত্রে সই করে' দেব। কখন ওকে নিয়ে যাওয়া হবে?"

"আমার নিজের লোকজন সংগ্রহ করতে প্রায় বারো ঘণ্টা লাগবে। আর এসব জিনিস রাত্রে করাই ভালো। যদি অনুমতি দেন—কাল রাত্রি দ্বিপ্রহরে ব্যবস্থা করি—"

"ঠিক আছে। আমার ঘরের দ্বার তো আপনার জন্য সর্বদাই উন্মুক্ত। আদেশপত্র প্রস্তুত হলেই নিয়ে আসবেন, আমি সই করে' দেব।"

"মহারাণী যদি অভয় দেন তাহলে একটা কথা নিবেদন করি। এ ব্যাপারে একমাত্র আপনারই প্রাণদণ্ডের কোনও আশঙ্কা নেই। যদি ধরা পড়ি আমাদের সবারই সে আশঙ্কা আছে। এই জন্যে আমি প্রস্তাব করছি যে কেবলমাত্র সই না করে' সমস্ত আদেশপত্রটা আপনি নিজের হাতে লিখে ফেলুন।"

"ঠিক বলেছেন আপনি। বেশ তাই হবে—"

কপিঞ্জল তাঁর হাতে সরকারী ছাপ-মারা একটি শাদা কাগজ দিলেন। সুরূপিণী অবিলম্বে গোটা গোটা পরিষ্কার অক্ষরে লিখে

ফেললেন আদেশটা। লিখে আবার পড়লেন। সহসা একটা কুটিল হাসি ফুটে উঠল তাঁর চোখে মুখে।

"ওঁর কাকাতুয়াটির কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। ইন্দীবর ভারতীও ওঁর সহযাত্রী হোন। দুজনে গল্পসল্প করে' ভালই থাকবেন।"

ইন্দীবর ভারতীকেও নির্বাসনের দণ্ড দিলেন তিনি এবং এ আদেশটার তলায় দাগ দিয়ে আবার সই করলেন।

"আপনার সেবকের চেয়ে আপনার স্মৃতিশক্তি আরও প্রখর দেখছি মহারাণী" এই বলে' কপিঞ্জল মনোযোগ সহকারে সাংঘাতিক আদেশপত্রটি পড়লেন।

"ঠিক হয়েছে।"

"আপনি কি বৈঠকখানায় বসবেন এখন?"

"না। বেশী জানাজানি হোক এটা আমি চাই না এখন। আমার উপর লোকে যদি আস্থা হারিয়ে ফেলে তাহলে ভবিষ্যতের পক্ষে ভালো হবে না সেটা।"

"তা ঠিক।"

মহারাণী তাঁর দিকে এমনভাবে হাত বাড়িয়ে বিদায় দিলেন যেন তিনি একজন সমপর্যায়ের পুরাতন বন্ধু।

বস্তুতঃ, তীর নিক্ষিপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল। রাজ্যপরিষদে সাধারণতঃ যা হয় তাই যদি হ'ত তাহলে গন্ধরাজের তেজ বা রাগ এতক্ষণ স্থায়ী হ'ত না। তিনি নিজেরই দোষ ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন হতেন সর্বাগ্রে, নিজের সম্বন্ধে যা সত্য তাই নিক্তি ধরে' বিচার করতেন, ভুলে যেতেন সুরূপিণীর সদম্ভ উক্তি ও আচরণ এবং আধ ঘণ্টার মধ্যেই অনুতপ্ত পাপী যেমন ঠাকুর ঘরে ঢুকে দেবতার কাছে আত্মনিবেদন করেন, অথবা পাঁড় মাতাল যেমন শেষকালে বোতলের আশ্রয় নেন —তিনিও তাই করে' ফেলতেন। কিন্তু দুটি কারণে তাঁর জেদ চড়ে' গেল। প্রথম, তিনি অনুভব করলেন অনেক কাজ বাকি পড়ে' আছে, অনেকদিন ধরে' অনেক দরকারী কাজ তিনি করেন নি। গন্ধরাজের মতো অমনোযোগী দীর্ঘসূত্রী লোক যখন কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হন তখন একমাত্র কাজ করেই তিনি নিজের বিবেককে শান্ত রাখতে পারেন। সমস্ত বিকেলটা তিনি মহাধ্যক্ষ কুজ্‌ঝটিকুমারের সঙ্গে কাজ করলেন। অনেক দলিল পড়লেন, অনেক শ্রুতিলিখন লেখালেন, অনেক কাগজে সই করলেন এবং অনেক আদেশ জারি করলেন। একটা অদ্ভুত আত্মপ্রসাদের দীপ্তি ফুটে উঠল তাঁর চোখে মুখে। দ্বিতীয় কারণ, তাঁর আত্মসম্মান আহত হ'য়েছিল। যে টাকাটা তিনি চেয়েছিলেন তা পান নি। কাল সকালে কীর্তিভূষণ হতাশ হবে, যে টাকাটা তাকে দেবার কথা ছিল তা দিতে পারবেন না। ওই পরিবারটি তাঁকে খুব সুনজরে দেখে নি, তাদের কাছে ত্রাণকর্তা বীরের ভূমিকায় অভিনয় করে' তিনি যে খাতিরটুকু পাবেন আশা করে-ছিলেন, তা আর পাওয়া যাবে না। তারা এখন তাঁকে মিথ্যাবাদী ছোটলোক ভাববে। গন্ধরাজের মতো লোকের কাছে এটা মৃত্যুর চেয়েও নিদারুণ। এর সঙ্গে কিছুতেই তিনি নিজেকে খাপ খাইয়ে

নিতে পারছিলেন না। কাজ করতে করতে—রাজ্যের খুঁটিনাটি বিরক্তিকর কাজকর্ম তিনি বেশ ভালো ভাবেই করে' যাচ্ছিলেন—কিন্তু কাজ করতে করতে তিনি ভাবছিলেন কি করে' এই অবাঞ্ছিত পাশাটা উল্টে দেওয়া যায়। যে মতলবটা তাঁর মাথায় এসেছিল সেটা মানুষ গন্ধরাজের পক্ষে খুবই আনন্দজনক হলেও মহারাজ গন্ধরাজের পক্ষে অসম্মানজনক। কিন্তু তরল স্বভাবের লোক তিনি, তাঁর মনে হচ্ছিল এই যে বাজে ব্যাপারে খেটে মরছি, ওই মতলবটা হাসিল করতে পারলে তার মজুরি উসুল হ'য়ে যাবে। ভাবতে ভাবতে মনে মনে হাসছিলেন তিনি। চাপা হাসির মৃদু উচ্ছ্বাস মাঝে মাঝে প্রকাশও হ'য়ে পড়ছিল। কুজ্‌ঝটিকুমার তা দেখে বিস্মিত হচ্ছিলেন মনে মনে, তাঁর মনে হচ্ছিল সকালে রাজ্যপরিষদে যা ঘটেছে তারই স্মৃতি বোধহয় পুলকিত করছে মহারাজকে।

এই ভেবে, তাঁর একটু মিহি খোশামোদ করবার প্রবৃত্তি জাগল। তিনি মৃদুকণ্ঠে বললেন যে গন্ধরাজের বাবার কথা তাঁর মনে পড়ছে।

"কি বলছেন?"

গন্ধরাজ প্রশ্ন করলেন। তিনি তখন একেবারে অন্য চিন্তায় মগ্ন ছিলেন।

"রাজ্যপরিষদে মহারাজের প্রতাপের কথা ভাবছিলাম।"

"তাই না কি! ও হ্যাঁ"—অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিলেন গন্ধরাজ।

কিন্তু এ শুনে তাঁর অহমিকা ঈষৎ স্ফীত হ'ল, সকালে রাজ্য-পরিষদের ঘটনাগুলো মানস-চক্ষে ভেসে উঠল। মনে মনে হেসে ভাবলেন—"সবাইকে ঠাণ্ডা করে' দিয়েছি—"

যখন সব দরকারী কাজ শেষ হ'য়ে গেল তখন বেলা গড়িয়ে গেছে। গন্ধরাজ কুজ্‌ঝটিকুমারকে তবু আটকে রাখলেন। বললেন, "আপনি এখানেই আমার সঙ্গে খান।" প্রাচীন স্থূল মোসাহেবির সঙ্গে আধুনিক সূক্ষ্ম খোশামোদের সমন্বয় করে' কুজ্‌ঝটিকুমার

খাওয়ার টেবিলে প্রচুর আনন্দ দান করলেন গন্ধরাজকে। হীন আনুগত্যের উপরই কুজ্‌ঝটিকুমারের জীবনের উন্নতি প্রতিষ্ঠিত। তিনি যা কিছু সম্মান বা চাকুরি পেয়েছেন তা হামাগুড়ি দিয়ে পেতে হয়েছে তাঁকে। তাঁর প্রবৃত্তিকে বেশ্যার সঙ্গে উপমিত করলে অত্যুক্তি হবে না। খোশামোদ করবার একটা সহজাত নিপুণতাও ছিল তাঁর। আর গন্ধরাজের খুব ভালো লাগছিল সেটা। প্রথমে নারীজাতির বুদ্ধি সম্বন্ধে তিনি দু'একটা ব্যঙ্গোক্তি করে' টোপ ফেললেন। তারপর আর একটু ঘনিষ্ঠ আলোচনা করলেন এ বিষয়ে এবং আহারের তৃতীয় পর্বের পূর্বেই দেখা গেল তিনি সুরূপিণীর চরিত্র কৌশলে বিশ্লেষণ করতে শুরু করেছেন এবং গন্ধরাজ ঘাড় নেড়ে নেড়ে স্মিত মুখে শুনছেন তা। কারও নাম অবশ্য উচ্চারিত হচ্ছিল না তবু সুরূপিণীর সঙ্গে তিনি যে আদর্শ চরিত্র পুরুষটির তুলনামূলক সমালোচনা করছিলেন সে ব্যক্তিটি যে কে তা বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। এই বেতো বুড়োটিকে ভগবান অদ্ভুত শয়তানী বুদ্ধি দিয়েছিলেন। কেবল বাক্যবলেই মানুষের হৃদয়দুর্গ অধিকার করতে পারতেন তিনি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শ্রোতার কানের কাছে তাঁর প্রশস্তি-পাঠ করে' যাবার ক্ষমতা ছিল ভদ্রলোকের। অথচ এমন কায়দা করে' সেটা করতেন যে শ্রোতার আত্মসম্মান বিচলিত হ'ত না একটুও। গন্ধরাজের মন তো গোলাপী হ'য়ে উঠল, স্তাবকের স্তুতির সঙ্গে যদি নিজের বিবেকের সায় থাকে তাহলে আত্মপ্রসাদের আনন্দ উপচে পড়ে একেবারে। নিজের ব্যক্তিত্বকে এমন বিচিত্রবর্ণমণ্ডিত দেখে খুবই পুলকিত হ'য়ে উঠলেন গন্ধরাজ। তাঁর মনে হ'ল কুজ্‌ঝটিকুমারের মতো লোকও সুরূপিণীর চরিত্রে যদি এত গলদ দেখতে পেয়ে থাকে এবং তিনি বিরুদ্ধ পক্ষের লোক জেনেও যদি সেটা তাঁর কানে তুলে দিতে ইতস্ততঃ না করে—তাহলে অবহেলিত স্বামী এবং অপদস্থ মহারাজা হিসেবে তিনি যে আচরণ করেছেন তা মোটেই কঠোর নয়।

প্রসন্ন মনে বিদায় দিলেন তিনি কুজ্‌ঝটিকুমারকে। তাঁর স্তুতি-বাক্যগুলো গানের মতো বাজতে লাগল কানে। এরপর তিনি অগ্রসর হলেন বৈঠকখানার দিকে। সেখানে সুরূপিণী তো আছেই, আরও অনেকে আছে। এ সময় বৈঠকখানা জমজমাট হ'য়ে ওঠে। সিঁড়িতে উঠতে উঠতেই কিন্তু অনুতাপ হ'তে লাগল তাঁর। বৈঠক-খানার প্রকাণ্ড দালানে ঢুকেই দেখতে পেলেন তিনি সুরূপিণীকে। সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল তাঁর মন। কুজ্‌ঝটিকুমার তাঁর মনে তোষা-মোদ দিয়ে যে অলীক স্বপ্ন সৃষ্টি করেছিল তা স্বপ্নের মতোই মিলিয়ে গেল। বাস্তব জীবনের কাব্যের রং রাঙিয়ে দিল মনকে। বেশ কিছু দূরে একটা উজ্জ্বল আলোর নীচে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন সুরূপিণী। তাঁর কোমরের অপরূপ বঙ্কিম ভঙ্গী অভিভূত করে' ফেলল গন্ধরাজকে। ওই বালিকাবধূকে একদিন তিনি এনে বাহু-পাশে জড়িয়ে কত আদর করেছেন, শপথ করেছেন ওকে রক্ষা করবেন। ওই তো সে, জীবনের কোনও সৌভাগ্যের সঙ্গে কি ওর তুলনা হয়?

মোহ্যমান হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণকাল। সুরূপিণীই তাঁকে আত্মস্থ করলেন এসে। তিনি যেন সাঁতার দিতে দিতে এলেন এবং হেসে আধ-আধ অস্ফুট কণ্ঠে বললেন—"গন্ধ, আসতে তোমার বড্ড দেরি হ'য়ে গেল যে—"। হাসিটা বড়ই কৃত্রিম ঠেকল গন্ধরাজের চোখে। মনে হ'ল এটা যেন মিলনাত্মক কোন নাটকের দৃশ্য। অসুখী দাম্পত্যজীবনে এ রকম অভিনয় স্বাভাবিক। সুরূপিণীর নির্লজ্জ ন্যাকামিটা অসহ্য মনে হ'ল তাঁর।

বৈঠকখানায় কোনও কড়াকড়ি রীতি-নীতি নেই। যে যা খুশি করছে, ঢুকছে, বেরুচ্ছে। আড়ষ্টতা নেই কোনও। জানলার কাছে কাছে যে সব বসবার জায়গা আছে, পাখির মতো অনেকে বসে' আছে সেখানে জোড়ায় জোড়ায়। ওদিকের কোণটাতে বেশ একটি বড় দল মহানন্দে মশগুল হ'য়ে গেছে পরনিন্দা পরচর্চায়।

আর একটু দূরে একটা টেবিলে জুয়া চলছে তাস নিয়ে। খুব একটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে' নয়, তবে এই দিকেই ধীরে ধীরে এগুলেন গন্ধ-রাজ নমস্কার বিনিময় করতে করতে। রঞ্জাবতী যেখানে খেলছিলেন তারই সামনাসামনি গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। রঞ্জাবতীর সঙ্গে চোখো-চোখি হ'তেই কাছেই জানলার ধারে দেওয়ালে যে ফাঁকটি ছিল সেখানে গিয়ে বসলেন তিনি। রঞ্জাবতীও হাজির হলেন সেখানে অবিলম্বে।

"ডেকে এনে বাঁচালেন আমাকে। ভূতের মতো হারছি। জুয়াই আমার সর্বনাশ করবে।"

"ছেড়ে দাও না ওসব !"

"ছেড়ে দেব !"—বলেই হেসে উঠলেন রঞ্জাবতী—"কি নিয়ে থাকব তাহলে। ওই তো আমার নিয়তি। যক্ষ্মায় যদি মারা যেতাম তাহলে বেঁচে যেতাম। ওই একমাত্র আশা ছিল। কিন্তু তা যখন হ'ল না তখন কোন চিলে-কোঠার ঘরে মরতে হবে।"

"মনে হ'চ্ছে মেজাজটা ভালো নেই।"

"ক্রমাগত হারছি আজ। লোভ যে কি বস্তু তা আপনি জানেন না।"

"দেখছি, খুব খারাপ সময়ে এসে পড়েছি তাহলে—"

"কেন কিছু করতে হবে ?"—এক ঝলক হাসি ফুটে উঠল মুখে।

"রঞ্জাবতী আমি একটা দল গড়ব ভাবছি, সে দলে তোমাকে টানতে চাই।"

"রাজী" হেসে উত্তর দিলেন রঞ্জাবতী—"আমাকে পুরুষ বলে' মনে করতে পারেন।"

"হয়তো এটা আমার ভুল। কিন্তু কেন জানি না আমি সত্যিই বিশ্বাস করি তুমি আমার অশুভাকাঙ্ক্ষিণী নও।"

"আমি আপনার এত শুভাকাঙ্ক্ষিণী যে তা বলবার সাহস আমার নেই।"

"তাহলে বলব কথাটা ?"

"বলুন মহারাজ। আপনি যা করতে বলবেন তা নিশ্চয়ই করব।"

"সেদিন যে গৃহস্থটির গল্প করেছিলাম, আমি চাই তাকে তুমি প্রতিষ্ঠিত কর। বাঁচাও।"

"কোন গৃহস্থ ? কিছুই তো বুঝতে পারছি না। যাক্ বুঝতে চাই না। আমি আপনাকে খুশী করতে চাই। ধরে' নিন তাকে প্রতিষ্ঠিত করে' দেব। বাঁচাব।"

"এইবার তাহলে অন্য দিক থেকে ব্যাপারটা বলি। তুমি কখনও চুরি করেছ ?"

"অনেকবার। শাস্ত্রের সমস্ত উপদেশ আমি লঙ্ঘন করেছি, ফের নূতন শাস্ত্র যদি তৈরী হয় সে সবের উপদেশও লঙ্ঘন না করা পর্যন্ত ঘুম হবে না আমার। কি করতে হবে ?"

"তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে চুরি করতে হবে। তোমাকে এ কাজ করতে বলছি কারণ আমার মনে হ'ল তুমি দুঃসাহসিনী, এতে আমোদ পাবে হয়তো। আমিও তোমার সহকারী হব।"

"ও কাজ করি নি কিন্তু। তালাটালা ভাঙ্গি নি কখনও। ছেলেবেলায় একটা সেলাইয়ের বাক্স ভেঙে ফেলেছিলাম, অবশ্য মন ভেঙেছি অনেকের এমন কি নিজেরও। ঘরের তালা ভাঙ্গি নি। কিন্তু তাতে কি। ভাঙব তালা, দুষ্কর্ম করা কি আর এমন শক্ত! কোথাকার তালা ভাঙতে হবে।"

"আমার কোষাগারের।"—বলে' গন্ধরাজ মৃদু হাসলেন। তারপর সংক্ষেপে, হাসতে হাসতে এবং মাঝে মাঝে করুণরসের ছিটে-ফোঁটা দিয়ে কীর্তিভূষণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ এবং জমি কেনার প্রতিশ্রুতির কথা বর্ণনা করে' গেলেন। তারপর বললেন—"আজ সকালে রাজসভায় কোষাধ্যক্ষের কাছে টাকাটা চাইলাম, কিন্তু ওঁরা দিলেন না আমাকে টাকাটা। তাই ঠিক করেছি নিজেই নিজের

কোষাগার থেকে চুরি করব।” গন্ধরাজ কোষাগারের জানলা দরজা কোথায় আছে এবং কিভাবে সেখানে ঢোকা সম্ভব, কি বিপদ হ'তে পারে এইসব বললেন তারপর।

“রাজসভায় আপনাকে টাকাটা দিলে না। আর আপনি সেটা মেনে নিলেন। অবাক্ কাণ্ড!”

গন্ধরাজের কানের ডগাটা লাল হ'য়ে উঠল একটু।

“ওঁরা কারণ দেখালেন নানারকম, আমার মনে হ'ল ওইসব ওজনদার কারণ উলটে দেবার ক্ষমতা আমার নেই। তাই ঠিক করেছি আমার রাজ্যের কোষাগার থেকে আমিই চুরি করব। এতে মর্যাদা নেই কিন্তু মজা আছে।”

“মজা? ও—”

রঞ্জাবতী চুপ করে' রইলেন খানিকক্ষণ। ভাবলেন কি যেন।

“কত টাকা আপনার দরকার?”

“দশ হাজার হলেই চলবে। আমার নিজের কাছেও কিছু আছে।”

“দশ হাজার? বেশ”—হালকা মিষ্টি হাসি আবার ফুটে উঠল তাঁর চোখে মুখে—“বেশ, আমি আপনার সঙ্গে যাব। কোথায় তাহলে আবার আমাদের দেখা হচ্ছে? কোন জায়গা থেকে যাত্রা করব?”

“আমার বাগানে যেখানে একটা উড়ন্ত পরীর মর্মরমূর্তি আছে সে জায়গাটা চেন? তিনটি রাস্তা এসে মিলেছে সেখানে। একটি বসবার জায়গাও আছে সেখানে। স্থানটি নির্জন এবং পরী আছে বলে' মনোরম।”

“কি ছেলেমানুষ আপনি”—লীলাভরে পাখা দিয়ে সামান্য ঠোকা দিয়ে বললেন—“কিন্তু আপনি যে জায়গাটার কথা বললেন তা আপনার পক্ষে সুবিধাজনক। কিন্তু আমি কি সেখানে সহজে পৌঁছতে পারব? আমার অনেক দেরি হবে। প্রচুর সময় না

দিলে যাওয়া যাবে না ওখানে। ছুটোর আগে যাওয়া অসম্ভব। কিন্তু ছুটোর ঘণ্টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার সহকর্মিণী নির্ঘাৎ হাজির হবে আপনার কাছে—। আশা করি আপনি এতে আপত্তি করবেন না। হ্যাঁ, ভালো কথা, আর কেউ কি থাকবে সেখানে? না, লোক-লজ্জার জন্মে বলছি না আমি, অত লজ্জাশীলা নই।"

"আমার একজন সহিস থাকবে। আমার ঘোড়ার দানা চুরি করত তাকে ধরে' ফেলেছিলাম একবার। সেই থেকে—"

"তার নাম কি?"

"নাম তো জানি না। দানা-চোরের সঙ্গে পরিচয় তেমন ঘনিষ্ঠ হয় নি। সম-ব্যবসায়ী হিসাবে মাত্র—"

"আমার সঙ্গে যেমন হয়েছে! উঃ কি লোক আপনি! যাক, একটি কাজ কিন্তু করবেন। পরীর কাছে যে বেঞ্চটি আছে সেখানে যেন আমি আপনাকে দেখতে পাই, সেখানে বসে' আপনি আমার অপেক্ষা করবেন। যেমন ভাবে অপেক্ষা করে—"

বলেই মুচকি হাসলেন রঞ্জাবতী।

"আর আপনার ওই চোর-বন্ধুটি যেন কাছাকাছি না থাকে। দূরে যে ফোয়ারাটা আছে সেখানেই তাকে থাকতে বলবেন। এ ব্যবস্থায় রাজী তো?"

"রঞ্জাবতী, আজ তুমিই হুকুম দেবে আমি তা পালন করব। এ অভিযানে তুমিই নেত্রী, আমি আজ্ঞাবহ কর্মচারী মাত্র।"

"অভিযান সফল হবে আশা করি। আজ শুক্রবার নয়—"

রঞ্জাবতীর হাবভাব একটু যেন রহস্যময় মনে হ'ল গন্ধরাজের। সন্দেহও হ'ল একটু।

"আমি আমার বিপক্ষ দল থেকে সহকারী যোগাড় করলাম এটা একটু অদ্ভুত মনে হ'চ্ছে না?"

"অদ্ভুত আবার কি! আপনার প্রধান গুণ কি জানেন? আপনি আপনার বন্ধুদের চেনেন।"

হঠাৎ এক কাণ্ড করে' বসলেন রঞ্জাবতী। গন্ধরাজের হাতটা তুলে আবেগভরে চুম্বন এঁকে দিলেন তাতে!

"এবার যান। আর দেরি করবেন না।"

ঈষৎ বিহ্বল হ'য়ে সরে' গেলেন গন্ধরাজ। তাঁর মনে হ'তে লাগল একটু বাড়াবাড়ি হ'য়ে গেল বোধহয়। রঞ্জাবতী হঠাৎ যেন রত্নের মতো চকমক করে' উঠল। তাঁর পূর্ব-প্রণয়ের বর্ম ভেদ করেও যেন ধাক্কা লাগল একটা। ভয় হ'ল একটু। কিন্তু বেশীক্ষণ সে ভয় রইল না।

সকাল সকালই গন্ধরাজ এবং রঞ্জাবতী বেরিয়ে এলেন বৈঠকখানা থেকে। একটা ছুতো করে' গন্ধরাজ তাঁর দেহরক্ষীকেও বিদায় করে' দিলেন। তারপর গোপন পথ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি বাগানের দিকে সেই সহিসের খোঁজে।

গিয়ে দেখলেন আস্তাবল অন্ধকার। আগে যে কায়দায় জানলায় টোকা মেরেছিলেন এবারও মারলেন। সহিসটি মুখ বাড়াল এবং তাঁকে দেখে আবার বিবর্ণ হ'য়ে গেল ভয়ে।

"কি খবর! দানার একটা বোরা চাই—খালি বোরা। বোরাটা নিয়ে আমার সঙ্গে এস। সমস্ত রাত আমার সঙ্গে থাকতে হবে আজ—"

"মহারাজ, আস্তাবলে আমি ছাড়া কেউ নেই। আমি চলে' গেলে ঘোড়াগুলোর—"

"যা হবার হোক। ঘোড়াদের উপর তোমার যে কত দরদ তা জানা আছে।"

হঠাৎ গন্ধরাজ লক্ষ্য করলেন লোকটা ভয়ে কাঁপছে। তখন তিনি তাঁর কাঁধে হাতটা রেখে বললেন, "ভয় কি। তোমার কোন ক্ষতি করবার জন্যে আমি আসি নি। অনর্থক ভয় পাচ্ছ কেন।"

সঙ্গে সঙ্গে আশ্বস্ত হ'ল বেচারা। খালি বোরা নিয়ে এল। গন্ধরাজ তাকে সঙ্গে নিয়ে ছোট বড় নানারকম পথ পার হলেন

গল্প করতে করতে। অবশেষে যেখানে প্রকাণ্ড একটা পিতলের মাছের মুখ থেকে বিরাট একটা চৌবাচ্চায় অনর্গল জল পড়ছিল সেখানে এসে থামলেন। বললেন, "তুমি এইখানে আমার জন্য অপেক্ষা কোরো। কোথাও যেও না।" তারপর তিনি গেলেন সেই মর্মর-নির্মিত উড়ন্ত পরীর দিকে। উলঙ্গ পরী ডানা মেলে মুখ তুলে একটি পায়ের উপর ভর দিয়ে আকাশের দিকে তুই হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হ'চ্ছে এখনি উড়ে যাবে, কিন্তু উড়ছে না, স্থির হয়েই একই ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে বহুকাল ধরে'। আকাশে অসংখ্য তারা। বেশ গরম, একটুও হাওয়া নেই। দিগন্তে কৃষ্ণ-পক্ষের একফালি শীর্ণ চাঁদ উঠেছে। তার ম্লান জ্যোৎস্নায় নক্ষত্ররা ঢাকা পড়ে নি। নক্ষত্রের আলোকেই অপরূপ হ'য়ে উঠেছে চতুর্দিক। গাছের বীথির ভিতর দিয়ে দূরে তিনি প্রাসাদের আলোকিত অলিন্দের একটা অংশ দেখতে পেলেন। দেখলেন প্রহরী সেখানে পাহারা দিচ্ছে। তারও ওপারে দেখা যাচ্ছে শহরের আলো আর রাস্তা। কিন্তু আশেপাশের সবুজ গাছগুলো কেমন যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন, মৃত্যু নক্ষত্রালোকে অদ্ভুত অস্পষ্ট একটা রূপকথালোক মূর্ত হয়েছে যেন। ওই উড়ন্ত পরীটাকেও আর প্রাণহীন মর্মর মনে হ'চ্ছে না।

রাত্রির নির্জন রহস্যময় পরিবেশে গন্ধরাজের বিবেকও সহসা যেন নক্ষত্রের মতোই স্পষ্ট হ'য়ে উঠল। তিনি সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে চাইলেন, কিন্তু পারলেন না। তাঁর চরিত্রের গলদ-গুলো সারি সারি এসে দাঁড়াল যেন সেই নক্ষত্রালোকে। তিনি এখানে এসেছেন কেন? রাজকোষের অর্থ নানা অপব্যয়ে নষ্ট হয়েছে সত্য, কিন্তু তার কারণ কি তাঁরই শৈথিল্য নয়? আলস্যবশে তিনি যে রাজত্বকে সুশাসন করতে পারেন নি সেই রাজত্বের পঙ্গু রাজকোষকে তিনি অসাধু উপায়ে আরও পঙ্গু করতে উদ্যত হয়েছেন। এই চুরি-করা টাকাটাও তিনি নিজের ব্যক্তিগত

খামখেয়ালে ফুঁকে দেবেন। হ'তে পারে কাজটা মহৎ কাজ, কিন্তু তাতে কি? এটা তাঁর খেয়াল ছাড়া আর কিছু নয়। যে লোকটাকে তিনি দানা-চুরির অভিযোগে সন্ত্রস্ত করে' তুলেছিলেন তাকেই তিনি রাজকোষ থেকে টাকা চুরিতে প্রবুদ্ধ করতে যাচ্ছেন! তারপর, ওই রঞ্জাবতী—সচ্চরিত্র পুরুষের পক্ষে অসতী স্ত্রীলোকের উপর যে রকম ঘৃণা হওয়া স্বাভাবিক—সেই রকম একটা ঘৃণায় ঘিন ঘিন করতে লাগল তাঁর সারা মন। অথচ ওই স্ত্রীলোকটাকেই তিনি কাজে লাগাতে চাইছেন। যেহেতু ও হীন, যেহেতু তিনি জানতেন ওকে যে কোনও পাঁকে সহজে নামানো যাবে, তাই ওকেই এই কাজে লাগিয়ে ওকে আরও হীন করবার প্রয়াস পেয়েছেন তিনি, হয়তো এজন্যে ওর সমস্ত ভবিষ্যৎই বিপন্ন হ'তে পারে, এ জেনেও পেয়েছেন।

গন্ধরাজ শিস দিতে দিতে পায়চারি করছিলেন দ্রুতবেগে। হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে অন্ধকারে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে কে যেন এগিয়ে আসছে। লাফিয়ে এগিয়ে গেলেন তিনি এবং রঞ্জাবতী আসছে ভেবে আশ্বস্ত হলেন। একা একা বিবেকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়াই করা কি সহজ? সেই মুহূর্তে তাঁর চেয়ে বেশী পাপী আর একজনের দেখা পেয়ে সত্যিই ভারি আরাম পেলেন যেন।

কিন্তু মনে হ'ল একটি যুবক এগিয়ে আসছে, স্ত্রীলোক তো নয়। খর্বকায়, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি, চলবার ধরনটাও অদ্ভুত, ঘাড়ে একটা বোঝা। কে এ! গন্ধরাজ আত্মগোপন করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু যুবকটি হাত তুলে মানা করল। তারপর প্রায় দৌড়তে দৌড়তে এসে বোঝাটা তাঁর পায়ের কাছে ফেলে হাঁপাতে লাগল। তারপর ধপাস করে' বসে' পড়ল বেঞ্চিটার উপর, তার মুখের দিকে চেয়ে গন্ধরাজ রঞ্জাবতীকে চিনতে পারলেন।

"তুমি, রঞ্জাবতী!"

"না, আমি রঙ্গাবতীর ভাই রঞ্জনকুমার। আমিও লোক খারাপ নই। হাঁপিয়ে পড়েছি একটু দম নিতে দিন—"

"আচ্ছা, রঙ্গাবতী—"

"না, আমাকে রঞ্জনকুমার বলুন। আমার ছদ্মবেশকে উপহাস করবেন না, মেনে নিন।"

"বেশ। রঞ্জনকুমারকে তাহলে অনুরোধ করছি, আর দেরি করা ঠিক নয়, এবার রাজকোষের দিকে অগ্রসর হওয়া যাক।"

"আপনি এইখানে আমার পাশে বসুন তো"—আঙুল দিয়ে বেঞ্চিটার অপর প্রান্ত দেখিয়ে দিলেন—"এক্ষুনি যাব। বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি, বুকের ভিতরটা ধড়াস ধড়াস করছে। বিশ্বাস না হয়, হাত দিয়ে দেখুন। আপনার সেই চোরটি কোথা—"

"সে ওই ফোয়ারার কাছে আছে। আলাপ করবে তার সঙ্গে? চমৎকার লোক।"

"না এখন নয়। তাড়াহুড়ো করবেন না, কথা আছে। আপনার চোরকে আমি অসম্মান করছি না। যাদেরই পাপ করবার সাহস আছে তাদেরই আমি সম্মান করি। মহারাজের সঙ্গে প্রেমে পড়ে' গিয়েই যদিও প্রথম আমি পুণ্যলোকে উত্তীর্ণ হলাম, কিন্তু তার জন্যেও পাপের সাহায্য নিতে হ'ল।"

বিব্রত বোধ করতে লাগলেন গন্ধরাজ।

"কতক্ষণ এভাবে থাকবে এখানে?"

"যাচ্ছি, যাচ্ছি। একটু দম নিতে দেবেন না?"

আরও জোরে জোরে হাঁপাতে লাগলেন তিনি।

"কেন এত ক্লান্ত হ'য়ে পড়লে? ওই বস্তাটা বয়ে'? আচ্ছা পাগল তো তুমি! এটা বয়ে' আনতে গেলে কেন। আমি যে একটা খালি বস্তা যোগাড় করে' রাখতে পারি আমার উপর এটুকু বিশ্বাসও কি নেই তোমার? আর মনে হচ্ছে, এটা তো খালিও নয়। কি পুরে এনেছ ওতে? দেখি—"

তিনি হাত বাড়িয়ে ঝুঁকতেই রঞ্জাবতী তাঁর হাতটা ধরে' ফেললেন।

"গন্ধরাজ, না, না ওরকম করবেন না। আমি বলছি, অকপটেই সব খুলে বলছি। কাজ আমি হাসিল করে' ফেলেছি। একাই লুট করেছি আপনার রাজকোষ। ওই বস্তায় দশ হাজার সাতশো পঁয়ষট্টি মুদ্রা আছে। আশা করি এতেই আপনার কাজ হ'য়ে যাবে।"

এ কথা শুনে বজ্রাহতবৎ হ'য়ে গেলেন গন্ধরাজ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে। মুখ দিয়ে একটি কথা সরল না। তাঁর হাত তখনও বাড়ানো ছিল, রঞ্জাবতী তখনও ধরে' ছিলেন হাতের কব্জিটা।

"তুমি? কি করে' করলে—!"

তারপরই সোজা হ'য়ে বসলেন তিনি।

"তুমি নিশ্চয়ই তাহলে আমাকে এত অপদার্থ ভেবেছ যে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে সাহস হয় নি তোমার! আমি অপদার্থ তাতে সন্দেহ নেই—"

"না, এই যদি ভাবেন, তাহলে যা বললাম তা মিথ্যে। টাকাটা আমারই টাকা—সত্যি বলছি—আমারই টাকা, এখন আপনার। আপনি যা করতে চাইছিলেন তা আপনার গৌরবের সঙ্গে বেমানান। আপনার কথা শুনেই আমি ঠিক করে' ফেলেছিলাম যে আপনার বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও আমি আপনার সম্মান রক্ষা করব। আমি মিনতি করছি, আপনি আমাকে সে অধিকার দিন!"

রঞ্জাবতীর কণ্ঠস্বরে আবদারের মোলায়েম সুর বেজে উঠল। "আমি হাত জোড় করে' মিনতি করছি গন্ধরাজ। হতভাগিনীর তুচ্ছ ক'টা টাকা আপনার কাজে লাগুক। এ হতভাগিনী আপনাকে—না, ও কথা উচ্চারণ করতে লজ্জা করছে!"

"আমাকে মাপ কর রঞ্জাবতী। ও আমি পারব না। আমি চললুম—"

উঠে পড়লেন গন্ধরাজ। সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জাবতী মাটিতে নেমে দু'হাতে তাঁর হাঁটু জাপটে ধরলেন।

"না, আপনি যাবেন না। আমাকে আপনি এত ঘৃণা করেন? এ টাকা তো আমার কাছে অসার তুচ্ছ জিনিস। জুয়ার আড্ডায় দু'দিনেই শেষ হ'য়ে যাবে। কিন্তু আপনি যদি দয়া করে' নেন, ও টাকা বেঁচে গেল, আপনার কাছে জমা রইল, আপনি ভালো কাজে ব্যবহার করবেন ওটা, হয়তো ওরই জোরে নিদারুণ ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচতে পারব একদিন।"

গন্ধরাজ মৃদুভাবে চেষ্টা করলেন নিজেকে মুক্ত করতে।

"গন্ধরাজ"— রঞ্জাবতী আবার বললেন—"আপনি যদি আমাকে এই নিদারুণ লজ্জার মধ্যে ফেলে চলে' যান, আমি আর বাঁচব না। এইখানেই মরব আমি—"

গন্ধরাজ কাতরভাবে বললেন, "না, না—তুমি—"

"হ্যাঁ মরব। আমার যে কি যন্ত্রণা হচ্ছে তা কি আপনি অনুভব করতে পারছেন? সামান্য একটা চক্ষুলজ্জা আপনাকে পীড়া দিচ্ছে, কিন্তু আমার বিচূর্ণিত আত্মসম্মান, আমার পদদলিত মর্যাদার কষ্টটা যে কি নিদারুণ তা একবার ভেবে দেখুন। আমি আমার যথাসর্বস্ব—যদিও তা নিতান্ত তুচ্ছ—আপনাকে এনে দিলাম আর আপনি তা প্রত্যাখ্যান করে' চলে' যাচ্ছেন! চুরি করতে আপনার দ্বিধা ছিল না, কিন্তু আমাকে আপনি এত ঘৃণ্য মনে করেন যে, আমার বুকটা মাড়িয়ে চুরমার করে' দিয়ে যেতে আপনি ইতস্তত করছেন না। গন্ধরাজ, মহারাজ, এতটা নির্দয় হবেন না, দয়া করুন আমার উপর—দয়া করুন—কৃপা ভিক্ষা করছি—"

রঞ্জাবতী তখনও গন্ধরাজের হাঁটু দুটো জড়িয়ে ধরে' ছিলেন। তারপর হঠাৎ হাতটা ধরে' পাগলের মতো তাতে চুম্বন করতে লাগলেন। গন্ধরাজের মাথাটা ঘুরে গেল।

"ও, এতক্ষণে বুঝেছি। বুঝেছি, বুঝেছি, বুঝেছি। আমি যে বুড়ো হ'য়ে গেছি, আর তো আমার রূপ নেই, কিছু নেই—"

হঠাৎ তিনি হু হু করে' কাঁদতে লাগলেন। এইবার গন্ধরাজের পরাজয় ঘটল। আর পারলেন না—তাড়াতাড়ি রঞ্জাবতীকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত টাকাটা নিতেও রাজী হ'তে হ'ল তাঁকে। দুর্বল মানুষ স্ত্রীলোকের পাল্লায় পড়লে যা হয় তাই হ'ল। রঞ্জাবতীর কান্না থেমে গেল। কম্পিতকণ্ঠে তিনি ধন্যবাদ দিলেন গন্ধরাজকে, তারপর বেঞ্চিতে উঠে বসলেন গন্ধরাজের পাশে।

"এখন বুঝতে পারছেন কেন আমি আপনার চোর বন্ধুটিকে দূরে রাখতে বলেছিলাম আর কেনই বা আমি একা এসেছি। টাকাটা নিয়ে আসতে কি যে বুক কাঁপছিল আমার—"

"আর বোলো না রঞ্জাবতী"—গন্ধরাজের কণ্ঠস্বরও সজল মনে হ'ল—"আমাকে আর লজ্জা দিও না। তুমি এত ভালো, এত মহৎ তা আমি জানতাম না। তুমি যে আমার জন্যে এতটা করবে—"

"করব না? বলেন কি। শুনে অবাক লাগছে। আপনি কি নির্বুদ্ধিতাটা করছিলেন বলুন তো! এখন আপনি স্বচ্ছন্দে আপনার সেই কৃষক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করুন গিয়ে। আপনার বান্ধবীর টাকাটারও সদ্গতি হ'ল একটা। বাজে চক্ষুলজ্জার জন্যে আপনি যেটা প্রকৃত কর্তব্য, আমি বলব যেটা প্রকৃত দয়া—সেইটেই ভুলে যাচ্ছিলেন আপনি। যাক্, আমি এবার খুশী হয়েছি, খুব খুশী হয়েছি। কিন্তু আপনি অমন মুখ গোমড়া করে' রইলেন কেন। হাসি ফুটছে না কেন আপনার চোখে মুখে। আমি জানি সৎকার্য করলে মনটা দমে' যায়। কিন্তু ভুলে যান এসব। আমার দিকে তাকান, হাসুন একটু—এখনও রাগ পড়ল না?"

গন্ধরাজ তাঁর মুখের দিকে চাইতে পারলেন না। যখন কেউ

কোন নারীকে আলিঙ্গন করে তখন ইন্দ্রজালের জাদু সম্মোহিত করে' দেয় তার মনকে ; কিন্তু এ সময়ে গহন রাত্রির পটভূমিকায় নক্ষত্রের চিকিমিকি আলোকে নারীর যে মাধুরী ফুটে ওঠে তা অনির্বচনীয়। তার চুলে তারার আলোর ছোঁয়া হ'য়ে ওঠে নিপুণ তুলির স্পর্শ, তার চোখ দুটিকে মনে হয় নক্ষত্র-মিথুন। তার মুখের রেখায় রেখায় মন যে ছবি আঁকে তা অনুরাগ-রঞ্জিত অনবদ্য চিত্র। গন্ধরাজ পরাজিত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তার জন্য আর ক্ষোভ ছিল না মনে। রঞ্জাবতীর উপর আর রাগ করতে পারছিলেন না। বরং অনুরাগই জাগছিল মনে।

বললেন, "না, আমি অকৃতজ্ঞ নই—"

"আপনি বলেছিলেন মজার খোরাক দেবেন আমাকে। কিন্তু আমিই দিলাম সেটা। কেমন একটা ঝঞ্ঝা-ঝটিকাময়ী নাটিকা হ'য়ে গেল বলুন তো—"

গন্ধরাজ হেসে উঠলেন। কিন্তু সে হাসির আওয়াজটা যেন স্বাভাবিক মনে হ'ল না। মনে হ'ল মেকী।

"এবার আমাকে কি দেবেন বলুন, আমার এমন বাহাদুরির বখশিস কিছু পাব না ?"

"যা চাও তাই দেব।"

"যা চাই তাই দেবেন ? সত্যি ? মনে করুন যদি আপনার রাজমুকুটটাই চেয়ে বসি ? দেবেন ?"

বিজয়িনীর গর্বে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল তাঁর দৃষ্টি।

"চাও যদি, নিশ্চয়ই দেব।"

"চাইব তাহলে মুকুটটা ? না, মুকুট নিয়ে কি করব আমি ! ছোট্ট রাজ্য আপনার গর্জনগাঁও। আমার দুরাকাঙ্ক্ষা আরও অনেক বেশী। আমি চাই—কি চাইব—দেখছি চাইবার মতো কিছুই তো নেই। তার বদলে আমিই বরং কিছু দিই আপনাকে। নিন, চুমু খান আমার। একবার কিন্তু। সরে' আসুন।"

সরে' এলেন গন্ধরাজ। রঞ্জাবতী মুখটা উঁচু করলেন। দুজনেরই চোখেমুখে চিকমিক করতে লাগল হাসি। যেন একটা ছেলেমানুষি খেলা হ'চ্ছে। কিন্তু তাঁদের ওষ্ঠ সত্যিই যখন সংলগ্ন হ'ল তখন গন্ধরাজের সমস্ত সত্তায় একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্প হ'য়ে গেল যেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দূরে সরে' বসলেন। রঞ্জাবতীও। নির্বাক হ'য়ে খানিকক্ষণ বসে' রইলেন দুজনেই। গন্ধরাজের ভয় হ'ল এই নীরবতার মধ্যে হয়তো আরও কোন আসন্ন বিপদ ওত পেতে আছে, তবু তিনি নীরবতা ভঙ্গ করতে পারলেন না। কোন কথাই যোগাল না তাঁর মুখে। রঞ্জাবতীই প্রথমে কথা কইলেন।

"আপনার স্ত্রীর সম্বন্ধে একটা কথা—"

বেশ পরিষ্কার অকম্পিত কণ্ঠে শুরু করলেন রঞ্জাবতী।

"আমার স্ত্রীর বিরুদ্ধে আমি কোন কথা শুনতে চাই না। আমি তাকে ভালবাসি—"

খাপছাড়া রকম উঁচু গলায় গন্ধরাজ বলে' উঠলেন।

"আমি কি বলি তা আগে শুনুন। শেষ করতে দিন কথাটা"— হেসে উত্তর দিলেন রঞ্জাবতী—"বিনা কারণে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করি নি। এখনই আমাদের দুজনেরই মাথা খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওর জন্যে অপ্রস্তুত হবেন না, এতে লজ্জারই বা কি আছে।"

রঞ্জাবতীর কথায় ধমকের একটু আমেজ পাওয়া গেল—"লজ্জা-টজ্জা নিয়ে বাড়াবাড়ি পছন্দ করি না আমি। একটু ভাবলেই আপনি বুঝতে পারবেন আমি নানাভাবে আপনাকে বাঁচাবারই চেষ্টা করছি, আপনার সুনামকে রক্ষা করবার জন্য আমি তার চার-পাশে দুর্গ ই রচনা করছি। এটা যেন আপনি ভুলেও মনে করবেন না যে আমি আপনার প্রেমের ভিখারিণী, মোটেই তা নই—এ কথাটা মনে রাখলে সুখী হব। হাসতে হাসতে যা করলুম, হাসির

সঙ্গেই তা শেষ হোক। বিয়োগান্ত নাটকের নায়িকা হবার ইচ্ছে নেই। হ্যাঁ, আপনার স্ত্রীর সম্বন্ধে যা বলছিলাম—তিনি কপিঞ্জলের উপপত্নী নন, কখনও ছিলেন না। কপিঞ্জল তাঁর অন্দরের উঠোনে প্রবেশাধিকার পায় নি। পেলে এ নিয়ে নিশ্চয় সে ঢাক বাজিয়ে বেড়াত। আচ্ছা, চললুম। নমস্কার—"

নিমেষের মধ্যে গলির অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন রঞ্জাবতী। গন্ধরাজ টাকার থলি নিয়ে সেই উড়ন্ত পরীর সামনে একা বসে' রইলেন।

চৌদ্দ

রঙ্গাবতী যুগপৎ আঘাত এবং আদর হেনে চলে গেলেন। তাঁর স্ত্রীর সম্বন্ধে যে সুসংবাদটি দিয়ে গেলেন এবং যে ভাবে এই অভিনব সাক্ষাৎকারটির সুষ্ঠু পরিসমাপ্তি হ'ল তাতে গন্ধরাজের নিঃসন্দেহে খুশী হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু যখন তিনি টাকার বস্তাটা কাঁধে তুলে নিয়ে তাঁর সহিসটির কাছে যাবার জন্যে পা বাড়ালেন তখন যেন নানা বেদনার কাঁটা খচখচ করে' বিঁধতে লাগল তাঁর মনে। অন্যায় করা এবং তারপর সংশোধিত হ'য়ে ন্যায়ের পথে ফিরে আসা—দুটোই পুরুষের অহঙ্কারকে আঘাত করে। সহসা তাঁর নিজের দুর্বলতা আবিষ্কার করে' এবং সে রকম অবস্থায় পড়লে তাঁর পক্ষেও যে দাম্পত্য-অঙ্গীকার লঙ্ঘন করা সম্ভব এই ভেবে তাঁর আত্মবিশ্বাস কেমন যেন টলমল করে' উঠল। আর ঠিক এই সময়ে তিনি শুনলেন যে স্বরূপিণী অটল আছে, আর এমন লোকের মুখ থেকে শুনলেন যে তার বন্ধু নয়, শত্রু। এই অপ্রত্যাশিত সংবাদ শুনে তাঁর মনের খচখচানিটা আরও বেড়ে গেল যেন।

খানিকটা পথ হাঁটবার পর একটু স্বস্থ হলেন তিনি, পরিষ্কার ভাবে নিজের মনটা দেখতে পেলেন। দেখে আশ্চর্য হ'য়ে গেলেন যে তিনি রেগে রয়েছেন। ক্রোধভরেই থেমে গেলেন তিনি এবং ঠিক তাঁর পাশেই যে ছোট ঝোপটা ছিল তাতে সজোরে আঘাত করলেন হাত দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক চড়ুই পাখী উড়ল, উড়েই আবার বিলীন হ'য়ে গেল অন্ধকারে। বোকার মতো চেয়ে রইলেন তিনি সেদিকে। তারা যখন অন্তর্ধান করল তখন চাইলেন নক্ষত্রের দিকে। অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন।

"আমার রাগ হ'চ্ছে"—ভাবতে লাগলেন তিনি—"কিন্তু কেন? রাগের সঙ্গত কারণ কিছু ঘটেছে কি? কিছু না।"

হঠাৎ রঞ্জাবতীর উপর রাগ হ'ল, কিন্তু পরমুহূর্তেই অনুতাপ করলেন সেজন্য। কাঁধের উপর টাকার ভারটা বেশ ভারী বলে' মনে হ'তে লাগল।

ফোয়ারার কাছে পৌঁছে বাহাদুরি দেখাবার জন্যে তিনি যা করলেন সেটাও খুব সুবুদ্ধির কাজ নয়।

চোর সহিসের কাছে টাকার থলিটা ধপাস্ করে' নামিয়ে বললেন, "এটা তোমার কাছে রাখ। পরে আমি এসে নিয়ে যাব। অনেক টাকা আছে এতে। এর থেকেই বুঝতে পারছ তোমার উপর আমি রাগ করি নি।"

এই বলে' গটগট করে' চলে গেলেন তিনি, যেন খুব একটা মহৎ কাজ করেছেন। সঙিন উঁচিয়ে নিজের আত্মসম্মানের দুর্গে প্রবেশ করবার হাস্যকর চেষ্টা এটা, আর এসব ক্ষেত্রে যা সাধারণতঃ হয় এক্ষেত্রেও তাই হ'ল—এ চেষ্টাও সফল হ'ল না। বিছানায় শুয়ে সারারাত এপাশ ওপাশ করলেন। একটুও ঘুম হ'ল না। তারপর ভোরের দিকে, উষার আলো যখন পূর্বাকাশে ফুটি ফুটি করছে, তখন হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি। ঘুম ভাঙল বেলা দশটায়। মনে হ'ল এখনই যে কীর্তিভূষণের সঙ্গে দেখা করবার কথা। দেখা করতেই হবে, দেরি হ'য়ে গেল, তা হোক। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লেন তিনি ঘর থেকে এবং ধাবিত হলেন সেই সহিসের উদ্দেশে। গিয়ে দেখলেন—আশ্চর্যের বিষয় এটা—সহিস ঠিক আছে, টাকার থলিও ঠিক আছে। তাড়াহুড়ো করে' হাজির হলেন গিয়ে 'শুকতারা' সরাইখানায়, একটু দেরি হ'য়ে গিয়েছিল অবশ্য, গিয়ে দেখলেন কীর্তিভূষণ সভ্যভব্য পোশাক পরে গম্ভীরভাবে বসে' আছে তাঁর অপেক্ষায়। একজন আইনজীবীও কাগজপত্র নিয়ে প্রস্তুত হ'য়ে আছেন পাশের একটা টেবিলে। দলিলে সেই সহিস এবং সরাইখানার মালিক সাক্ষী হলেন। সরাইখানার মালিক গন্ধরাজকে চিনতে পেরেছিলেন এবং

মহারাজের মতই খাতির করেছিলেন তাঁকে। এ দেখে অবাক হ'য়ে গেল কীর্তিভূষণ, এত খাতির করছে কেন। তারপর ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল তার কাছে যখন গন্ধরাজ দলিলে সই করলেন। তখন আত্মহারা হ'য়ে পড়ল বেচারা।

"মহারাজা"—আবেগভরে' বলে' উঠল সে—"মহারাজা" এই কথাটাই বার বার উচ্চারণ করতে লাগল সে। কিছুতেই যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না তার। যখন বিশ্বাস হ'ল তখন সে সাক্ষী দুটির দিকে ফিরে বলল, "আপনারা স্বর্গরাজ্যে বাস করছেন। আমি অনেক সদাশয় ভদ্রলোক দেখেছি কিন্তু এঁর মতো লোক আর দেখি নি—সত্যি বলছি দেখি নি। ইনি সত্যিই মহারাজা। আমি বুড়ো মানুষ, অনেক অভিজ্ঞতা আছে আমার, কিন্তু এমন ভদ্রলোক কখনও দেখি নি। সত্যি দেখি নি—সত্যি ভদ্রলোক।"

সরাইখানার মালিক মৃদু হেসে বললেন, "আমরা তা ভাল করেই জানি। ওঁকে যদি আমরা আরও কাছে পেতাম তাহলে বর্তে যেতাম।"

সহিসটিও বলতে শুরু করেছিল—"এরকম দয়ালু মহারাজা—" বলেই চুপ করে' গেল সে, হঠাৎ তার চোখ দিয়ে টপটপ করে' জল ঝরে' পড়ল কয়েক ফোঁটা। সবাই ফিরে চাইল তার দিকে। গন্ধরাজ অবাক হ'য়ে গেলেন।

এরপর উকীল ভদ্রলোকটিও কিছু বললেন।

"মহারাজা, ভবিষ্যতে কি হবে তা জানি না। কিন্তু এটুকু বলতে পারি আজকের দিনটি আপনার রাজত্বের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল দিন। এই নিরীহ সরল লোকগুলির মুখে আপনার যে জয়ধ্বনি আজ ধ্বনিত হ'ল তা আপনার সমস্ত সৈন্যবাহিনীর জয়-ধ্বনির চেয়েও বেশী মুখর, বেশী আন্তরিক।"

এই বলে' তিনি অভিবাদন করলেন, একটু পিছিয়ে গেলেন এবং একটিপ নস্যি নিলেন। মনে হ'ল সুযোগ মতো তাক মাফিক

ভালো ভালো কথাগুলো বলতে পেরেছেন বলে' ভারি একটা আত্মপ্রসাদ হয়েছে তাঁর।

কীর্তিভূষণ বলল, "আপনি জীবনে অনেক আইনের কাজ করেছেন, এ কথা বলাই বাহুল্য, কিন্তু এটা নিঃসন্দেহ, আজ যা করলেন তেমনটি আর কখনও করেন নি। আমি বুড়ো মানুষ আপনাকে আশীর্বাদ করছি। আপনি বড়লোক, অনেক বড় বড় সমাজে ঘোরেন, আপনার সুখের অভাব নেই তবু আমার মতো গরীবলোকের আশীর্বাদে আশা করি আপনার আরও ভালো হবে।"

ব্যাপারটা প্রায় একটা অভিনন্দন-সভার মতো হ'য়ে দাঁড়াচ্ছিল, কিন্তু গন্ধরাজ আর সেখানে দাঁড়ালেন না। বেরিয়ে এসে একটা অদ্ভুত কথা মনে হ'ল তাঁর। যেখানে গেলে নিশ্চয়ই প্রশংসা পাওয়া যাবে এ রকম একটা জায়গায় যাওয়ার জন্য মনটা আকুল হ'য়ে উঠল সহসা। মনে পড়ল রাজসভার কথা। সেখানে তিনি যা করেছিলেন তা প্রশংসাযোগ্য নিশ্চয়ই। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল ইন্দীবর ভারতীর কথা। ঠিক করলেন তাঁর কাছেই যাবেন।

ইন্দীবর ভারতী যথারীতি পাঠাগারেই ছিলেন। গন্ধরাজকে দেখে, মনে হ'ল যেন একটু অসন্তুষ্ট ভাবেই তিনি কলমটা নামিয়ে রাখলেন। তারপর বললেন—"এই যে। কি খবর—"

"খবর? আমরা সেদিন বিদ্রোহটা করে' ফেলতে পেরেছি, কি বল?"

"হ্যাঁ। আমারও ভয় হ'চ্ছে তাই।"

"ভয়? ভয় কিসের? আমি এবার আমার শক্তি আর ওদের দুর্বলতা কোথায় তা বুঝতে পেরেছি। এবার থেকে আমিই শাসন করব আমার রাজ্য—"

ইন্দীবর কোনও উত্তর দিলেন না, হেঁটমুণ্ডে নিজের থুতনিতে হাত বোলাতে লাগলেন নীরবে।

"তোমার মত নেই? আচ্ছা খামখেয়ালী লোক তুমি তো!"

"আজ্ঞে না মহারাজ। আমি যতটুকু দেখেছি তাতে আমার ভয়ই হ'চ্ছে। এ ভাবে চললে কিছুই হবে না।"

"কি ভাবে চললে!"

গন্ধরাজের গালে কে একটা চড় মারল যেন।

"যে ভাবে চলছ। রাজ্যশাসন করতে হ'লে যে শক্তি, যে চরিত্র, যে সংযম, যে ধৈর্য থাকা দরকার তা তোমার কিচ্ছু নেই। তোমার স্ত্রীর চরিত্রে এ সব আছে, অনেক বেশী আছে। যদিও সে একটা বদলোকের পাল্লায় পড়েছে, কিন্তু তার শাসন করবার ক্ষমতা তোমার চেয়ে ঢের বেশী। সে জানে কত ধানে কত চাল হবে এবং কি করে' সেটা নিজের গোলায় তোলা যাবে। আর তুমি, ভাই গন্ধরাজ রাগ কোরো না, তুমি তুমিই। আমার উপদেশ তুমি তোমার খেলার মাঠে ফিরে যাও। নিজেকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না, তুমিও পার নি। তুমি বার বার আত্মপ্রকাশ করছ। আমার কোনও কিছুতেই বিশেষ আস্থা নেই, আমি পক্ষপাতহীন নাস্তিক। তবে দুটি ব্যাপারে আমার অনাস্থা সবচেয়ে বেশী, একটি হচ্ছে রাজনীতি, আর একটি চরিত্র-নীতি। তুমি যে সব দুষ্কর্ম কর, সেগুলো আমার ভালোই লাগে, কারণ তা প্রায় সবই নেতি-বাচক, বিশেষ কারো অনিষ্ট করে না, আর আমার জীবনদর্শনের সঙ্গে মেলেও খানিকটা। তাই মাঝে মাঝে তোমার ওই দুষ্কর্মগুলোকে সৎকর্ম বলতেও দ্বিধা করি নি আমি। কিন্তু গন্ধরাজ, এখন দেখছি, আমার ভুল হয়েছে। আমার নাস্তিক্যবাদ আমি বর্জন করেছি এবং দেখতে পাচ্ছি যে তোমার দোষ অমার্জনীয়। তুমি মহারাজা হওয়ার উপযুক্ত নও, স্বামী হওয়ার যোগ্যতাও নেই তোমার। একটা প্রচণ্ড গুণ্ডা যদি সব তছনছ করে' দেয় তার দক্ষতাকে সহ্য করা যায় কিন্তু ভালো করবার ছুতোয় যদি কেউ আনাড়ীর মতো সব পণ্ড করতে থাকে তাহলে তা অসহ্য।"

গন্ধরাজ নীরবে গুম হ'য়ে শুনে যেতে লাগলেন।

ইন্দীবর শুরু করলেন আবার—"প্রথমে ছোটখাটো ব্যাপারের কথাই বলছি—স্ত্রীর প্রতি তোমার আচরণ। তুমি নাকি তোমার স্ত্রীর কাছে গিয়ে জবাবদিহি দাবি করেছিলে, এটা ভালো কি মন্দ তার আমি সমালোচনা করছি না। কিন্তু এর ফল হয়েছে তিনি চটেছেন। রাজসভায় প্রকাশ্যে তিনি তোমাকে অপমান করলেন। তুমিও উল্টে অপমান করলে তাঁকে—পুরুষ আর নারী—স্বামী আর স্ত্রী—প্রকাশ্য সভায় ইতরের মতো ঝগড়া করতে লাগল। আমার মনে হচ্ছিল, এটা রাজসভা, না মেছোবাজার। যাক্ সে সব তো চুকে বুকে গেল—তারপর শুনছি না কি— কথাটা আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে—শুনছি না কি দলিলপত্রে মহারাণীর স্বাক্ষর করবার অধিকারটা তুমি কেড়ে নিয়েছ। এ অপমান তিনি কি কখনও ক্ষমা করবেন? তেজস্বিনী যুবতী নারী—যিনি জানেন যে তোমার বুদ্ধির চেয়ে তাঁর বুদ্ধি অনেক বেশী—তিনি কি এ আঘাত সহ্য করবেন নীরবে? কখনও না। প্রত্যাঘাতের জন্য প্রস্তুত থাকো। পরিশেষে আর একটা কথা, তোমার দাম্পত্য-জীবনের যখন এই রকম টলমল অবস্থা তখন তুমি তোমার বৈঠকখানায় ওই রঞ্জাবতীর সঙ্গে ঘেঁষা-ঘেঁষি করে' জানলার খোপে বসে' স্বচ্ছন্দে আড্ডা দিয়েছ। আড্ডা দেওয়া অন্যায় তা বলছি না, কিন্তু এ কাজটি প্রকাশ্যে করে' তোমার স্ত্রীর মর্যাদাহানি করেছ তুমি। তাছাড়া মেয়েটি অপাঙ্গময়ী হ'তে পারে, কিন্তু অপাংক্তেয়। ওর সঙ্গে কি মহারাজের—"

"ইন্দীবর, রঞ্জাবতীর কোন নিন্দা আমি সহ্য করব না।"

"কোরো না, কিন্তু তার কোনও প্রশংসাও আমি করতে পারব না। দেখ, তুমি যদি তোমার স্ত্রীকে নিখুঁত চারুশীলা দেখতে চাও তাহলে তোমার সভা থেকে ওই সব আঁশটে-গন্ধ দূর কর—"

"ইন্দীবর, তুমিও কি তোতাপাখির মতো ছেঁদো কথা

আওড়াবে? মহিলা বলেই ওর যত অপরাধ? কপিঞ্জল কি তাহলে! রঞ্জাবতী যদি পুরুষ হ'ত—"

"আমার কাছে সব সমান। দেখ—"

ইন্দীবরের কণ্ঠস্বর একটু চড়া হ'ল—"দেখ, যখন বুড়োখোকা এসে ভাঁড়ামি করে' হেঁয়ালিতে কথা কয় আর নিজের দোষগুলো নিয়ে বাহাদুরি করতে চায়, তখন আমি মুখ ফিরিয়ে নিই। তখন আমি বলতে বাধ্য হই, তুমি ভদ্রলোক নও, তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব নেই। মহিলা! মহিলা কথাটার মানে জান তুমি? রঞ্জাবতীকে তুমি মহিলা বলছ!"

"রঞ্জাবতীর চেয়ে বড় বন্ধু আমার নেই। আমি ইচ্ছা করি তার সম্বন্ধে সসম্ভ্রমে কথা বলা হোক।"

"সে যদি তোমার বন্ধু হ'য়ে থাকে তাহলে সেটা তোমার দুর্ভাগ্য। ও জল ওখানেই থেমে থাকবে না, অনেক দূর গড়াবে!"

"বাঃ বাঃ, তোমার উদারতা দেখে মুগ্ধ হলাম। ফলে একটু দাগ থাকলেই সেটা পচা? চমৎকার যুক্তি তোমার। কিন্তু আমি তোমাকে বলছি রঞ্জাবতীর উপর তুমি ঘোর অবিচার করছ!"

"আমাকে বলতে তোমার বাধা থাকা উচিত নয়। তুমি কি ওকে বাজিয়ে দেখেছ? ঘোড়ায় চড়েছ, না ঘোড়াটা দেখেই—"

গন্ধরাজের মুখটা লাল হ'য়ে উঠল।

"মুখ চোখ লাল হ'য়ে উঠল যে। তোমার স্ত্রীর দিকে চেয়ে লজ্জায় তোমার অধোবদন হওয়া উচিত। ও রকম মেয়েকে পেয়ে হাতছাড়া করে' ফেলছ তুমি। ও রকম টকটকে রাঙা জবার মতো মেয়ে—ওর চোখে যে দীপ্তি জাজ্বল্যমান তা ওর আত্মার প্রকাশ।"

"স্বরূপিণীর সম্বন্ধে সুর বদলে ফেলেছে দেখছি—"

ভুরু কুঁচকে বললেন গন্ধরাজ।

"বদলে ফেলেছি?"—উদ্দীপ্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন ইন্দীবর—"অন্যরকম কবে ছিল? আমি উচ্চকণ্ঠে স্বীকার করছি রাজসভায় তার যা চেহারা দেখেছি তা অপূর্ব। নীরবে বসে সে যখন পায়ের জুতো ঠুকছিল তখন বিস্মিত হ'য়ে গিয়েছিলাম আমি, ঝড়কে দেখে যেমন হই, তেমনি। দাম্পত্যের দুরূহ পথে যদি কখনও পদার্পণ করতে প্রলুব্ধ হই—ওই রকম মেয়ের জন্যই হব। সত্যিই প্রলুব্ধ ক'রে, দ্রৌপদী যেমন প্রলুব্ধ করেছিল অর্জুনকে। লক্ষ্য ভেদ করা শক্ত, খুবই শক্ত, কিন্তু ও রকম মেয়েরা বীরভোগ্যাই হয়। ও রকম পুরস্কারের জন্য কৃচ্ছ্রসাধন করতে পারি। কিন্তু ওই রঞ্জাবতীর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করা—কখনও না। কাম? ওটা আমি বর্জন করেছি। ও চুলকোনি ছাড়া কিছু নয়। কৌতূহল? শরীরতত্ত্বের বই খুললেই তা মিটে যায়—তার জন্যে—"

"কাকে তুমি কি বলছ! তুমি অন্ততঃ জান আমি সুরূপিণীকে ভালবাসি—আর কেউ না জানুক।"

"ও ভালবাসা! প্রেম! মস্ত কথা ওটা, সব অভিধানেই আছে। তুমি যদি তাকে ভালবাসতে তাহলে তার প্রতিদানও নিশ্চয় পেতে। ও তো বেশী কিছু চায় না—একটু আদর, একটু উচ্ছ্বাস, একটু উত্তাপ, একটু হাব-ভাব—"

"কিন্তু দুজনের ভালবাসা একজন কি বাসতে পারে? খুব শক্ত সেটা।"

"শক্ত বলছ? ওইটেই তো কষ্টিপাথর। কবিরা কি বলে' গেছেন মনে নেই? আমরা তো মরুভূমি—কেবল ধূলো-বালি আর উত্তাপ, জীবনের শ্যাম-শোভা সেখানে নেই। প্রেমই তাকে স্নিগ্ধ করে। বিরাট পর্বতের মতো দাঁড়িয়ে প্রেম যে শীতল ছায়া বিস্তার করে সে ছায়ায় শুধু প্রণয়ী নয়, প্রণয়িনী এবং তার ছেলে মেয়েরাও আশ্রয় পায়, বন্ধু-বান্ধবরাও সে ছায়ার প্রান্তে এসে শান্তি

খোঁজে। যে প্রেম গৃহস্থালীর নীড় রচনা করতে পারে না সে প্রেম প্রেমই নয়। খুঁত ধরে' ঝগড়া করাকে তুমি প্রেম বল? প্রণয়িনীর পথে পদে পদে বাধা সৃষ্টি করে' তার মুখের উপর প্রকাশ্যে অপমান ছুঁড়ে দেওয়াটা কি প্রেমের লক্ষণ? প্রেম!"

"ইন্দীবর, তুমি আমার উপর অবিচার করছ। আমি তখন দেশের জন্য লড়ছিলাম।"

"আর ওইখানেই সাংঘাতিক ভুল করেছ। তুমি বুঝতেও পার নি যে ভুল করছ। রাজপরিষদ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যতদূর এগিয়েছিল সেখান থেকে এখন পিছিয়ে আসা মানে যে সর্বনাশ এটা তোমার মাথায় ঢোকে নি।"

"কিন্তু তুমি তো আমাকে সমর্থন করেছ।"

"করেছি। কারণ আমিও তোমার মতো হাঁদা। কিন্তু এখন আমার চোখ খুলেছে। এখন বুঝতে পারছি তুমি যদি এই চালে চল, ওই কপিঞ্জল লোকটাকে যদি প্রকাশ্যে অপমান কর, এবং তোমার গৃহবিচ্ছেদের কেলেঙ্কারি যদি ঢাক ঢোল বাজিয়ে প্রচার করে' বেড়াও তাহলে গর্জনগাঁওয়ের সর্বনাশ হ'য়ে যাবে। বিদ্রোহ হবে, বিদ্রোহ—"

"তুমি নিজেকে লাল বিদ্রোহী বল। বিদ্রোহকে এত ভয় তোমার? এসব কথা তোমার মুখে মানাচ্ছে না।"

"হ্যাঁ, আমি লালই, কিন্তু প্রজাতন্ত্রী লাল। রাষ্ট্রবিপ্লবী নই। উন্মত্ত গর্জনগাঁওয়ের জনতা অতি জঘন্য অতি ভয়ঙ্কর। মাত্র একটি লোকই ওদের ঠাণ্ডা করতে পারে, দেশকে এ বিপদ থেকে বাঁচাতে পারে—সে হ'চ্ছে ওই দুমুখো সাপ কপিঞ্জল। তুমি যেমন করে' পার ওর সঙ্গে ঝগড়া মিটিয়ে ফেল, তাহলেই দেশে শান্তি ফিরে আসবে। তুমি তা পারবে না, তোমার সে ক্ষমতাই নেই। তোমার সুরূপিণী যা বলে-ছিল তাই তুমি। তুমি মহারাজাপদের সুযোগ নিয়ে নিজের

খেয়ালখুশির মালমসলা সংগ্রহ করতে ব্যস্ত। কাল টাকার জন্যে তুমি নাছোড়বান্দা ভিকিরির মতো ভিক্ষে করছিলে। কেন? রাজকোষের টাকা কেন নেবে? এ কি অদ্ভুত নির্বুদ্ধিতার হেঁয়ালি! কি দরকার ছিল টাকার!"

"কোন মন্দ কাজের জন্যে নয়। একটা খামার কেনবার জন্যে।"

"খামার! খামার কেনবার জন্যে!"

"কেন, ক্ষতি কি। আমি কিনেও ফেলেছি।"

ইন্দীবর যেন লাফিয়ে উঠলেন।

"কি করে' কিনলে?"

"কি করে'?"

"হ্যাঁ, কি করে'। টাকা পেলে কোথায়—"

গন্ধরাজের মুখটা কালো হয়ে গেল।

"পেয়েছি কোথাও থেকে। তা তুমি না-ই বা শুনলে।"

"কথটা বলতে লজ্জা হচ্ছে তোমার। তোমার রাজ্যের যখন টাকার এত দরকার তখন তুমি খামার কিনছ, সম্ভবতঃ তোমার ইচ্ছে সিংহাসন ত্যাগ করে' সেইখানে গিয়ে বসবাস করবে। আমি বলছি তুমি টাকাটা চুরি করেছ। টাকা পাওয়ার তিন রকম উপায় নেই, মাত্র দু'রকম আছে—হয় উপার্জন করা, না হয় চুরি করা। উপার্জন করবার ক্ষমতা তোমার নেই, সুতরাং তুমি চুরি করেছ, আর তা নিয়ে আমার কাছে বাহাদুরি করছ। দেখ, একটা সোজা কথা স্পষ্ট করে' বলছি তোমাকে। যতক্ষণ আমি এই খামার খরিদের সম্পূর্ণ বিবরণ না জানছি, ততক্ষণ আমি আর তোমার ব্যাপারে নেই। হাত গুটিয়ে নিলাম। মহারাজা হিসাবে তুমি অযোগ্যতম হ'তে পার, কিন্তু ভদ্রলোক হিসাবে তোমাকে নিষ্কলঙ্ক হ'তে হবে।

বিবর্ণ মুখে উঠে দাঁড়ালেন গন্ধরাজ।

"ইন্দীবর তুমি আমাকে আমার ধৈর্যের সীমার ওপারে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছ। তোমাকে সাবধান করে' দিচ্ছি—"

"তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ, বন্ধু ?"—গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করলেন ইন্দীবর—"তাহলে তো এ নাটকের অদ্ভুত উপসংহার হ'ল।"

"ব্যক্তিগত কারণে কবে আমি আমার ক্ষমতা ব্যবহার করেছি ? তুমি আমাকে যা বললে যে কোনও লোকের পক্ষেই তা অমার্জনীয় অপমান, কিন্তু আমাকে লক্ষ্য করে' তুমি নিরঙ্কুশ ভাবে তীরের পর তীর চালিয়ে গেলে, কারণ তুমি জান আমি তোমায় কিছু বলতে পারব না এবং হয়তো এ আশাও করেছ যে তোমার স্পষ্টবাদিতার জন্যে তোমার কাছে কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করব। বেশ, আমি তা করছি এবং এ-ও বলছি তোমাকে শুধু ক্ষমাই করলাম না, তোমার প্রশংসাও করছি, আমার মতো একজন পিশাচ-মহারাজার সঙ্গে এতদিন ছিলে বলে'। কিন্তু তুমি যে নিষ্ঠুর হাতে আমাদের পুরোনো প্রেমটাকে এমন ভাবে উপড়ে ফেলতে পার তা ভাবি নি। বুকটা খালি হ'য়ে গেল। শেষ বন্ধনটাও ছিঁড়ে গেল। ভগবান সাক্ষী আমি যা করতে চেয়েছি তা মন্দ নয়, ভালো। পাপ নয়, পুণ্য। কিন্তু তার এই পুরস্কার। কোন বন্ধু রইল না, একা হ'য়ে গেলাম। তুমি বললে আমি ভদ্রলোক নই, কিন্তু এতক্ষণ তোমার মুখেই গালাগালির খই ফুটেছে, আমি একটি অভদ্র কথাও উচ্চারণ করি নি। যদিও আমি বুঝতে পারছি কার জন্যে তোমার এত দরদ, তবু আমি মুখ বুজেই আছি, মুখ বুজেই থাকব।"

"পাগল হ'য়ে গেলে না কি তুমি!"

চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন ইন্দীবর।

"যেহেতু আমি জানতে চাই যে কি করে' তুমি টাকাটা পেলে এবং যেহেতু তুমি তা বলতে রাজী নও—তাই—"

"পণ্ডিতপ্রবর মহামান্য ইন্দীবর ভারতী, আমার ব্যাপারে তোমাকে আর নাক গলাতে হবে না, তোমার হিতৈষণা তোমার

কাছেই থাক। আমি যা জানতে চেয়েছিলাম তা জেনেছি, তুমি আমার অহঙ্কারকে দুপায়ে পিষে চূর্ণবিচূর্ণও করেছ। আমি রাজ্যশাসন করতে পারি না, আমি ভালওবাসতে পারি না—এসব হয়তো সত্যি, তুমি অন্ততঃ জোরের সঙ্গে তা বললে, নিশ্চয়ই তোমার বিবেকেরও সায় আছে ওতে, কিন্তু ভগবান আমাকে একটা ক্ষমতা দিয়েছেন, আমি সব জেনে সব শুনেও ক্ষমা করতে পারি। আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম, আমার মনের এই শোচনীয় অবস্থাতেও আমি বুঝতে পারছি কি কি আমার দোষ এবং তুমি সেজন্য উদ্বিগ্ন হয়েছ কেন। ভবিষ্যতে যদি তোমার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করি তাহলে ভেবো না যে আমি রাগ করে' তা করেছি। রাগ নয়, কিন্তু তুমি আমাকে যে ভাবে যে ভাষায় আক্রমণ করেছ, তা বার বার সহ্য করবার ক্ষমতা আমার নেই। তোমার মহারাজাকে কাঁদিয়ে এবং ব্যথা দিয়ে তুমি তৃপ্তি পেয়েছ এবং যে লোকটার সুখকে নিয়ে তুমি কতবার ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতে তাকে ধুলোয় নামিয়ে নির্জন পথের পথিক করে' দিয়ে সুখ পেয়েছ—বাস্। না আর কোনও কথা আমি শুনতে চাই না। মহারাজা হিসাবে শেষ কথাটা বলবার দাবি আমার আছে—সেই কথাটা বলে' আমি চলে' যাচ্ছি—আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম।"

এই কথা বলে' গন্ধরাজ চলে' গেলেন। একা বসে' রইলেন ইন্দীবর ভারতী। দুঃখ, অনুতাপ (এবং ঈষৎ আনন্দ)—পরস্পরবিরোধী এই সব মনোভাব দ্বন্দ্ব শুরু করে' দিলে তাঁর অন্তরে। উঠে দাঁড়ালেন তিনি, পায়চারি করতে লাগলেন টেবিলের সামনে। মাথার উপরে দু'হাত তুলে তিনি বার বার প্রশ্ন করতে লাগলেন, এই বন্ধুবিচ্ছেদের জন্যে দুজনের মধ্যে কে বেশী দায়ী। তারপর আলমারি খুলে বার করলেন মাধ্বী সুরা আর পদ্মরাগ-খচিত একটি পানপাত্র। প্রথম পাত্র নিঃশেষ করে' ধাতস্থ হলেন একটু। দ্বিতীয় পাত্রের পর মনে হ'ল তিনি যেন সূর্যকরোজ্জ্বল

একটা পাহাড়ের শীর্ষে দাঁড়িয়ে এই সব ঝামেলাগুলোকে নিরীক্ষণ করছেন। এইভাবে কেটে গেল খানিকক্ষণ মনোরমা মায়া-সান্ত্বনা আর মিথ্যা-সুখের মোহে অভিভূত হ'য়ে। ক্রমশঃ সমস্ত জীবনটাকেই তিনি যেন একটা সোনালী স্বপ্নের মতো দেখতে লাগলেন। তারপর একটু লজ্জিত হ'য়ে, একটু মৃদু হেসে, একটু নিঃশ্বাস ফেলে তিনি নিজের কাছে স্বীকার করলেন তাঁর ভাইটিকে তিনি যা বলেছেন তা একটু বেশী স্পষ্ট, বেশী রূঢ়। 'সে-ও সত্যি কথাই বলেছে'—অনুতপ্ত ইন্দীবর মনে মনে বললেন—'যদিও আমি সন্ন্যাসী লোক, তবু আমি সুরূপিণীকে ভালবাসি—সন্ন্যাসীর ধাঁচেই বাসি, কিন্তু বাসি যে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'

কথাটা নিজের কাছে স্বীকার করেই লাল হ'য়ে উঠল ইন্দীবরের কানের ডগা, মনে হ'ল তিনিও যেন চুরি করছেন। আবার বসে' পড়লেন চেয়ারে এবং সুরূপিণীর উদ্দেশ্যেই পান করলেন আর এক পাত্র সুরা।

পনর

সেদিন রঙ্গাবতী দেবী যখন বাইরে বেরুলেন তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে। বেলা প্রায় তিনটে। তরতর করে' সিঁড়ি দিয়ে নেবে সামনের বাগানটা হনহন করে' পার হ'তে লাগলেন তিনি। তাঁর মাথায় কাঁধে সূক্ষ্ম মসলিনের মতো খুব স্বচ্ছ, খুব সুন্দর মেঘ-বরণ একটি ওড়না উড়ছে, দামী নীলাম্বরী শাড়ির প্রান্তটা লুটিয়ে পড়েছে ধুলোয়।

সুদীর্ঘ বাগানটির অপর প্রান্তে রঙ্গাবতীর বাড়ীর কাছেই দেখা যাচ্ছে আর একটি বৃহৎ প্রাসাদ। এই প্রাসাদে প্রধান মন্ত্রী কপিঞ্জল রাজকীয় কর্তব্য নির্বাহ এবং অবসর বিনোদন করেন। রঙ্গাবতীর বাড়ি এবং এই প্রাসাদের দূরত্বটা পার্বতীসমাজের আইন অনুসারে খুব অশোভন নয়।

রঙ্গাবতী দ্রুতবেগে বাগান পার হয়ে প্রাসাদের পিছন দিকে একটি ছোট কপাটের সামনে এসে দাঁড়ালেন। কপাটে তালা বন্ধ ছিল। রঙ্গাবতী চাবি বার করে' খুললেন সেটি। খুলেই সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলেন এবং বিনা ভূমিকায় সোজা গিয়ে ঢুকে পড়লেন কপিঞ্জলের পাঠাগারে। বেশ উঁচু প্রকাণ্ড ঘরটি। চারদিকের দেওয়ালে থাকে থাকে বই, টেবিলের উপর, মেজেতে কাগজপত্র ছড়ানো, মাঝে মাঝে দু'-একটা ছবি, পরদা-টরদার বিশেষ বালাই নেই। ঘরের এক ধারে সুদৃশ্য পাথর-দিয়ে-বাঁধনো একটি অগ্নিকুণ্ডে গনগনে আঁচ উঠেছে। ঘরের ছাতের উপর থেকে প্রকাণ্ড একটি গম্বুজের ভিতর দিয়ে আলো ঢুকছে ঘরে। এরই মধ্যে বসেছিলেন মহামহিম প্রধান মন্ত্রী কপিঞ্জলদেব, একটা হাত-কাটা কামিজ পরে'। তাঁর সেদিনের কাজকর্ম প্রায় শেষ হ'য়ে গিয়েছিল, বিশ্রাম করবার জন্যে একটু ঢিলে-ঢালা ভাবে বসেছিলেন

তিনি। মনে হচ্ছিল তাঁর চেহারায়, এমন কি তাঁর প্রকৃতিতেও যেন একটা গুরুতর পরিবর্তন ঘটেছে কিছু। যে কপিঞ্জল প্রধান মন্ত্রী-রূপে কাজকর্মে লিপ্ত থাকেন তাঁর সঙ্গে ঘরোয়া কপিঞ্জলের আকাশ-পাতাল তফাত। তাঁর চোখে মুখে বিশাল বপুতে যে আনন্দোচ্ছল ভাবটা ফুটে উঠেছিল তা বেশ মানিয়েছিল তাঁকে ; স্থূলতার সঙ্গে স্ফূর্তির অদ্ভুত সমন্বয় ঘটেছিল যেন। তাঁর মন্ত্রীসুলভ মুখোশ, ধূর্ত কুটিল ভাব-ভঙ্গী কিচ্ছু ছিল না তখন। তিনি আগুনের সামনে খোশমেজাজে বসে' আরাম করছিলেন। একটা বিরাট জানোয়ার যেন রোদ পোয়াচ্ছে।

"আরে, এই যে! এলে অবশেষে—"

রঞ্জাবতীকে দেখে বলে' উঠলেন তিনি। রঞ্জাবতী কোনও উত্তর না দিয়ে এগিয়ে এসে একটা চেয়ারে বসলেন পায়ের উপর পা তুলে। তাঁর সুগঠিত পায়ের কালো মোজার খানিকটা এবং সুদৃশ্য নকশাকরা সায়ারও নীচের দিকটা প্রকট হ'য়ে পড়ল। তাঁর মার্জিত মুখচ্ছবি, আঁটসাঁট দেহের সংযত মাধুরী সহসা যেন বিজয়িনীর মতো প্রতিষ্ঠিত করল নিজেকে—ওই প্রকাণ্ড কালো শয়তান দৈত্যটার পাশে।

"বার বার তুমি আমাকে ডেকে পাঠাও"—রঞ্জাবতী বললেন—"লোকে কি বলবে বল তো! আমার বুঝি লজ্জা করে না?"

হেসে উঠলেন কপিঞ্জল।

"এ কথায় মনে পড়ল, কোথায় ছিলে তুমি বল তো। কাল সমস্ত রাত তো তুমি বাড়িতে ছিলে না।"

"না। শিবমন্দিরে পূজো দিতে গিয়েছিলাম।"

হো হো করে' হেসে উঠলেন কপিঞ্জল এবার। অনেকক্ষণ ধরে' হাসলেন, তাঁর দেহের মেদবহুল অংশগুলো হাসির ধাক্কায় থলথল করতে লাগল।

"ভাগ্যে আমার ঈর্ষা-বাতিক নেই। থাকলে অন্য রকম সন্দেহ করতুম। তুমি তো আমাকে চেনো, আমার ফুর্তির জন্যে কারও

স্বাধীনতা আমি ক্ষুণ্ণ করি না, স্বাধীনতা আর ফুর্তি দুই হাত ধরাধরি করে' চলুক আপত্তি নেই। আমি যা বিশ্বাস করি তা আঁকড়ে থাকি, সেটা খুব বড় কিছু নয় হয়তো, কিন্তু সেটা আমি আঁকড়ে থাকি। এবার কাজের কথায় আসা যাক—আমার চিঠি পড়েছ তো?"

"না, পড়তে পারি নি। খোলাই হয় নি। যা মাথা ধরেছিল—"

"ও, তাই নাকি। তবে শোন মস্ত খবর আছে। কাল সমস্ত রাত তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমি পাগল হয়ে উঠেছিলাম। আজ সমস্ত সকালও তোমার প্রতীক্ষায় ছিলাম। মস্ত খবর আছে। কাল বিকেলে আমি কাজ ফতে করেছি, নৌকা বন্দরে এসে গেছে, একটা মোক্ষম টানেই তীরে ভিড়ে যাবে এবার। তারপর আর মহারাণী আদরিণীর হুকুম তামিল করতে হবে না আমাকে। হ্যাঁ, সব ঠিক ঠাক। আদরিণী নিজের হাতে আদেশ-পত্র লিখে দিয়েছে। বুকে করে' রেখেছি সেটা। আজ ঠিক রাত বারোটার সময় মহারাজ গোবর-গণেশকে তাঁর শোবার ঘরে বিছানায় বন্দী করে' খোকার মতো পাঁজাকোলা করে' চটপট রথে তুলে ফেলা হবে। পরদিন সকালে শূলপাণি দুর্গের নির্জন কারাগারে বসে' মনোরম পার্বত্য দৃশ্য দেখবার সুযোগ পাবেন তিনি। তারপর যবনিকাপাত হবে গোবর-গণেশের রাজত্বের উপর। যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে, আদরিণী এসে যাবে আমার হাতের মুঠোর মধ্যে। এতদিন আমি তার অপরিহার্য ভৃত্য ছিলাম, এখন আমিই সর্বেসর্বা হব। বহুকাল থেকে" এবার বেশ জোর দিয়ে বললেন—"হ্যাঁ, বহুকাল থেকে এই দুরাশাটাকে প্রকাণ্ড পাহাড়ের মতো কাঁধে বয়ে' নিয়ে বেড়িয়েছি। সে পাহাড় আজ নাবল। পাহাড়ের শিখরে শিখরে এখন উষার আলো ঝলমল করছে—"

রঙ্গাবতীর মুখ শুকিয়ে গেল, দাঁড়িয়ে উঠলেন তিনি।

"সত্যি বলছ?"

"সত্যি। বর্ণে বর্ণে সত্যি। পাখি ফাঁদে ধরা পড়েছে।"

"আমি বিশ্বাস করি না। মহারাণী নিজের হাতে আদেশপত্র দিয়েছেন? অসম্ভব! এ আমি কখনও বিশ্বাস করব না কপিঞ্জল—"

"আমি দিব্যি করে' বলছি।"

"দিব্যিতে তোমার বিশ্বাস আছে? আমার তো নেই। তুমি কিসের নামে দিব্যি করবে? মদ, মেয়েমানুষ, না গান? ও-সবের কোন দাম নেই আমার কাছে"—এই বলে, রঞ্জাবতী কপিঞ্জলের আরও কাছে সরে' গেলেন। তাঁর বাহুতে হাত রেখে বললেন—"আদেশপত্রের কথা আমি বিশ্বাস করলাম না, কখনও করব না। মরে গেলেও করব না। তোমার অন্য কোনও গোপন মতলব আছে—কি সেটা তা বুঝতে পরছি না—কিন্তু তুমি যা বলছ তার একটি বর্ণ সত্য নয়।"

"আদেশটা তোমাকে দেখাব?"

"যা নেই তা দেখাবে কি করে'! আমাকে ধাপ্পা দিও না।"

"আশ্চর্য কাণ্ড! আমার কথায় তোমার বিশ্বাস হ'চ্ছে না? আচ্ছা, দেখ তবে। দেখাচ্ছি তোমাকে আদেশপত্রটা—"

একটা চেয়ারের উপর কপিঞ্জলের গায়ের জামাটা পড়ে ছিল। সেই জামার পকেট থেকে তিনি কাগজটা বার করলেন।

"পড়।"

লোলুপহস্তে কাগজটা প্রায় ছিনিয়ে নিলেন রঞ্জাবতী। পড়তে পড়তে তাঁর চোখের দৃষ্টি থেকে যেন আগুনের হলকা ছুটে বেরুল।

"বুঝেছ, একটা রাজবংশের উচ্ছেদ হ'ল, আর তা উচ্ছেদ করলাম আমি। তুমি আর আমি এবার এ রাজত্ব ভোগ করব।"

বলতে বলতে কপিঞ্জলের বুকটা যেন বেশী চিতিয়ে গেল, মাথাটা আর একটু উঁচু হ'ল, সমস্ত চেহারাটাই যেন স্ফীত হ'য়ে উঠল। তারপর একটু হেসে হাত বাড়িয়ে বললেন—"দাও, ছোরাটা দাও, রেখে দি।"

রঞ্জাবতী হঠাৎ চট্ করে' কাগজটা পিছন দিকে লুকিয়ে ঘন-ঘটাচ্ছন্ন মুখে ঘুরে দাঁড়ালেন কপিঞ্জলের চোখের দিকে চেয়ে।

"না, না। তোমার সঙ্গে একটা বোঝা-পড়া করতে চাই আগে। তুমি কি মনে কর আমি অন্ধ? কেবল একটি লোককেই এ রকম আদেশপত্র, ও দিতে পারে—যে ওর প্রেমিক। না, অস্বীকার কোরো না। তুমি ওর প্রেমিক, তুমি এই ষড়যন্ত্রে ওর সহকারী, তুমি ওর প্রভু, বুঝেছি, সব বুঝেছি আমি, তোমার ক্ষমতা যে কত তা আমার অজানা নেই। কিন্তু আমার স্থান কোথায়? আমাকে, যাকে তুমি প্রতারণা করেছ, আমাকে কোন জাহান্নমে পাঠাবে এখন!"

"ঈর্ষা! তোমার কাছে এটা প্রত্যাশা করি নি রনজু। বিশ্বাস কর, আমি মুক্তকণ্ঠে বলছি, আমি ওর প্রণয়ী নই। হয়তো হ'তে পারতাম, কিন্তু প্রেমের কথা বলতে সাহসই হয় নি আমার। মেয়েটা এমন আবছাগোছের ধোঁয়া-ধোঁয়া, এমন ছলাকলাময়ী খুকী, এমন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে—যে ওকে প্রেমের কথা বলতে সাহস হয় না। কেবল বাইরের চাপ দিয়ে ওকে আমি হাতে রেখেছি, প্রেমিক কপিঞ্জল নেপথ্যে ওত পেতে দাঁড়িয়ে আছে ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্য। কিন্তু সে প্রয়োজন হয় নি। রনজু, তুমি নিজেকে সামলাও, এ সময় এসব অগ্নিকাণ্ড চলবে না। মেয়েটাকে এই বিশ্বাসে আমি ভুলিয়ে রেখেছি যে আমি তাকে পূজো করি, সে দেবী, আমি ভক্ত সেবক। এ সময় সে যদি ঘুণাক্ষরে তোমার আমার সম্পর্কের কথা টের পায়, সে যে রকম নির্বোধ, যে রকম ন্যাকা, যে রকম হিংসুকে তাহলে সে তো সমস্ত পণ্ড করে' দেবে।"

"বক্তৃতাটি চমৎকার। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করি—কার সঙ্গে তুমি দিনের পর দিন কাটাও? আমি কাকে বিশ্বাস করব, তোমার কথাকে, না, তোমার কাজকে?"

"কি মুশকিল রনজু, তুমি কি অন্ধ? তুমি আমাকে ভাল করেই জান। আমার পক্ষে ওরকম একটা ঠুনকো পুতুলকে ভালবাসা কি

সম্ভব ? আমরা এতদিন একসঙ্গে আছি তবু তুমি যে আমাকে একটা অপদার্থ কবি বলে' ভাবছ এটা সত্যিই কষ্টকর। আমি বরাবর ঘেন্না করে' এসেছি ওই শাড়ি জামা গয়না জড়ানো ন্যাকড়ার পুতুলদের। আমি চাই রক্তমাংসের মেয়ে—তোমার মতো। তুমিই আমার উপযুক্ত সঙ্গিনী। আমার জন্যেই ভগবান তোমাকে সৃষ্টি করেছেন; তুমিই আমার আনন্দ, প্রেরণা, সব। তোমাকে ঠকিয়ে আমার লাভ কি হবে? তোমাকে সত্যিই যদি ভালো না বাসি তাহলে তোমাকে আমার প্রয়োজনই বা কি। কিছু নেই। দিনের আলোর মতো কথাটা স্বচ্ছ।"

"সত্যিই তুমি আমাকে ভালবাস কপিঞ্জল?"—রঞ্জাবতী যেন গ'লে গেলেন—"সত্যি?"

"নিশ্চয় সত্যি। আমি সবচেয়ে বেশী ভালবাসি নিজেকে। তারপর তোমাকে। তোমাকে যদি হারাই তাহলে আমি নিঃস্ব হ'য়ে যাব।"

"তাহলে"—কাগজটি পরিপাটিরূপে ভাঁজ করে' রঞ্জাবতী গম্ভীর ভাবে সেটি নিজের জামার ভিতর রাখলেন—"তাহলে আমি তোমাকে বিশ্বাস করব এবং তোমার ষড়যন্ত্রে যোগ দেব। আমার উপর নির্ভর করতে পার। রাত দুপুরে, বললে না? অঙ্গপ্রদেশের সেনাপতি ধূর্জটি সিং সঙ্গে থাকবেন, বুঝেছি। ঠিক লোককেই নির্বাচন করেছো। লোকটা কোন কিছুতেই পিছ-পা হবে না।"

কপিঞ্জল সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে।

"কাগজটা তুমি নিলে কেন। ওটা আমাকে দাও।"

"না। এটা আমার কাছে থাকবে। আঘাতটা আমিই হানব, তার জন্যে প্রস্তুতি দরকার। আমি ছাড়া এ কাজ একা তুমি করতে পারবে না। আর ব্যাপারটা ভালোভাবে করতে হলে কাগজটা আমার কাছে থাকা দরকার। ধূর্জটি সিংয়ের কোথায় দেখা পাব? তাঁর ঘরে কি?"

যদিও খুব শান্তভাবে রঞ্জাবতী কথাগুলো বলবার চেষ্টা করছিলেন তবু চাপা উত্তেজনায় তাঁর গলার স্বর কেঁপে উঠছিল মাঝে মাঝে।

"রনজু"—কঠিন দৃঢ়কণ্ঠে আদেশের সুরে কপিঞ্জল কথা কইলেন এবার। এতক্ষণ যে দিলদরিয়া ঘরোয়া ভাব ছিল সেটা লুপ্ত হ'য়ে গেল নিমেষে। কর্কশমূর্তি প্রধান মন্ত্রী আত্মপ্রকাশ করলেন।

"রনজু, কাগজটা আমি ফেরত চাইছি—এক,তুই,তিন—"

তাঁর মুখের দিকে স্পর্ধিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে' রঞ্জাবতী বললেন, "দেখ কপিঞ্জল, কোনও হুমকি আমি সহ্য করব না।"

তুজনের চেহারাই ভয়ানক হয়ে উঠল; একটা ভয়ঙ্কর নীরবতা থমথম করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে রঞ্জাবতীই নীরবতা ভঙ্গ করলেন একটা তীক্ষ্ণ অকপট হাসি হেসে।

"খোকার মতো অবুঝ হেয়ো না কপিঞ্জল। তোমার ব্যবহারে আমি অবাক্ হয়ে যচ্ছি। তুমি যা যা বললে তা যদি সত্যি হয়, তাহলে আমাকে অবিশ্বাস করবার কি কারণ থাকতে পারে, আমিই বা শুধু শুধু বিশ্বাসঘাতিনী হ'তে যাব কোন স্বার্থে! গন্ধরাজকে প্রাসাদ থেকে চুপচাপ কোন হৈইচই না করে' সরিয়ে ফেলাটাই শক্ত কাজ। তার দেহরক্ষীরা বিশ্বাসী, তার প্রধান-পরিচারক তার অন্ধ ভক্ত। একটি চীৎকারে সব নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে।"

"তাদের কাবু করতে হবে। হাত পা মুখ বেঁধে তাদেরও চালান করে' দিতে হবে মহারাজের সঙ্গে। গন্ধরাজের সঙ্গে সঙ্গে তারাও উপে যাবে।"

"সঙ্গে সঙ্গে উপে যাবে তোমার সমস্ত মতলব আর ফন্দী ফিকির। মহারাজ যখন শিকারে যান তখন এখানকার একটি চাকরকেও সঙ্গে নেন না। একটা শিশুও ধরে' ফেলবে কি হয়েছে। না, তুমি যা ভেবে রেখেছ তা একদম বাজে। বুদ্ধিটা কি আদরিণী

দিয়েছে ? এখন আমি যা বলছি শোন। তুমি বোধহয় জান গন্ধরাজ আমার প্রেমে পাগল ?”

“জানি! বেচারা গোবর-গণেশের পথে আমিই তো কণ্টক।”

“ধর, আমি যদি তাকে রাজপ্রাসাদ থেকে চুপি চুপি বার করে' এনে বাগানের কোনও নির্জন জায়গায় ভুলিয়ে নিয়ে যাই—ধর ঐ উড়ন্ত পরীটা যেখানে আছে, সেইখানে। কাছাকাছি কোনও একটা ঝোপে ধূর্জটি সিং লুকিয়ে থাকুক। মহারাজের গাড়িও থাকতে পারে মন্দিরটার পিছনে। চুপচাপ নির্বিঘ্নে হ'য়ে যাবে সব। কাক পক্ষিটি পর্যন্ত টের পাবে না। গন্ধরাজ লোপাট হ'য়ে যাবেন। কি মনে হ'চ্ছে ? আমি তোমার যোগ্য সহচরী নই ? আমার এ বুদ্ধিটা কি তুচ্ছ করবার মতো ? তোমার রনজুকে হাতছাড়া কোরো না কপিঞ্জল, তার ক্ষমতা আছে।”

কপিঞ্জল টেবিলের উপর ঘুষি মারলেন একটা।

তারপর বললেন—“ডাইনি! তোমার জোড়া সারা ভরতবর্ষে নেই। তুমি যা বললে তা চমৎকার। ব্যাপারটা চাকার মতো গড়গড় করে' গড়িয়ে যাবে।”

“তাহলে আমাকে চুমু খেয়ে ছেড়ে দাও অবিলম্বে। গোবর-গণেশকে মাৎ করে' আসি। দেরি করলে কোথাও বেরিয়ে যাবে হয়তো।”

“থাম, থাম, অত হুড়বড় কোরো না। তোমাকে বিশ্বাস করতে পারলে বেঁচে যেতাম। কিন্তু তুমি—কি বলব—এমন খামখেয়ালী, এমন চপলা—যে তোমাকে বিশ্বাস করতে সাহস হয় না। না, হয় না। তুমি যা বলছ—না, অসম্ভব সেটা।”

“তুমি আমাকে সন্দেহ করছ কপিঞ্জল।”

“কথাটা ঠিক সন্দেহ নয়। কিন্তু আমি তোমাকে চিনি। একবার ওই কাগজটা নিয়ে তুমি যদি এখান থেকে কেটে পড় —তাহলে কি যে করবে কে জানে। আমি তো জানিই না, তুমিও

জান না। তুমি যে একটি পাগলী, অনেক রকম বাঁতুরে বুদ্ধি খেলে তোমার মাথায়—"

"আমি তোমার কাছে শপথ করছি। ভগবানের নামে শপথ করছি—"

"তোমার শপথ শোনবার কৌতূহল নেই আমার"—হেসে জবাব দিলেন কপিঞ্জল।

"তুমি কি মনে কর আমার ভগবান নেই, ধর্ম নেই, আত্মসম্মান নেই? বেশ, তাহলে তোমার সঙ্গে তর্ক আর করব না। কিন্তু তোমাকে শেষবার বলছি এই আদেশপত্র আমাকে নিয়ে যেতে দাও, গন্ধরাজকে বন্দী করে দেব। কিন্তু এটা যদি আমার কাছ থেকে কেড়ে নাও, তাহলে সুনিশ্চিত জেনো সব ভণ্ডুল করে' দেব আমি। প্রকাশ করে' দেব সব। আমাকে বিশ্বাস বা ভয় যাই কর—এখনি ঠিক করে' ফেল কি করবে।"

কাগজটা বাড়িয়ে দিলেন তিনি কপিঞ্জলের দিকে।

কপিঞ্জল মুশকিলে পড়ে' গেলেন একটু, সহসা ঠিক করতে পারলেন না কি করবেন। তুটো বিপদের মধ্যে কোনটা বেশী বিপদ তা স্থির করতে পারলেন না চট্ করে'। একবার হাত বাড়িয়ে পরমুহূর্তেই আবার টেনে নিলেন হাতটা।

"বেশ"—ইতস্ততঃ করে' বললেন শেষে—"বিশ্বাস করতেই যখন বলছ, তখন—"

"বাস্, ওখানেই থেমে যাও। আর মত বোদলো না! তুমি সব না জেনেই যখন আমাকে বিশ্বাস করতে চাইছ, তখন তোমাকে সব খুলে বলছি এবার। আমি এখনি গিয়ে ধূর্জটি সিংয়ের সঙ্গে দেখা করব। কিন্তু দেখা করলেই সে আমার কথা শুনবে কেন? এই কাগজটা দেখাতে হবে। তারপর কখন আমি গন্ধরাজকে লুকিয়ে বাগানে বার করে' আনতে পারব তারই বা ঠিক কি? রাত তুপুর হ'য়ে যেতে পারে, সন্ধ্যার পরও হ'তে পারে, কিচ্ছু ঠিক নেই।

গাড়ি যদি চালাতে হয় তাহলে ঘোড়ার রাশটা আমার হাতে থাকা দরকার। এবার তোমার সঙ্গিনী বীরঙ্গনাকে বিদায় দাও। পরাইয়া দাও তারে কবচ কুণ্ডল—"

এই বলে' দুহাত প্রসারিত করে' প্রদীপ্ত দৃষ্টিতে চাইলেন তিনি কপিঞ্জলের দিকে।

"বেশ"—জড়িয়ে ধরে' চুমু খেলেন তাকে কপিঞ্জল—"প্রত্যেক লোকই ভুল করে। আমিও করলুম বোধহয়, হয়তো আমার ভুলটা খুব বেশী গর্হিত নয়। আচ্ছা, যাও এবার। মনে হ'চ্ছে দুষ্টু খুকীর হাতে একটা পটকা দিয়ে দিলুম।"

ষোল

বেরিয়েই রঞ্জাবতীর প্রথম মনে হ'ল নিজের ঘরে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চেহারাটা একটু ঠিকঠাক করে' নেওয়া দরকার। এই অভিযানের পরিণাম যাই হোক না কেন, তিনি এটা ঠিক করে' ফেলেছিলেন মহারাণী সুরূপিণীর সঙ্গে একবার দেখা করতেই হবে। যাকে কেউ পছন্দ করে না সেই নারীটির সামনে খেলো-ভাবে দাঁড়াবার বাসনা রঞ্জাবতীর ছিল না। গেলে বিজয়িনীর মতোই যেতে হবে। কয়েক মিনিট মাত্র লাগল। প্রসাধন-শিল্পে রঞ্জাবতী পারদর্শিনী। যে সব মেয়েরা একগাদা প্রসাধন দ্রব্যের প্রাচুর্যের মধ্যে অসহায় ভাবে এটা ওটা নাড়চাড়া করে' ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে শেষে সং সেজে বেরিয়ে আসেন, রঞ্জাবতী সে দলের নন। একবার তিনি ঘাড় বেঁকিয়ে আয়নার দিকে চাইলেন, একটা অলক একটু সরিয়ে দিলেন, একটু টেনে টুনে মাথার চুলকে ইচ্ছাকৃত বিশৃঙ্খলায় মনোহর করে' তুললেন, ওড়নার ভাঁজটাকে ঈষৎ এলোমেলো করে' আরও সুন্দর করে' ফেললেন, তারপর গালে ঠোঁটে সামান্য একটু রঙের ছোঁয়া, বুকে একটি হলদে গোলাপ—বাস, চমৎকার হ'য়ে গেল ছবিটি।

"এই যথেষ্ট"—পরিচারিকাকে বললেন—"আমার গাড়িটাকে আমার সঙ্গে সঙ্গে যেতে বল। রাজপ্রাসাদের সামনে সেটা যেন আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে আমার জন্যে অপেক্ষা করে।"

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গিয়েছিল। পার্বতী নগরীর দোকানে দোকানে, বীথি-ঢাকা রাস্তায় রাস্তায় জ্বলে' উঠছিল আলোকমালা। রঞ্জাবতী তাঁর অভিযানে যাত্রা করলেন পায়ে হেঁটেই। মন তাঁর আনন্দে মাতোয়ারা। কৌতূহল আর আহ্লাদের তৃপ্তিতে তাঁর রূপও যেন ডানা মেলে উড়ছে, আর সেটা তিনি অনুভবও করছেন

নিজে। ভারী ভালো লাগছে। একটি বড় জহুরীর দোকানের সামনে তিনি দাঁড়ালেন একটু, তার পরে গেলেন একটা পোশাকের দোকানের সজ্জিত বাতায়নে, দু'একটা পোশাকের প্রশংসাও করলেন। তারপর আরও এগিয়ে গেলেন। হাঁটতে লাগলেন জম্বীর-বীথি ধরে'। জম্বীর লেবুর গন্ধে বাতাস মন্থর হ'য়ে এসেছে, গাছের পত্রবহুল শাখাপ্রশাখারা মাথার উপর প্রসারিত হ'য়ে রয়েছে খিলানের মতো। ঈষৎ আলোকিত গলিগুলোর মধ্যে পথিকদের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। একটা বেঞ্চি ছিল পথের ধারে। তারই উপর বসে' পড়লেন রঞ্জাবতী। নিজের খুশীর আমেজেই বিভোর হ'য়ে রইলেন। বেশ শীত পড়েছিল, কিন্তু রঞ্জাবতী তা অনুভব করছিলেন না, তাঁর মনের ভিতরে উদ্দীপনার আগুন জ্বলছিল। জহুরীর দোকানে চুনী পান্নাগুলোর মতো তাঁর মনের চিন্তাগুলোও যেন চকমক করছিল সেই অন্ধকার নির্জনে, পথিকদের পদধ্বনি মনে হচ্ছিল সঙ্গীত।

কি করবেন তিনি? তাঁর কাছে যে কাগজটা আছে তার উপরই তো নির্ভর করছে সব। গন্ধরাজ, কপিঞ্জল, আদরিণী, আর এই গর্জনগাঁও রাজ্যটাও তাঁর নিক্তিতে ধূলোর মতোই হালকা মনে হ'তে লাগল। অনায়াসেই আঙ্গুল দিয়ে ঝেড়ে ফেলতে পারেন সব। নিজের এই সু-উচ্চ মহিমার দিকে চেয়ে নিজেই তিনি স্তব্ধ হ'য়ে বসে' রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর হঠাৎ হেসে উঠলেন—কি না করতে পারেন তিনি এখন। তুঙ্গ পর্বতশিখরে দাঁড়িয়ে যেমন মাথাটা ঘুরে যায় ক্ষমতার মদিরা পান করে' তাঁর মাথাটাও তেমনি ঘুরে উঠল। সর্বশক্তিমত্তার পাগলামি, যে পাগলামি রোমের সীজারদের পেয়ে বসেছিল, সেই পাগলামি তাঁর বিচার-বুদ্ধিকেও বিচলিত করে' ফেলল। "দুনিয়াটা কি অদ্ভুত আশ্চর্য পাগলাগারদ"—হঠাৎ মনে হ'ল তাঁর। আবার হো হো করে' হেসে উঠলেন তিনি।

মুখে আঙ্গুল ঢুকিয়ে একটি ছোট ছেলে একটু দূরে দাঁড়িয়ে বোকার মতো চেয়ে ছিল রঞ্জাবতীর দিকে। অমন হাসছেন কেন উনি। ছেলেটিকে দেখতে পেয়ে রঞ্জাবতী তাকে ডাকলেন। কিন্তু এল না সে। চোখ বড় বড় করে' দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু রঞ্জাবতী ছাড়বার পাত্রী নন। একটা ছোট ছেলে, ডাকলে আসবে না? তিনি উঠে পড়লেন। ভুলিয়ে ভালিয়ে অনেক মিষ্টি কথা বলে' নিয়ে এলেন তাকে টেনে। একটু পরেই সে তাঁর কোলের উপর বসে' তাঁর হারের চকচকে লকেটটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

"আচ্ছা খোকা, তোমার যদি একটা মাটির ভালুক আর চীনেমাটির বাঁদর থাকে কোনটাকে তুমি আগে ভাঙবে?"

"আমার তো একটাও নেই।"

"তোমাকে টাকা দিচ্ছি। কিনে নাও দুটোই। এখনি দেব টাকাটা, কিন্তু তার আগে বল কোনটা আগে ভাঙতে চাও—মাটির ভালুকটা না, চীনেমাটির বাঁদরটা--বল—"

চকচকে একটা টাকা বার করলেন রঞ্জাবতী। কিন্তু ওই উলঙ্গ ছেলেটা কোন উত্তর না দিয়ে টাকাটার দিকেই চেয়ে রইল নির্নিমেষে। রঞ্জাবতী তার মুখ থেকে যে উত্তরটা শুনতে চেয়েছিলেন তা আর পেলেন না। হতাশ হলেন একটু। তারপর তাকে ছোট্ট একটি চুমু খেয়ে তার হাতে টাকাটা দিয়ে নাবিয়ে দিলেন তাকে কোল থেকে। ছেলেটা ছুটে চলে' গেল। রঞ্জাবতীও উঠে পড়লেন। লীলায়িত গতিতে অগ্রসর হলেন প্রাসাদের দিকে।

"কোনটা আমি ভাঙব?"– ভাবতে লাগলেন তিনি; নিজের ঈষৎ-আলুলায়িত কুন্তলে মুচকি হেসে একবার হাত বোলালেন। "কোনটা?"—আকাশের দিকে সহাস্য উজ্জ্বল দৃষ্টি মেলে প্রশ্ন করলেন—"দুজনকেই কি আমি ভালোবাসি? না, কাউকেই না?

একটু?—গভীরভাবে?—না, মোটেই না? দুজনকেই? না একজনকেও না? দুজনকেই বোধহয়। কিন্তু ঐ আদরিণীকে আমি থুড়ব।"

তিনি যখন লোহার সিংহদরজা দিয়ে বাগানের সিঁড়ি দিয়ে উঠে বেদি-মণ্ডপে এসে হাজির হলেন তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। প্রাসাদের সম্মুখভাগে জানলায় জানলায় আলো জ্বলে' উঠেছে, বাইরে অলিন্দেই পিল্লাগুলিতেও বড় বড় আলো উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে। চারিদিকে আলো। এর মধ্যেও রঙ্গাবতী পশ্চিম দিগন্তের দিকে চেয়ে দেখলেন একবার। সূর্যের শেষ রশ্মির স্বর্ণাভ ছটা তখনও সম্পূর্ণ বিলীন হয় নি, সে আলোর পটভূমিকায় শোভা পাচ্ছে অসংখ্য জোনাকির নীল-সবুজ দীপালী। রঙ্গাবতী সেদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন নিস্পন্দ হ'য়ে।

ভাবতে লাগলেন—"আশ্চর্য! আমি আজ নিয়তির মতো, দৈবের মতো, অমোঘ ভাগ্যের মতো এসেছি এখানে অপ্রত্যাশিত ক্ষমতার অধিকার নিয়ে, অথচ এখনও আমি জানি না কোন পক্ষ অবলম্বন করব। আর কেউ কি এ অবস্থায় আমার মতো পক্ষপাত-হীন থাকতে পারত? কিন্তু ভগবান আমাকে সমদর্শী করেছেন, যা ন্যায়সঙ্গত তাই আমি করব।"

গন্ধরাজের ঘরের জানলার আলো উজ্জ্বলতম। সেদিকে চেয়ে রঙ্গাবতীর মনটা ধীরে ধীরে কোমল হ'য়ে এল, একটু যেন বেদনাও জাগল।

"সবাই যাকে ত্যাগ করেছে তার মনের অবস্থাটা কি রকম হয়? আহা, বেচারী। ওর আদরিণী যে কত বড় জাতসাপ তা ওকে জানান দরকার। সেই জন্যেই এই আদেশপত্রটা ওকে দেখাতে হবে। মুখে বললে বিশ্বাসই করবে না—"

আর কালবিলম্ব না করে' তিনি প্রাসাদে ঢুকে পড়লেন। প্রতিহারীকে বললেন তিনি মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে চান।

প্রতিহারী বলল—"মহারাজা তাঁর নিজের ঘরে আছেন। তিনি বলেছেন, তিনি একা থাকতে চান, কারো সঙ্গে দেখা করবেন না।" তবু রঞ্জাবতী তাঁর নামটা লিখে পাঠিয়ে দিলেন। সে ফিরে এসে বলল—"মহারাজ আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন, তাঁর এখন কারো সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা নেই।"

"তাহলে এই চিঠিটা নিয়ে যাও—"

একটা কাগজে খসখস করে' লিখলেন, "জীবন-মরণ সমস্যা। মহারাজ সাহায্য করুন আমাকে। আপনি ছাড়া আর কেউ আমাকে সাহায্য করতে পারবেন না।"

এবার প্রতিহারী তাড়াতাড়ি ফিরে এসে তাঁকে ডেকে নিয়ে গেল। মহারাজা গন্ধরাজ কৃপা করে' রঞ্জাবতী দেবীর সঙ্গে দেখা করতে সম্মত হলেন।

গন্ধরাজ অস্ত্রাগারে বসে ছিলেন। বিরাট অস্ত্রাগার। বিচিত্র আলোকে নানারকম অস্ত্র চারিদিকে চকমক করছিল। কেঁদে কেঁদে গন্ধরাজের চোখ মুখ ফুলে গিয়েছিল। বড়ই খারাপ দেখাচ্ছিল তাঁকে। বড়ই বিষণ্ণ এবং বিরক্ত। রঞ্জাবতী যখন প্রবেশ করলেন তখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন না পর্যন্ত। নমস্কার করে' প্রতিহারীকে চলে' যেতে বললেন শুধু। যে মমতা রঞ্জাবতী-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, যে মমতা বরাবর তাঁর হৃদয় এবং বিবেককে নিয়ন্ত্রিত করেছে, সেই মমতা সহসা তাঁকে অভিভূত করে' ফেলল। অসহায় দুর্বল গন্ধরাজকে যেন সম্পূর্ণ দেখতে পেলেন তিনি। মনে হ'ল ও যেন একেবারে নিঃস্ব হ'য়ে গেছে! রঞ্জাবতী নিমেষেই ঠিক করে' ফেললেন এখন কি ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে তাঁকে। তিনি তাঁর দিকে এক পা এগিয়ে অপূর্ব ভঙ্গীতে বললেন—"উঠুন।"

"রঞ্জাবতী, তুমি তোমার চিঠিতে জীবন-মরণের কথা লিখেছ। কার জীবন বিপন্ন? পৃথিবীতে এমন কে দীন হীন রিক্ত আছে যাকে গর্জনগাঁওয়ের গন্ধরাজও সাহায্য করতে পারে?"

"প্রথমে ষড়যন্ত্রকারীদের নাম শুনুন; মহারাণী স্বরূপিণী এবং প্রধান মন্ত্রী কপিঞ্জল দেও। বাকিটা আন্দাজ করতে পারছেন না?"

গন্ধরাজ চুপ করে রইলেন।

রঞ্জাবতী বললেন—"আপনারই জীবন বিপন্ন। আপনার ধর্ম-পত্নী এবং আমার মহাপ্রভু দুজনে ষড়যন্ত্র করে' আপনাকে নির্বাসন দণ্ড দিয়েছে। কিন্তু তারা আমাকে আপনাকে চেনে না তাই তাদের এই ধৃষ্টতা। রাজনীতি আর প্রণয়ে দল গড়তে হয়, আমরাও গড়ব মহারাজ। ওদের হাতে টেক্কা আছে কিন্তু আমরা রং দিয়ে তুরুপ করব। আসুন, দেখাব আপনাকে তাস?"

"খুলে বল। আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না।"

"দেখুন তাহলে—"

আদেশপত্রটা বার করে' দিলেন রঞ্জাবতী।

গন্ধরাজ সেটা পড়ে' চমকে উঠলেন, তারপর নীরবে নিজের মুখের সামনে হাতটা রাখলেন। একটি কথা বেরুল না তাঁর মুখ দিয়ে। রঞ্জাবতী হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

"সে কি! আপনি নত মস্তকে এ আদেশ মেনে নেবেন? আপনার প্রতি ও মেয়ের দয়ামায়া প্রেম কিচ্ছু নেই। দুধের ভাঁড়ে কি মদ থাকে? মুছে ফেলুন ওই শেলেটের লেখা, মানুষের মতো উঠে দাঁড়ান। হ'তে পারে ওদের হাতে ক্ষমতা আছে, হ'তে পারে ওরা সিংহ-সিংহিনী কিন্তু তবু বলছি ইঁদুর হয়েও আমরা ওদের ওই ষড়যন্ত্রের জাল টুকরো টুকরো করে' দিতে পারি। কাল রাত্রে, যখন কিছুই বিপন্ন হয় নি, যখন সবটাই নিছক কৌতুক আর মজা ছিল তখন তো আপনি বেশ তৎপর হ'য়ে উঠেছিলেন। এখন মুষড়ে পড়ছেন? এ কৌতুকটা যে আরও জমজমাট, আরও জীবন্ত। উঠে দাঁড়ান।"

গন্ধরাজ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন। লাল হ'য়ে উঠল মুখটা।

"রঞ্জাবতী, সব বুঝতে পারছি, আমি অকৃতজ্ঞ নই। এটা যে তোমার অকৃত্রিম বন্ধুত্বের নিদর্শন তা আমি জানি। কিন্তু রঞ্জাবতী, তুমি যা আমার কাছে আশা করছ, তা আমি পারব না। তুমি আশা করছ আমি প্রতিবাদ করব, আমি বাধা দেব। কিন্তু কেন দেব? দিয়ে কি লাভ হবে। যে ভুলে স্বর্গের শেষ সীমাটাকে এখনও আমি বোকার মতো আঁকড়ে ছিলাম এই আদেশপত্র পড়বার পর সেটাও চুরমার হ'য়ে গেল। এখন গর্জনগাঁওয়ের মহারাজার নামের সঙ্গে এক নিশ্বাসে লাভ-ক্ষতির আলোচনা কি হাস্যকর নয়? আমার কোন দল নেই, শাসন-প্রণালী নেই, অহঙ্কার নেই। বড় গলা করে' বলবার মতো কিছুই যে নেই আমার। তবে কেন তুমি প্রত্যাশা করছ আমি এর বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে এগিয়ে যাব? কোন নীতি অনুসারে যাব কি লাভ হবে তাতে? কিংবা তুমি কি চাও বন্দী নেউলের মতো ব্যর্থ আক্রোশে আমি খামচাখামচি কামড়াকামড়ি করব? না, রঞ্জাবতী। যারা তোমাকে পাঠিয়েছে তাদের গিয়ে বল, আমি নির্বাসনে যেতে প্রস্তুত এ নিয়ে আমি কোন লজ্জাকর কোলাহল করতে চাই না। আমি যাব।"

"আপনি যাবেন? স্বেচ্ছায় যাবেন?"

"স্বেচ্ছায় নয় অবশ্য। কিন্তু যাব, যত শীঘ্র সম্ভব যাব। অনেক দিন থেকেই আমি বাইরে যেতে চাইছিলুম। সে সুযোগ তো এসে গেল। আমি প্রত্যাখ্যান করব কেন? ভগবান আমাকে কিঞ্চিৎ রস-বোধ দিয়েছেন, আমি এই প্রহসনকে বিয়োগান্ত নাটকের রূপ দেবার চেষ্টা করব না।"

আদেশপত্রটা টেবিলের উপর ছিল, তিনি আঙুলের টোকা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিলেন সেটাকে।

তারপর সাড়ম্বরে বললেন—"ওদের জানিয়ে দিতে পার আমি যেতে প্রস্তুত আছি—"

"মুখে স্বীকার না করলেও মনে মনে আপনি রেগেছেন মনে হচ্ছে।"

"আমি? রেগেছি? বাজে কথা। রাগবার কোনও কারণ নেই আমার। প্রতিপদে সবাই আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে আমি দুর্বল, আমি অস্থির, আমি খেয়ালী—আমি সমাজে বাস করবার অযোগ্য। আমি নানারকম দুর্বলতার আকর, আমি নপুংসক মহারাজা, আমি ভদ্রলোক কিনা তাতেও সন্দেহ আছে। তুমি আমার উপর প্রসন্ন, কিন্তু তুমিও দুবার আমাকে আমার লঘুতার জন্য বকুনি দিয়েছ। এতে কি আমি রাগ করব? এদের নির্মমতায় আমার কষ্ট হ'চ্ছে, কিন্তু এরা কেন যে এমনভাবে কোপ মারতে উদ্যত হয়েছে তা আমি বুঝতে পারছি, ততটুকু সাধারণ বুদ্ধি আমার আছে। আমি অপদার্থ, আমি অকেজো, তাই ওরা আমাকে সরিয়ে দিতে চায়। ওদের দোষ দিতে পারি না।"

"এসব কার কাছ থেকে শুনেছেন?" সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন রঞ্জাবতী—"আপনি অপদার্থ? আপনি অকেজো? দেখুন মহারাজ, আপনার রূপ আর যৌবন যদি না থাকত তাহলে আপনার মুখদর্শন করতাম না আমি। পুরুষের মুখে ওসব বিনয় বচন অসহ্য। নগণ্য সাধারণ লোকেরাও এতটা করে না। এই অকৃতজ্ঞতা—"

"ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা কর রঞ্জাবতী"—গন্ধরাজের মুখে যেন ছায়া নামল—"কৃতজ্ঞতার কোন প্রশ্নই ওঠে না এতে—আত্ম-সম্মানেরও নয়। তুমি কেন কিভাবে এখানে এসেছ তা বুঝতে পারছি না ঠিক, কিন্তু আমার প্রতি তোমার করুণাই যে প্রধান কারণ তাতে আমার সন্দেহ নেই, কিন্তু এর সঙ্গে আমার নিতান্ত ব্যক্তিগত পারিবারিক ঘটনাও জড়িয়ে গেছে যার পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর একমাত্র আমিই জানি। তোমার পক্ষে জানা সম্ভব নয় যে আমার স্ত্রী, তোমার মহারাণী, কি দুঃখ ভোগ করেছে। তাই তুমি এমন

কি আমিও, ওর আচরণের বিচার করতে পারি না—করতে গেলে সেটা অন্যায় হবে। আমি আমার অক্ষমতা আমার অপরাধ স্বীকার করছি। যদি না করতাম তাহলে আমার ভালবাসার কি মূল্য থাকত? যাকে ভালবাসি তার কাছে যদি সামান্য নতি-স্বীকার করতে না পারি তাহলে তো সে ভালবাসা মৌখিক ভান মাত্র। সাধারণ বইতেও তো লেখা আছে যে প্রণয়িনীকে তুষ্ট করবার জন্য প্রয়োজন হ'লে মৃত্যুবরণ করাও উচিত। আমি কারা-বরণ করছি এটা কি খুব বেশী এমন একটা কিছু?"

"প্রণয়? প্রণয়ের সঙ্গে কারাবরণের কি সম্পর্ক থাকতে পারে!" রঞ্জাবতী দেওয়াল এবং ছাতকেই যেন প্রশ্নটা করলেন —"ভগবান সাক্ষী, প্রণয়ের সম্বন্ধে আমারও কিছু অভিজ্ঞতা আছে, আমার জীবনই তার জীবন্ত প্রমাণ। কিন্তু যে প্রেম প্রতিদান দেয় না আমি জানি তা প্রেমই নয়—তা অসার, ফাঁকি, মায়া, মরীচিকা।"

"রঞ্জাবতী, প্রেমকে আমি ওরকম দান-প্রতিদানের মাপকাঠিতে মাপতে শিখি নি, যদিও আমি স্বীকার করছি একজন মহিলার কাছে ওই মাপকাঠিতেই আমি অশেষ ঋণী হ'য়ে আছি। কিন্তু এসব আলোচনা বৃথা। প্রেম নিয়ে এখানে আমরা কবির লড়াই করছি না, গবেষণাও করছি না।"

"তবু একটা জিনিস আপনি ভুলে যাচ্ছেন। আজ উনি কপিঞ্জলের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে' আপনার স্বাধীনতা হরণ করছেন, কাল আপনার সম্মানকেও কলঙ্কিত করতে পারেন।"

"আমার সম্মান?"—কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করলেন গন্ধরাজ— "তুমি স্ত্রীলোক হ'য়ে একথা বলছ? আশ্চর্য লাগছে শুনে। আমি যদি তার ভালবাসা অর্জন করতে না পেরে থাকি, স্বামী হিসেবে যদি আমি ব্যর্থ হ'য়ে থাকি তাহলে আর বাকী কি রইল? এই শোচনীয় পরাজয়ের মধ্যে কোন মুখে আমি কোন সম্মান দাবি করব তা তো

জানি না। না, সব শেষ হ'য়ে গেছে। আমি এখন অপরিচিত অচেনা লোকের দলে পড়ে' গেছি। আমার স্ত্রী যদি আমাকে ভাল না বাসে তাহলে আমি কারাগারেই যাব, এই যখন তার ইচ্ছে। সে যদি আর কাউকে ভালবেসে থাকে তাহলে কারাগারই তো আমার ঠিক স্থান! আমার পক্ষে ওর চেয়ে ভালো জায়গা আর কোথা আছে পৃথিবীতে। তাছাড়া দোষ তো আমারই। আজকালকার অনেক মেয়েমানুষের মতো তুমিও পুরুষের ভাষায় কথা কইতে শিখেছ। আমার যদি পদস্খলন হ'ত (ভগবান জানেন, হওয়া খুবই সম্ভব ছিল) তাহলে আমি ভয়ে কাঁপতাম কিন্তু এ-ও বলছি এর জন্যে তার কাছে মাপ চাইতাম, আশাও করতাম যদি সে ক্ষমা করে, যদিও সে আশা হয়তো দুরাশা হ'ত—হয়তো—"

হঠাৎ থেমে গেলেন গন্ধরাজ। তারপর একটু বিরক্তিভরে বললেন, "দেখ রঞ্জাবতী, কোনও স্বামীর অসারতা, অতি নমনীয়তা বা বাজে রসিকতা যদি কোনও স্ত্রীর পক্ষে অসহ্য হয়, যদি তার ধৈর্য ভেঙে পড়ে তাহলে তাকে ভুল বিচার করবার অধিকার আমি কাউকে দেব না। সে স্বাধীন, পুরুষটার মধ্যেই গলদ ধরা পড়েছে—"

"সে আপনাকে ভালবাসে না বলে' গলদ আপনার! আপনার জানা উচিত ভালবাসবার ক্ষমতাই তার নেই।"

"বরং বলা উচিত আমি তার মনে ভালবাসা জাগাতে পারি নি। আমারই সে ক্ষমতা নেই—"

"মহারাজ, অপরাধ নেবেন না, কিন্তু আমার মনে তো আপনি ভালবাসা জাগিয়েছেন। আমি আপনাকে ভালবাসি।"

"রঞ্জাবতী, তুমি করুণাময়ী"—হেসে উত্তর দিলেন গন্ধরাজ— "তুমি আমার উপর করুণা করেছ। কিন্তু এসব তর্ক বৃথা। কি করব আমি তা ঠিক করে' ফেলেছি। স্পষ্ট কথা বলছি—স্পষ্ট-বাদিতায় অবশ্য তুমিও কম যাও না—স্পষ্ট কথাটা হ'চ্ছে ব্যাপারটা

আমি বুঝতে পেরেছি, এ সুযোগ আমি ছাড়ব না। দুঃসাহসে আমি পিছপা হই নি কখনও। এখানে আমি একটু বেকায়দায় পড়ে' গেছি—সবাই বলছে রাজা হিসেবে আমি বেমানান। এখানে কেমন যেন রংছুট হ'য়ে আছি। তার চেয়ে সরে' পড়াই কি ভালো নয়? আমার এই বেপরোয়া ভাব তুমি অনুমোদন করবে না?"

"মহারাজ, আপনি যদি মনস্থির করে' থাকেন আমি আপনাকে ফেরাবার চেষ্টা করব না। কেন করব? বেহায়ার মতো একটা কথা বলছি আপনি গেলে আমারই তো সুবিধে। যান তাহলে, আমার বুকটা অবশ্য ভেঙে যাবে, আমার মনটা হয়তো আপনার পিছু পিছু ছুটবে, আপনার কষ্টের কথা ভেবে হয়তো রাত্রে আমার ঘুম হবে না, কিন্তু তবু আমি আপনাকে বারণ করব না। আপনার সাংসারিক বুদ্ধি কিচ্ছু নেই, তবু স্বীকার করছি আপনি রাজা, আপনি বীর!"

"রঞ্জাবতী, তুমি যে টাকাটা আমাকে দিয়েছিলে তা নেওয়া আমার ঠিক হয় নি। কিন্তু তোমার অনুরোধ কিছুতেই এড়াতে পারি নি কাল। যাক্, তোমাকে এর বদলে যে কিছু দিয়ে যেতে পারব এইটেই আমার সান্ত্বনা এখন।"

গন্ধরাজ একটা তাক থেকে কয়েকটা দলিল নিয়ে এলেন।

"এই নাও। তোমার টাকা দিয়ে যে খামারটা কিনেছি তার দলিল। তুমিই রাখ এটা। আমাকে যেখানে যেতে হবে সেখানে তো এসব আমার কাজে লাগবে না। অন্য কোনও উপায়ে তোমার ঋণ পরিশোধ করতে পারব এ সম্ভাবনাও আর নেই এখন। তুমি মহৎ বলেই কোন রসিদ না নিয়ে আমাকে টাকাটা দিয়েছিলে। আমি ভেবেছিলাম—কিন্তু এখন চাকা ঘুরে গেছে। গর্জনগাঁওয়ের মহারাজার সৌভাগ্যসূর্য অস্ত যাচ্ছে। এই দলিলটা রাখ, আমি তোমাকে যতদূর জানি তাতে আশা করি এটা নিতে তুমি দ্বিধা করবে না, কারণ তোমাকে দেবার আর আমার কিছুই নেই। সরল

গৃহস্থ কীর্তিভূষণ নিরাপদে তার গৃহস্থালী চালাতে পারবে আর আমাকে টাকা দিয়ে আমার বান্ধবীও যে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি এ কথা ভেবে আমি আনন্দ পাব।"

"মহারাজ, আমি যে কি জঘন্য অবস্থায় পড়েছি তা কি আপনি বুঝতে পারছেন না? আপনার পতনের উপরই আমার উন্নতি নির্ভর করছে।"

"আমাকে প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করে' তুমি তোমার মহান চরিত্রেরই পরিচয় দিয়েছ রঞ্জাবতী। জেনে রাখ, এসব সত্ত্বেও আমাদের সম্বন্ধ যেমন ছিল তেমনি থাকবে। এইবার মহারাজা হিসেবে শেষ আদেশ তোমাকে করব—এটা নাও।"

এই বলে' জোর করে' তিনি দলিলের কাগজগুলো তাঁর হাতে গুঁজে দিলেন।

"এগুলো ছুঁতেও ঘেন্না করছে আমার!"

এর পর নীরবতা ঘনিয়ে এল কয়েক মুহূর্তের জন্য।

গন্ধরাজ হঠাৎ বললেন—"তুমি কি জান কখন আমাকে ওরা বন্দী করবে?"

"মহারাজ, যখনই ইচ্ছে করবেন তখনই। কিংবা আপনি যদি ইচ্ছা করেন ওই আদেশপত্রটা ছিঁড়ে ফেলুন—তাহলে কখনই ওরা আপনাকে বন্দী করতে পারবে না।"

"না, তা করব না। দেখ আমার ইচ্ছা, যত শীঘ্র ব্যাপারটা চুকে যায় ততই ভালো। আমি শুধু সুরূপিণীকে একটা চিঠি লিখে রেখে যেতে চাই।"

"মহারাজ, আমি আপনাকে প্রতিবাদ করতে বলেছি, আমার ইচ্ছে আপনি রুখে দাঁড়ান। কিন্তু তাতে যখন আপনি সম্মত নন, আপনি যখন তস্করদের সামনে বোবার মতো দাঁড়িয়ে থাকাটাই ভালো মনে করছেন—তাহলে আপনাকে বন্দী করার ব্যাপারটার ভার আমাকেই নিতে হয়। আমি ওদের বলেছিলাম"—একটু

ইতস্ততঃ করে' বললেন—"আমি ওদের বলেওছিলাম যে আপনাকে ধরিয়ে দেব, তাই এই আদেশপত্রটা ওরা আমাকে দিয়েছিল, কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমার উদ্দেশ্য ছিল আপনাকে সাহায্য করা। কিন্তু আপনি আমার সাহায্য যখন নিতে চাইছেন না, তখন আমাকে একটু সাহায্য করুন। আপনার যখন সুবিধা হবে তখন আপনি তাহলে ওই উড়ন্ত পরীর কাছে গিয়ে দাঁড়াবেন—কাল যেখানে গিয়েছিলেন। এতে আপনার অসুবিধা হবে না, আমাদের কিন্তু সুবিধে হবে।"

"নিশ্চয়ই যাব। সাগরে ঝাঁপ দেবই যখন ঠিক করেছি, তখন কোন ঘাট থেকে দেব তা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না। তুমি এখন যাও তাহলে, আমার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ গ্রহণ কর। আমি চিঠিটা লিখেই যাব ওখানে। উড়ন্ত পরীর সামনেই দেখা হবে আবার। আজ আশা করি কালকের মতো ছদ্মবেশ থাকবে না কোনও।"

গন্ধরাজ একটু হাসলেন।

রঞ্জাবতী চলে' যাবার পর খানিকক্ষণ নিজের সমস্ত শক্তি সংহত করে' আত্মসংবরণ করলেন গন্ধরাজ। তিনি ভাবতে লাগলেন যে নিদারুণ হীন অবস্থার মধ্যে তিনি পড়েছেন, কি করে' আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে তার থেকে এখন উত্তীর্ণ হ'তে পারা যায়। নির্বাসনের কথা শুনে তিনি একটুও বিচলিত হন নি। কিন্তু ইন্দীবরের সঙ্গে আলাপ করে' তিনি বড়ই আহত, বড়ই অপমানিত বোধ করছিলেন। এর পর নির্বাসনের খবরটা যেন মুক্তির বার্তা নিয়েই এল, তিনি যেন আরাম পেলেন একটু। তাঁর মনে হ'ল এটা তো নির্দোষ পথ, এ পথে গেলেই তাঁর সব জ্বালা যন্ত্রণার অবসান হবে। তিনি সুরূপিণীকে চিঠি লিখতে বসলেন। হঠাৎ মনের মধ্যে ক্রোধের আগুন জ্বলে' উঠল। তাঁর অতীত জীবনের ক্ষমা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতার কাহিনীগুলো বিকট ভাবে মনে পড়তে

লাগল একে একে, আরও বিকট মনে হ'ল যখন ভাবলেন এসবের প্রতিদানে কি উদাসীনতা, কি অহঙ্কার, কি নিষ্ঠুরতার প্রকাশ রূপায়িত হয়েছে স্বরূপিণী-চরিত্রে। যে কলম দিয়ে লিখছিলেন সেটা কাঁপতে লাগল। সহসা বিস্মিত হ'য়ে তিনি আবিষ্কার করলেন তাঁর আত্মসমর্পণের ভাব অন্তর্হিত হয়েছে, সে ভাব একদম তাঁর নাগালের বাইরেই চলে' গেছে। আর ফিরবে না। তিনি মাত্র কয়েকটি উত্তপ্ত শব্দ লিখে, ক্ষিপ্ততাকে প্রেমের মর্যাদা দিয়ে আর ক্রোধকে ক্ষমার কৌলীন্যে ভূষিত করে' তাঁর বিদায়পত্র শেষ করলেন। তারপর ঘরটার চারিদিকে একবার চেয়ে দেখলেন, যে ঘর এতদিন তাঁর নিজের ঘর ছিল, কিন্তু যা আর তা থাকবে না। তারপর বেরিয়ে পড়লেন। প্রেমে অভিভূত হ'য়ে ? না, অহঙ্কারে ?

যে গোপন পথ দিয়ে তিনি প্রায়ই যাতায়াত করতেন সেই পথেই বেরিয়ে পড়লেন তিনি। প্রহরী তাঁকে বাইরে নিয়ে গেল। বেরিয়েই তিনি রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলেন। রাত্রির অন্ধকারকে উন্মনা করে' হু হু করে' বইছে ঠাণ্ডা হাওয়া, আকাশ-ভরা তারা হাসি-ভরা চোখে চেয়ে আছে। মনে হ'ল এরা যেন অভ্যর্থনা করল তাঁকে। চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখলেন। মাটির গন্ধ উঠছে, ফুলের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে, বুক ভরে' নিঃশ্বাস টেনে নিলেন। আবার আকাশের দিকে চাইলেন। মন শান্ত হ'ল। তাঁর স্ফীত ক্ষুদ্র জীবনটা এই বিরাটের মধ্যে বিলীন হ'য়ে গেল যেন। যিনি একটু আগে নিজেকে বহ্নিগর্ভ শহীদ মনে করছিলেন, তিনি বিশাল আকাশের দিকে চেয়ে ভাবলেন আমি কত ক্ষুদ্র। তাঁর মনের ক্ষতে প্রলেপ পড়ল। বাইরের দুরন্ত হাওয়া মহাকাশের অনাবিল শান্তি নীরব সঙ্গীতের মতো যেন তাঁর অহঙ্কারকে বিলীন করে' প্রসন্নতায় ভরে' দিল চিত্তকে।

"বেশ, আমি তাকে ক্ষমা করলুম"—বলে' উঠলেন তিনি—"আমার ক্ষমা যদি তার কাজে লাগে আমি ক্ষমা করলুম তাকে।"

তারপর দ্রুতপদে তিনি বাগানটা পেরিয়ে সেই ফাঁকা জায়গাটায় এসে পড়লেন যেখানে উড়ন্ত পরীটা ছিল। বেদির পাশে অন্ধকারে অপেক্ষা করছিলেন একজন। তিনি বেরিয়ে এলেন সঙ্গে সঙ্গে।

"আমায় ক্ষমা করবেন। আমি বিদেশী। নূতন বাহাল হয়েছি, আপনাকে ঠিক চিনি না। যদি আপনি মহারাজা গন্ধরাজ হ'ন তাহলে আপনি নিশ্চয় জানেন আমি কেন এখানে আপনার অপেক্ষা করছি।"

"ধূর্জটিপ্রসাদ কি আপনার নাম?"

"শ্রীমান ধূর্জটিপ্রসাদ সিংহ। যে কাজ করতে আমাকে আদেশ করা হয়েছে, সেটা একটু কঠিন কাজ। তা যে এমন নির্বিঘ্নে এমন সহজ ভাবে হ'য়ে যাবে তা ভাবি নি। কাছেই গাড়ি অপেক্ষা করছে। আমি কি মহারাজের অনুসরণ করব?"

"সেনাপতি, আমি এখন জীবনের সেই মধুর মুহূর্তে উপনীত হয়েছি যখন আমি আদেশ শুনব, আদেশ করব না।"

"বাঃ, এ তো কবির মতো উক্তি। মনে হ'ল যেন বিদ্যাপতির কবিতা শুনলাম। চমৎকার! মহারাজ আপনার সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক নেই, এ রাজ্যের কারও সঙ্গে নেই। থাকলে আমি এ কাজের ভার নিতাম না হয়তো। কিন্তু চাকরি যখন গছেছি তখন কপিঞ্জলদেবের আদেশ আমাকে শিরোধার্য করতে হয়েছে, অবশ্য আমার দিক দিয়ে এতে কোন অশোভনতা নেই, সৈনিকের পক্ষে এরকম কাজ অস্বাভাবিকও নয়। আর মহারাজ যখন এটা সহজ ভাবে নিয়েছেন তখন মনে হ'চ্ছে আমাদের সময় ভালই কাটবে। কারারক্ষীও তো বন্দী এক হিসেবে।"

"একটা কথা জানতে পারি কি? এ কাজে তো প্রশংসা নেই, এ কাজ বিপদও ডেকে আনতে পারে। তবে কেন আপনি এ কাজ নিতে রাজী হলেন।"

"আপনার কৌতূহল স্বাভাবিক। আমার বেতন দ্বিগুণ করে' দেওয়া হয়েছে।"

"ও! যাক্, আমি সমালোচনা করব না। ওই যে গাড়িটা দেখতে পেয়েছি—"

একটু দূরেই চার ঘোড়ার গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল গলির মোড়ে। গাড়ির আলোগুলো দেখেই বোঝা যাচ্ছিল এ সাধারণ গাড়ি নয়। আরও একটু দূরে গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়েছিল কুড়ি জন সশস্ত্র প্রহরী।

সতেরো

রঙ্গাবতী গন্ধরাজের কাছ থেকে বেরিয়ে সোজা চলে' গিয়েছিলেন ধূর্জটি সিংহের কাছে। কি করে' মহারাজকে বন্দী করতে হবে তা তাঁকে বুঝিয়ে বলেই ক্ষান্ত হন নি তিনি। উড়ন্ত পরীর জায়গাটা ঠিক কোথায় তা দেখাবার জন্যে গিয়েছিলেন তিনি ধূর্জটি সিংকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর বাহু-লগ্ন হ'য়ে। ধূর্জটি সিংহের বুকের রক্তে দোলা দিয়ে তিনি যে সব কথাবার্তা বলছিলেন তা মনে হচ্ছিল যেন সেতারে গতের আলাপ। সত্যিই রঙ্গাবতী একটু উত্তেজিত হয়েছিলেন। আনন্দ এবং উদ্দীপনার ঝঞ্ঝায় যেন নিজেকে ঠিক রাখতে পারছিলেন না তিনি। হাসতে গিয়ে কথা আটকে যাচ্ছিল, চোখের দৃষ্টি থেকে ঠিকরে পড়ছিল অসামান্য দ্যুতি, যে রং তাঁর মুখ-শোভা থেকে অনেক দিন অন্তর্হিত হয়েছিল তাও যেন ফিরে এসেছিল তখন। অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিল তাঁকে। যদিও কথাটা ভাবতে তাঁর ঘৃণা হচ্ছিল তবু তিনি আশঙ্কা করছিলেন আর একটু পরেই ধূর্জটি সিং হয়তো নতজানু হ'য়ে বসে' পড়বেন তাঁর সামনে।

উড়ন্ত পরীর কাছেই একটা প্রকাণ্ড হাস্নুহানার ঝাড় ছিল। তারই আড়ালে লুকিয়ে রঙ্গাবতী নিরীক্ষণ করতে লাগলেন কি রকম ভদ্রতা সহকারে ধূর্জটি সিং গন্ধরাজকে বন্দী করছেন। তাঁরা দুজনে কথা কইতে কইতে এগিয়ে গেলেন, তারপর তাঁদের কথাবার্তা আর শোনা গেল না। একটু পরেই গাড়ির চাকার শব্দ আর অশ্বের ক্ষুর-ধ্বনি বিঘ্নিত করল নৈশ নীরবতাকে। সে শব্দও ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হ'য়ে এল। গন্ধরাজ চলে' গেলেন।

রঙ্গাবতী তখন আকাশের দিকে চেয়ে দেখলেন। না, রাত খুব বেশী হয় নি। এখনও দেখা হ'তে পারে। দ্রুতবেগে তিনি প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগলেন। ভয় হ'তে লাগল কপিঞ্জল এসে পড়ে

নি তো। বেগ আরও বেড়ে গেল এ কথা ভেবে। তিনি প্রাসাদে পৌঁছেই প্রতিহারিণীকে বললেন খুব জরুরী ব্যাপারে মহারাণীর সঙ্গে এখনি দেখা করা দরকার। কপিঞ্জলদেও তাকে পাঠিয়েছেন। এমনি গেলে মহারাণী হয়তো দেখা করতেন না, কিন্তু কপিঞ্জলের দূতীকে তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না।

সুরূপিণী একটা টেবিলের সামনে বসে' খাওয়ার ভান করছিলেন। তাঁর গালে চোখের জলের দাগ, চোখ ফোলা ফোলা। তিনি ঘুমোন নি, খান নি। এমন কি তাঁর বেশবাসও বিস্রস্ত। মনে হচ্ছিল তিনি যেন শুকিয়ে গেছেন। তাঁর চেহারা, তাঁর মন সবই যেন বিকল, বিবেকের তাড়নায় তিনি যেন বিধ্বস্ত। রঞ্জাবতী তাঁর এই চেহারার সঙ্গে নিজের চেহারার তুলনা করে' একটু যেন খুশী হলেন।

"প্রধান মন্ত্রীর কাছ থেকে এসেছেন আপনি। বসুন। কি বলবার আছে বলুন।"

"কি বলবার আছে?"—রঞ্জাবতী পুনরাবৃত্তি করলেন কথাগুলো—"অনেক কিছু বলবার আছে। অনেক কিছু যা বলতে ইচ্ছে করছে না, অনেক কিছু যা গোপন রাখা উচিত কিন্তু যা আমাকে বলতে হবে। আমি রামায়ণের দুর্মুখের মতো, অনেক অপ্রিয় কাজ আমাকে করতে হয়। যা বলব, নিরপেক্ষভাবে বলবার চেষ্টা করব। আমি মহারাজের কাছে আপনার আদেশপত্র নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেন নি। তিনি বলে' উঠলেন—রঞ্জাবতী এ অসম্ভব—এ হ'তে পারে না—আমি ভুল দেখছি, ভুল পড়ছি। তুমি নিজের মুখে বল। আমার স্ত্রীকে ওরা ভুলিয়ে ভালিয়ে হাত করেছে, তার বুদ্ধি নেই, কিন্তু এত নিষ্ঠুর সে নয়। আমি বললাম, মহারাজ, আপনার স্ত্রী তরুণী সেইজন্যেই তিনি নিষ্ঠুর। হাতের কাছে আর কিছু না পেলে যুবতীরা পাখা দিয়ে মাছিও মারে—"

"রঞ্জাবতী দেবী"—তীক্ষ্ণ অকম্পিত কণ্ঠে বললেন সুরূপিণী, তাঁর মুখে ক্রোধের রক্তিমা ফুটে উঠল—"কে আপনাকে পাঠিয়েছে এখানে? কেন এসেছেন? কি প্রয়োজন আপনার?"

"আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি কেন এসেছি। আপনার মতো বৃহৎ আদর্শ আমার সামনে নেই। আমার হৃদয় আমার বুকে থাকে না, জামার আস্তিনে থাকে। জামাটাও মাঝে মাঝে বদলাতে হয়। আমার হৃদয় খুব ছোট, সেই জন্যই হয়। মহারাণী আমার এই অশোভন উক্তি মাপ করবেন আশা করি, কিন্তু যা মনে হ'ল তা বলে' ফেললাম।"

দাঁড়িয়ে উঠলেন সুরূপিণী।

"মহারাজকে বন্দী করা হয়েছে, এই খবর দিতেই এসেছেন?"

"হ্যাঁ, আপনি যখন খাচ্ছিলেন তখনই বন্দী করা হয়েছে তাঁকে।"

রঞ্জাবতী উঠলেন না, বসেই রইলেন।

"যা বলতে এসেছিলেন তা তো বললেন। আর আপনাকে আমি আটকাব না—"

"না, মহারাণী, সব কথা এখনও বলা হয় নি। যদি অনুমতি করেন, বলি। আপনার কাজের জন্য আজ সমস্ত সন্ধ্যাটা অনেক কিছু সহ্য করেছি। বড় কষ্ট পেয়েছি। এ জঘন্য কাজ করবার জন্যে বাধ্য করা হয়েছে আমাকে—"

রঞ্জাবতী তাঁর হাতের পাট-করা পাখাটা খুলে ফেললেন, তারপর ধীরে ধীরে হাওয়া করতে লাগলেন নিজেকে, তাঁর নাড়ীর স্পন্দন দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছিল ক্রমশ। তাঁর মনের ভাব বিচ্ছুরিত হচ্ছিল তাঁর উজ্জ্বল চোখের ভাষায়, গ্রীবার উদ্দীপ্ত ভঙ্গিমায়, সুরূপিণীর দিকে বিজয়িনীর মতো যে উদ্ধত দৃষ্টিতে ঘৃণাভরে চেয়ে ছিলেন সেই চাহনির নীরব কশাঘাতে। একাধিক ক্ষেত্রে সুরূপিণীর সঙ্গে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল—অন্ততঃ রঞ্জাবতী

তাই মনে করতেন—আজ সে সবের শোধ তুলতে হবে। আজ তিনি বিজয়িনী।

"রঞ্জাবতী দেবী, আপনি তো আমার ভৃত্য নন"—স্বরূপিণী বললেন।

"না, তা নই"—তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন রঞ্জাবতী—"কিন্তু আমাদের দুজনকেই একটি লোকর তাঁবে থাকতে হয় এ কথা আশা করি আপনি জানেন, আর যদি না জানেন তাহলে আমি সেটা সানন্দে জানাচ্ছি আপনাকে। আপনার বুদ্ধিসুদ্ধি এত কম—এত কম—" কথাটা পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি, হাতের পাখাটা প্রজাপতির মতো আর একটু উর্ধ্বে আন্দোলিত হ'তে লাগল—"হয়তো ব্যাপারটা আপনি ঠিক বোঝেন নি।" এবার পাখাটা মুড়ে কোলের উপর রাখলেন এবং উত্তেজিত ভাবে আর একটু সোজা হ'য়ে বসলেন।

"সত্যি বলছি, আপনার মতো অবস্থায় কোনও মেয়েকে পড়তে দেখলে, সত্যিই খুব কষ্ট হবে আমার। আপনি তো জীবনে যা কিছু কাম্য তাই নিয়েই জীবন আরম্ভ করেছিলেন মহারাণী, পুষ্পাকীর্ণ পথে আপনার রথ যাত্রা শুরু করেছিল—ভাল বংশ, যোগ্য বর, অনিন্দ্য রূপ—সবই ছিল—কিন্তু দেখুন এ সব সত্ত্বেও কোথায় এসে দাঁড়িয়েছেন আপনি। সত্যি, অনুকম্পা হ'চ্ছে। সবচেয়ে কি সে সর্বনাশ হয়েছে জানেন? ক্ষমতার মদিরা পান করে' আপনার মাথাটা ঘুরে গেছে, আপনার মতিভ্রম হয়েছে।"

আবার পাখাটা খুলে সপ্রতিভভাবে হাওয়া করতে লাগলেন নিজেকে।

"দেখুন, রঞ্জাবতী দেবী, আপনি আত্মবিস্মৃত হয়েছেন। পাগলের মতো কি যা তা বলছেন!"

"পাগল? না পাগল হই নি এখনও। মাথা আমার এত ঠাণ্ডা আছে যে আমি জানি আপনি এখন আমাকে দূর করে' দিতে

পারবেন না—এবং তা জানি বলেই যা বলবার তা বলে' তবে আমি যাব। আমি যখন প্রিয়দর্শী মহারাজাকে—হ্যাঁ আমি তাঁকে প্রিয়দর্শীই বলব—আমি যখন একটু আগে তাঁকে ছেড়ে এলাম তখন তিনি একটা তুচ্ছ কাঠের পুতুলের জন্যে অঝোর ঝরে' কাঁদছিলেন। সত্যিই বড় কষ্ট হ'ল, প্রিয়দর্শী গন্ধরাজকে আমি ভালবাসি, আপনি বুঝতে পারবেন না, কিন্তু আমি তাঁকে তাঁর পুতুলটা ফিরিয়ে দিয়ে তাঁর চোখের জল মুছিয়ে তাঁর মুখে হাসি ফোটাতে চাই—আমি তাঁকে সুখী দেখতে চাই।"

হঠাৎ সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন রঞ্জাবতী। তাঁর নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হ'য়ে উঠল। পাখাটা মহারাণীর দিকে খোঁচার মতো বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "আপনি কি জানেন? আপনি বোকা, আপনি একটি কচি খুকী! প্রাণহীন কাঠের পুতুল একটা! আপনার শরীরে কি দয়ামায়া আছে? ভালবাসা আছে? রক্ত আছে? কিচ্ছু নেই। থাকলে বুঝতে পারতেন উনি কত বড় মানুষ আর আপনাকে কত ভালবাসেন। এ ভালবাসা জীবনে দু'বার আসে না, এ তুচ্ছ সাধারণ জিনিস নয়, এ ভালবাসার জন্যে অনেক বুদ্ধিমতী অনেক রূপসী কেঁদে কেঁদে বেড়ায় তবু পায় না। আর আপনি, এক ফোঁটা মেয়ে, অমন রত্নকে পায়ে দলেছেন, আপনি বোকা, দেমাকে অন্ধ। রাজ্যশাসন করবার আগে নিজের ঘর গোছাতে শিখুন ভদ্রভাবে. ঘরই মেয়েদের রাজত্ব, রাজধানী সব—"

রঞ্জাবতীর হাতের পাখাটা কাঁপছিল। তিনি থামলেন একটু, তারপর হেসে উঠলেন, অদ্ভুত সে হাসি।

"বলা উচিত নয়, তবু একটা কথা বলছি, ভেবেছিলাম বলব না কিন্তু বলছি। নারী হিসেবে রঞ্জাবতী আপনার চেয়ে অনেক ভালো, জানি না কথাটা কষ্ট করে' আপনি বুঝবেন কি না। আমি যখন আপনার আদেশপত্রটা মহারাজকে দিলাম তখন তাঁর মুখ দেখে আমার বুকটা ভেঙে গেল, সমস্ত আত্মাটাই বিগলিত হয়ে গেল যেন

এবং—হ্যাঁ, রেখে-ঢেকে বলছি না—আমি ছুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেলাম তাঁকে আমার বুকে আশ্রয় দিতে।”

সত্যিই রত্নাবতী ছুহাত প্রসারিত করে' নাটকীয় ভঙ্গীতে এগিয়ে গেলেন একটু। সঙ্কোচে সরে' গেলেন সুরূপিণী।

“ভয় পাবেন না। আমি আপনাকে সে আশ্রয় দিতে চাই না। পৃথিবীতে একটি মাত্র লোক আছেন যিনি আপনাকে সে আশ্রয় দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আপনি তাঁকে দূরে ঠেলে দিয়েছেন। মহারাজ কি বলেছিলেন শুনবেন? বলেছিলেন ওর যদি এতেই আনন্দ হয় আমি কাঁটার মুকুটই পরব, আমি কাঁটাকেই আলিঙ্গন করব। আমি আপনাকে বলছি—খোলাখুলিভাবেই বলছি—আদেশপত্রটা তাঁর হাতে দিয়ে আমি তাঁকে বলেছিলাম আপনি রুখে দাঁড়ান, প্রতিবাদ করুন, প্রতিরোধ করুন। আপনি আপনার স্বামীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, আমার সঙ্গেও করতে পারেন—এ কথা কপিঞ্জলের কানে তুলে দিয়ে। কিন্তু গন্ধরাজ বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না। এ কথাটা ভাল করে' বুঝে নিন যে তাঁর উদারতার জন্যেই আপনি এখন এখানে বসে' আছেন, চাকা অনায়াসেই ঘুরে যেতে পারত, তাকে আমি সে ক্ষমতা দিয়েছিলাম, আদেশপত্র অনায়াসেই বদলে দিতে পারতেন তিনি। কিন্তু তিনি তা করেন নি; আপনাকে কারাগারে না পাঠিয়ে নিজেই তিনি চলে' গেলেন সেখানে।”

সুরূপিণী স্তম্ভিত অভিভূত হ'য়ে পড়েছিলেন। যখন কথা কইলেন বোঝা গেল কাতরও হ'য়ে পড়েছেন খুব। বললেন—“আপনার রূঢ়তায় আমি স্তম্ভিত হ'য়ে গেছি। খুবই কষ্ট হ'চ্ছে আমার। আপনি যা করেছেন তার জন্যে রাগ করছি না, কারণ অন্যায় হলেও এটা স্বীকার করতে হবে যা করেছেন তাতে আপনার সহৃদয়তাই প্রকাশ পেয়েছে। এটা আমার জানা দরকার ছিল। আমি সব কথা খুলে বলছি আপনাকে, যদিও হয়তো তা উচিত

হ'চ্ছে না। অত্যন্ত দুঃখে আমি ওই আদেশপত্র লিখতে বাধ্য হয়েছিলাম। মহারাজকে আমিও পছন্দ করি খুব, তাঁর অমায়িকতায় আমি মুগ্ধ। কিন্তু এটা আমাদের মহা দুর্ভাগ্য, হয়তো আমিই এর জন্যে খানিকটা দায়ী, যে আমাদের ঠিক জোড় মেলে নি। কিন্তু তবুও ওঁর নানা গুণকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করি আমি। উনি যদি সাধারণ লোক হতেন তাহলে আপনার মতের সঙ্গে আমি সায় দিতাম। কিন্তু যেখানে রাজ্যের ভালোমন্দ নির্ভর করছে সেখানে পক্ষপাতহীন হ'তে হবে, ব্যক্তিগত কোন প্রশ্নের সেখানে স্থান নেই। অত্যন্ত অনিচ্ছাসহকারে রাজ্যের শুভাশুভের কথা চিন্তা করে' কর্তব্যের খাতিরেই ওটা করতে হয়েছে আমাকে এবং এটাও আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে রাজ্যের বিপদের ভয় যখন থাকবে না তখনই মহারাজা মুক্তি পাবেন। আপনি এখন যে সব কথা যে ভাবে বললেন তাতে রাণী হিসাবে আমার রাগ করা উচিত, কিন্তু আমি রাগ করি নি"—মনে হ'ল মুহূর্তের জন্য তিনি কাতর দৃষ্টিতে চাইলেন রঞ্জাবতীর দিকে—"আপনি আমাকে যতটা অমানুষ মনে করছেন, আমি ঠিক ততটা নই—"

"আপনি রাজ্যের শুভাশুভ আর একজনের ভালবাসা কি এক বাটখারায় ওজন করবেন ?"

"রঞ্জাবতী, রাজ্যের অনেক লোকের জীবন-মরণ যে জড়িত রয়েছে এর সঙ্গে। গন্ধরাজের জীবনও নিরাপদ নয়, এবং হয়তো আপনারও নয়"—সুরূপিণী গম্ভীর ভাবে বিজ্ঞের মতো বলে' চললেন—"আমার বয়স যদিও কম তবু জীবনে এই বেদনাদায়ক কঠোর শিক্ষা আমি পেয়েছি যে আমার ব্যক্তিগত ব্যথা-বেদনা-সুখ-দুঃখের স্থান কখনই সর্বাগ্রে স্থান পাবে না, সর্বদাই সবার শেষে থাকবে তা—"

"এ কি ন্যাকামি! মুখ দিয়ে লাগ-সই কথাটা বেরিয়ে পড়ল আমার, মাপ করবেন। ভদ্রভাবে বললেও বলতে হয়—আপনার

এই সরলতা দেখে অবাক্ হচ্ছি। আপনি যে কি ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছেন তা কি আপনি জানেন না? আপনার কি সন্দেহও হয় নি। সত্যি আপনার উপর অনুকম্পা হ'চ্ছে, হাজার হলেও আমরা দুজনেই এক জাতের, দুজনেই মেয়েমানুষ, ছি, ছি, লোকটা কি বোকা বানিয়েছে আপনাকে। আমি সব মেয়েমানুষকেই ঘৃণা করি তাদের ওই একটি দোষের জন্য। কিন্তু আপনাকে দেখে এখন সত্যি কষ্ট হ'চ্ছে আমার। আপনার উপর আর আমার রাগ নেই। মহারাণী—"

হঠাৎ তিনি ভঙ্গীভরে অভিবাদন করলেন—"মহারাণী, আমি এবার হয়তো আপনার সম্মানে আঘাত করব, যে লোকটাকে সবাই আমার প্রণয়ী বলে তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করে' দেখাব, কিচ্ছু গোপন করব না, এর জন্যে আপনি হয়তো আমার সর্বনাশ করে' দিতে পারেন,—তা করুন, অমি গ্রাহ্য করি না। কি সুন্দর নাটক বলুন তো। আপনি বিশ্বাসঘাতক, আমি বিশ্বাসঘাতক, সবাই বিশ্বাসঘাতক। এবার আমার পালা এসেছে। চিঠি, হ্যাঁ একটা চিঠি। এই চিঠিটা দেখুন মহারাণী, এটার সীল এখনো আমি ভাঙি নি, এটা আজ সকালে আমার বিছানার উপর পেয়েছি। আজ আমার মেজাজ ভাল ছিল না তাই ওটা খুলি নি, এর এরকম চিঠি আমি অজস্র পাই, এ রকম অনুগ্রহ প্রত্যহই বর্ষিত হয় আমার উপর। আপনার নিজের জন্য, আমার প্রিয়দর্শী গন্ধরাজের জন্য, আর যে রাজত্বের চিন্তা আপনার ঘাড়ে চেপে বসেছে তার জন্য আমি অনুরোধ করছি চিঠিটা খুলে পড়ুন।"

"এ চিঠির সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক আছে কোনও?"

"ওতে কি আছে তা তো জানি না। আমি তো পড়ি নি। কিন্তু চিঠিটা আমার, আপনি পড়ে' দেখুন কি আছে ওতে।"

"আপনি আগে না পড়লে আমি পড়ব না। ওতে হয়তো এমন কথা থাকতে পারে যা গোপনীয়, যা আমার জানা উচিত নয়।"

রঙ্গাবতী চিঠিটা খুলে চোখ বুলিয়ে নিলেন একবার, তারপর সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন টেবিলের উপর। মহারাণী তুলে নিয়ে এক নজরেই কপিঞ্জলের হস্তাক্ষর চিনতে পারলেন। পড়তে পড়তে ভ্রূকুঞ্চিত হ'য়ে এল তাঁর। একটা অপ্রত্যাশিত ধাক্কায় তাঁর মাথা ঘুরে গেল, গা গুলিয়ে উঠল। চিঠিতে লেখা ছিল—

প্রাণের রনজু, অবিলম্বে চলে' এস। আদরিণী কাজটি করে' ফেলেছেন, আদেশ দিয়েছেন তাঁর স্বামীকে কারাগারে চালান করে' দেওয়া হোক। বাচাল দজ্জাল মেয়েটা এবার সম্পূর্ণ আমার কবলে। এবার আর বেচাল হ'তে পারবে না, জোয়ালে জুতে দিলে ঠিক চালে চলবে। আর যদি না চলে তখন আমি বুঝব। এখনি চলে' এস। কপিঞ্জল—

"ঘাবড়াবার কিছু নেই মহারাণী, বেসামাল হবেন না"—স্বরূপিণীর মুখের বিবর্ণ ভাব দেখে তাড়াতাড়ি বলে' উঠলেন রঙ্গাবতী। "কপিঞ্জলের সঙ্গে আপনি এ'টে উঠতে পারবেন না, আপনার অনুগ্রহ ছাড়াও আরও নানাদিকে ওর জাল ছড়ানো আছে। অঙ্গুলি সামান্য হেলনে ও আপনাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিতে পারে। এটা জানি বলেই ওর স্বরূপটা দেখিয়ে দিলাম আপনাকে। কপিঞ্জল শক্তসমর্থ পুরুষ, ও এতদিন আপনাদের পুতুল নাচ নাচিয়েছে। এখন অন্ততঃ আপনি বুঝতে পারছেন কিসের জন্যে আপনি আপনার অমন স্বামীকে বিসর্জন দিয়েছেন। আপনি একটু মাধ্বী পান করবেন ? আমি বড়ই নিষ্ঠুরের মতো ব্যবহার করেছি আপনার সঙ্গে—"

"নিষ্ঠুরের মতো নয়, হিতকারী বন্ধুর মতো"—একটা হাসি হেসে বললেন মহারাণী,—"না, ধন্যবাদ, আমার কিছু দরকার হবে না। প্রথম ধাক্কাটা আমাকে একটু বিচলিত করেছিল। আপনি আমাকে একটু সময় দেবেন ? আমি ভাবতে চাই একটু—"

তিনি দু'হাতে মাথাটা চেপে ধরে' চোখ বুজে এমন ভাবে বসে'

রইলেন খানিকক্ষণ যেন একটা দুরন্ত ঝড়ের দাপটের মধ্যেও পথ খোঁজবার চেষ্টা করছেন।

"ঠিক সময়েই খবরটা পৌঁছেচে। আপনি যা করলেন আমি তা করতে পারতাম না, আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। কপিঞ্জল আমাকে প্রতারণা করেছে বুঝতে পেরেছি সেটা।"

"মহারাণী, কপিঞ্জল চুলোয় যাক্, আপনি আগে গন্ধরাজের কথা ভাবুন।"

"আপনি আবার এমন ভাবে কথা কইছেন যেন আমি সাধারণ পর্যায়ের সামান্য মানুষ। আপনাকে অবশ্য আমি দোষ দিচ্ছি না এ জন্য। কিন্তু আমার নিজের চিন্তাই কেমন যেন এলোমেলো হ'য়ে গেছে। যাক, আপনি যখন আমার, মানে আপনি গন্ধরাজের প্রকৃত বন্ধু, তখন এই মুহূর্তেই তার মুক্তির আদেশটা আপনার হাতেই দিচ্ছি আমি। দোয়াত-কলমটা এগিয়ে দিন এ দিকে—"

তিনি টেবিলের উপর ঝুঁকে খস্ খস্ করে' লিখে দিলেন আদেশটা যদিও লিখতে লিখতে তাঁর হাতটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

"এই নিন। মনে রাখবেন এটা এখন ব্যবহার করবেন না, এ কথা বলবেনও না কাউকে যতক্ষণ না কপিঞ্জলের সঙ্গে আমার দেখা হ'চ্ছে। তাড়াতাড়িতে হয়তো সব পণ্ড হ'য়ে যেতে পারে, এই আকস্মিক ধাক্কায় আমার বুদ্ধিটা গুলিয়ে গেছে।"

"মহারাণী, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যতক্ষণ না আপনি আমাকে অনুমতি দিচ্ছেন ততক্ষণ আমি এটা ব্যবহার করব না, তবে মনে হ'চ্ছে খবরটা গন্ধরাজের কানে যদি পৌঁছয় বেচারা একটু আরাম পাবে। হ্যাঁ, আর একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। তিনি আপনাকে একটা চিঠি লিখে রেখে গেছেন। আপনার অনুমতি পেলে সেটা আমি নিয়ে আসতে পারি। এই দরজা দিয়েই যাওয়া যায় বোধহয়?"

রঙ্গাবতী কপাটটা খোলবার জন্য এগিয়ে গেলেন সেদিকে ।

"এ কি, ওদিক থেকে খিল লাগানো রয়েছে যে !"

"হ্যাঁ—ওটা"—

স্বরূপিণীর কানটা লাল হ'য়ে উঠল ।

"ওঃ—"—রঙ্গাবতী আর কিছু বললেন না ।

একটা নীরবতা ঘনিয়ে এল কয়েক মুহূর্তের জন্য ।

"আমি নিজে গিয়েই চিঠিটা নিয়ে নেব । অপনি এখন যান । আপনাকে অনেক ধন্যবাদ । আমি এখন একা থাকতে চাই ।"

রঙ্গাবতী অভিবাদন করে' বেরিয়ে গেলেন ।

আঠারো

সুরূপিণী সাহসী, অন্ততঃ বুদ্ধির সাহস তাঁর কম নয়, তবু যখন তিনি একা হ'য়ে গেলেন তখন টেবিলটা আঁকড়ে ধরে' তিনি নিজেকে সামলালেন। সহসা সমস্ত আকাশ যেন ভেঙে পড়ল মাথায়। তিনি কোনও দিনই কপিঞ্জলকে পছন্দ তো করেনই নি, এমন কি সম্পূর্ণ বিশ্বাসও করেন নি। তাঁর বন্ধুত্বটা যে মেকী হ'তে পারে এ সম্ভাবনার কথা তাঁর মনে বার বার জাগত। কিন্তু সরকারী কাজকর্মে যে সাধুতার জন্য তিনি তাঁকে সম্মানিত করেছিলেন তাও যে তাঁর একেবারেই নেই, তিনি যে একটা সামান্য শঠ স্বার্থান্বেষী মাত্র, নিজের হীন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য জঘন্য ষড়যন্ত্রে তিনি যে সুরূপিণীকে দাবার বোড়ের মতো ব্যবহার করতে ইতস্ততঃ করেন নি—এ সব কল্পনাতীত ছিল সুরূপিণীর। এই সত্যের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে তাঁর একটু সময় লাগল, উচ্চ পর্বতশিখর থেকে দ্রুত অধঃপতন হ'লে মাথাটা যেমন ঘুরে যায় তাঁরও অনেকটা সেইরকম হ'ল। তাঁর মস্তিষ্কে আলো আর অন্ধকার যেন পর পর আসতে লাগল, একবার বিশ্বাস করছেন, পরমুহূর্তেই অবিশ্বাস এসে বিশ্বাসকে সরিয়ে দিচ্ছে। তিনি কপিঞ্জলের চিঠিটা অন্ধের মতো হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু চিঠি ছিল না। রঞ্জাবতী যেমন গন্ধরাজের কাছ থেকে আদেশপত্রটি ঠিক নিয়ে এসেছিলেন এখান থেকেও তেমনি কপিঞ্জলের চিঠিটা নিয়ে যেতে ভোলেন নি। রঞ্জাবতী পুরোনো খেলোয়াড়, সহসা লক্ষ্যভ্রষ্ট হন না। রেগে গেলে তাঁর বুদ্ধি ভোঁতা হয় না আরও শাণিত হয়।

কপিঞ্জলের চিঠি খুঁজতে গিয়ে তাঁর আর একটা চিঠির কথা মনে পড়ল। গন্ধরাজের চিঠি। তৎক্ষণাৎ উঠে দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেলেন তিনি, তাঁর মাথা তখনও ঘুরছিল, গন্ধরাজের শস্ত্রাগারে

ঝড়ের মতো প্রবেশ করলেন গিয়ে। বৃদ্ধ কঞ্চুকী সেখানে অপেক্ষা করছিল। তাঁকে দেখে চটে' গেলেন সুরূপিণী। মনে হ'ল কি করছে লোকটা এখানে। তাঁর এই সর্বনাশ উঁকি মেরে দেখছে না কি!

"তুমি যাও এখান থেকে"—আদেশের ভঙ্গীতে বলে' উঠলেন। কঞ্চুকী বেচারা যখন কিছুদূর চলে' গেছে তখন আবার ডাকলেন তাকে—"থাম, শোন। প্রধানমন্ত্রী কপিঞ্জলদেও এলেই তাঁকে এখানে পাঠিয়ে দিও।"

"আপনার হুকুম তাঁকে বলব।"

"এখানে একটা চিঠি ছিল"—বলেই থেমে গেলেন তিনি।

"মহারাণী ওই টেবিলের উপর চিঠিটি আছে। আমার উপর কোনও আদেশ ছিল না, থাকলে মহারাণীকে এজন্য কষ্ট করে' আসতে হ'ত না। এনে দেব ওটা?"

"না, না, না। ধন্যবাদ। আমি এখন একা থাকতে চাই।"

কঞ্চুকী চলে' যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুরূপিণী ছুটে গিয়ে যেন লাফিয়ে পড়লেন চিঠিটার উপর। তাঁর মন তখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন, ঝোড়ো মেঘলা রাতে চাঁদের মতন তাঁর বিচারবোধ কখনও উজ্জ্বল হ'চ্ছে, কখনও আবার ঢাকা পড়ে' যাচ্ছে। চিঠিটা তিনি একটানা পড়তে পারলেন না। থেমে থেমে পড়লেন।

"সুরূপিণী"—গন্ধরাজ লিখেছিলেন—"আমি একটিও তিরস্কার বাক্য লিখব না। আমি তোমার আদেশপত্র দেখেছি, আমি চললাম। আমার আর কি বাকি রইল? আমার সব ভালবাসা আমি অপব্যয় করে' নষ্ট করে' ফেলেছি, আর কিছু অবশিষ্ট নেই। তোমাকে আমি ক্ষমা করলাম এ কথা লেখারও প্রয়োজন নেই। আমরা এখন চিরদিনের মতো আলাদা হ'য়ে গেলাম। তুমিই নিজে হাতে আমার ঈপ্সিত বন্ধনটা কেটে দিলে, বন্ধনহীন হ'য়ে আমি কারাগারে চললাম। রাগ করে' বা অনুরাগ ভরে' তোমাকে আর কখনও কিছু বলতে আসব না। তোমার জীবন থেকে আমি বেরিয়ে এলাম,

হয়তো তুমি এবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারবে। যে স্বামী তোমাকে স্বামী-ত্যাগ করতে বাধা দেয় নি, যে রাজা তার নিজের সমস্ত ক্ষমতা, সমস্ত অধিকার তোমার হাতে ছেড়ে দিয়েছিল, যে বিবাহিত প্রণয়ী আড়ালে তোমার দোষ ঢেকে সর্বদাই গর্ব অনুভব করত—তার হাত থেকে এবার তুমি পরিত্রাণ পেলে। কিভাবে তুমি প্রতিদান দিয়েছ সে কথা তোমার বিবেকই তোমাকে স্পষ্ট করে' বলবে, আমি কিছু বলতে চাই না। কিন্তু একদিন আসবে যখন তোমার অলীক স্বপ্নগুলো মেঘের মতই মিলিয়ে যাবে, তখন দেখবে তুমি নিতান্তই একা। তখন তোমার সব মনে পড়বে।"

'গন্ধরাজ'

চিঠিটা পড়তে পড়তে তিনি ভয়ে শিউরে উঠলেন। যে দিনের কথা গন্ধরাজ লিখেছেন সে দিন তো এসে গেছে। তিনি তো সত্যিই এখন একা, একেবারে একা। তিনি বিশ্বাসহন্ত্রী, তিনি নিষ্ঠুর। অনুতাপের ঢেউ যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর মনের উপর। তার পরই তাঁর চেতনার রঙ্গমঞ্চে তীব্র চীৎকার করে' আরও নানা অনুভূতি মূর্ত হ'ল। তিনি প্রবঞ্চিত, তিনি প্রতারিত। তিনি অসহায়। তিনি স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবার জন্যে নিজেকে ঠকিয়েছেন। বছরের পর বছর তিনি কাটিয়েছেন খোশামোদের মিথ্যা স্বর্গে। টপ টপ করে' গিলেছেন তোষামোদের টোপগুলো, জুয়াচোর পরিবৃত হাস্যকর বিদূষকের মতো লোক হাসিয়েছেন প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে! তিনি—সুরূপিণী! এর পরিণাম কি তা তিনি নিমেষে বুঝতে পারলেন, নিমেষে আকণ্ঠ পান করলেন এ গরল। আসন্ন পতনের ছবিটা ভেসে উঠল চোখের উপর, জনতার ধিক্কার তিনি যেন শুনতে পেলেন, দেখলেন এই ঘৃণ্য কলঙ্কের কাহিনী কি ভাবে লোকের মুখে মুখে সাড়ম্বরে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ছে। বাহাদুরি দেখাবার জন্য রাজকীয় প্রতাপের জোরে তিনি যে দৃষ্টিকটু কেলেঙ্কারিটাকে গ্রাহ্যই করেন নি—এখন সেটার

মুখোমুখি হবার মতো সাহস তাঁর কই। ওই লোকটার উপপত্নী বলে' সবাই তাঁকে ভাববে এবার—হয়ত ওই জন্যই···তাঁর মুদিত চোখের সামনে বহু অকথ্য জঘন্য চিত্র ভেসে উঠল সারি সারি। দেওয়ালে নানা অস্ত্র ঝুলছিল, হঠাৎ তিনি একটা ছোরা পেড়ে ফেললেন। হ্যাঁ, সরে' পড়তে হবে। পৃথিবীর এই রঙ্গমঞ্চে থেকে, যেখানে দর্শকরা কেউ মাথা নাড়ছে, কেউ মুচকি হাসছে, কেউ ফুসফুস-গুজগুজ করছে—এখান থেকে সরে' পড়বার একটি মাত্র দরজাই খোলা আছে এখন। যেমন করে' হোক, যত কষ্ট সহ্য করেই হোক জনতার ওই স্থূল অট্টহাস্য থেকে পরিত্রাণ পেতে হবে। চোখ বুজে নীরবে তিনি প্রার্থনা করলেন, তারপর ছোরার ডগাটা বিঁধিয়ে দিলেন বুকে। খুব লাগল। চীৎকার করে' উঠলেন তিনি, দংশন করল যেন ছোরাটা। বুঝলেন তিনি পারবেন না, এভাবে সরে' পড়বার তাঁর ক্ষমতা নেই, অধিকারও নেই বোধহয়। চুনীর মতো এককোঁটা রক্তবিন্দু কেবল তাঁর বুকের উপর সাক্ষী হ'য়ে রইল এই দুঃসাহসের। তীক্ষ্ণ আঘাতটা কিন্তু তাঁকে আত্মস্থ করল, তিনি যেন নিজের শক্তি ফিরে ফেলেন আবার। আত্মহত্যা করবার ইচ্ছেটা চলে' গেল মন থেকে।

ঠিক এই সময়ে বাইরের বারান্দায় পদধ্বনি শোনা গেল; ক্রমশঃ এগিয়ে আসতে লাগল সেটা। কপিঞ্জলের পদধ্বনি, এ পদধ্বনির আওয়াজ তাঁর চেনা, এ আওয়াজ শুনে কতবার তিনি খুশী হয়েছেন। কিন্তু এখন এ পদধ্বনি শুনে তাঁর সমস্ত সত্তা রুখে দাঁড়াল যুদ্ধের জন্যে। ছোরাটা তিনি লুকিয়ে ফেললেন কাপড়ের মধ্যে। তারপর সোজা হ'য়ে ঘাড় তুলে ক্রোধ-দীপ্ত মূর্তিতে অকম্পিত চরণে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি শত্রুর প্রতীক্ষায়।

প্রধানমন্ত্রীর আগমনবার্তা যথারীতি ঘোষিত হ'ল। তিনি প্রবেশ করলেন এসে। টোলের ছাত্রদের কাছে পাণিনি ব্যাকরণ যেমন সমস্যা কপিঞ্জলের কাছে স্বরূপিণীও বরাবর তাই। তিনি রূপসী কি

না এ নিয়ে তিনি কখনও মাথা ঘামান নি, ঘামাবার ইচ্ছা বা অবসর তাঁর ছিল না। কিন্তু আজ তাঁর রোষরঞ্জিত মূর্তি দেখে হঠাৎ নূতন ভাব মনে জাগল তাঁর, তিনি মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন, ক্ষণিকের জন্যে কামনার একটা স্ফুলিঙ্গও যেন বিচলিত করল তাঁকে। তাঁর এ দুটো অনুভূতিরই সম্ভাবনা কি হ'তে পারে তা ভাবলেন একটু। ভাবলেন, হ্যাঁ ও দুটোও নূতন উপায় বটে তাঁর স্বার্থসিদ্ধির। মনে হ'ল—প্রেমিকের ভূমিকায় যদি অভিনয় করতে হয় এখন, তাহলে সেটা প্রাণহীন হবে না। আবেগময় করে' তুলতে পারব সেটাকে—"

তাঁর গুরুভার দেহকে নত করে' অভিবাদন করলেন তিনি।

"আমি চাই"—অদ্ভুত সুরে বেজে উঠল সুরূপিণী কণ্ঠস্বরে, তাঁর কণ্ঠের এ সুর নিজেও তিনি কোনদিন শোনেন নি—"আমি চাই যে মহারাজাকে এখনই মুক্তি দেওয়া হোক। যুদ্ধ বন্ধ করে' দিন অবিলম্বে।"

"মহারাণী, আমি জানতাম শেষ পর্যন্ত এই ঘটবে। যখন আমরা এই অবাঞ্ছিত কিন্তু অতি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তে এসেছিলাম তখনই আমার আশঙ্কা হয়েছিল আপনার কোমল হৃদয় এ আঘাত সহ্য করতে পারবে না শেষ পর্যন্ত। কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি আপনার অযোগ্য সহকারী নই। আমি জানি আপনার যে সব গুণ আছে আমার তা নেই। কিন্তু আপনার ওই গুণগুলোকেই আমি আমাদের মৈত্রীর অস্ত্রাগারে শ্রেষ্ঠ অস্ত্র বলে' গণ্য করি। মহারাণীর অন্তরে কিশোরী। এ যে অপূর্ব!—করুণা, প্রেম, স্নেহ, হাসি—এসবের চেয়ে বড় অস্ত্র আর আছে কি? মৃদুতম হাসিও যে পুরস্কৃত করে সকলকে। আমি শুধু হুকুম করতে পারি, ধমকাতে জানি, আমার মুখে ভ্রূকুটি ছাড়া আর কিছু ফোটে না। কিন্তু আপনি! এই কমনীয় দুর্বলতা-গুলোকে কাজে লাগাবার শক্তি আপনার আছে, আবার প্রয়োজন হ'লে, যুক্তির অনুরোধে এদের দমন করবার ক্ষমতাও আপনি রাখেন। এজন্যে আমি কতবার আপনার কাছেও উচ্ছ্বসিত হয়েছি।

হ্যাঁ আপনার কাছেও"—একটু কোমল কণ্ঠে তিনি শেষ কথাগুলি বললেন, সম্ভবতঃ বিগত দিনের উচ্ছ্বাসভরা কোন গোপন সাক্ষাৎ-কারের কথা তাঁর মনে পড়ল।

"কিন্তু মহারাণী, এখন—"

"এখন ওসব বক্তৃতা থামান"—তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে' উঠলেন সুরূপিণী —"আপনি সত্যি কি? বিশ্বাসী, না বিশ্বাসঘাতক? নিজের মনের দিকে চেয়ে উত্তর দিন। আমি আপনার মনের কথা শুনতে চাই।"

"এইবার হয়েছে"—ভাবলেন কপিঞ্জল। "আপনি, মহারাণী!" —আবেগভরে বলে' উঠলেন তারপর, যেন চমকে গেছেন— আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে ভয়ে, আসলে কিন্তু আনন্দে—"আপনি! আপনি আমাকে আদেশ করছেন মনের কথা বলতে!"

"আপনি কি মনে করেন আমি ভয় করি?"

সুরূপিণীর মুখে এমন আশ্চর্য একটা অরুণিমা ফুটে উঠল, চোখের দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল এমন একটা আলো, অধরপ্রান্তে খেলা করতে লাগল এমন একটা রহস্যময় হাসি যে কপিঞ্জলের মনে আর কোনও সন্দেহ কোনও দ্বিধা রইল না। তিনি ঝপ্ করে' হাঁটু গেড়ে বসে' পড়লেন।

"মহারাণী"—আবেগ ভরে তাঁর কণ্ঠস্বর কাঁপতে লাগল— "সুরূপিণী, এ নামে ডাকবার অনুমতি দেবেন কি? আপনি কি আমার মনের গোপন কথা টের পেয়েছেন? সত্যি—আমি সানন্দে আমার জীবন আপনার পায়ে উৎসর্গ করছি। আমি আপনাকে ভালবাসি, সারা হৃদয় দিয়ে বাসি বন্ধুরূপে, প্রেয়সীরূপে, সমর-সঙ্গিনীরূপে; মধুর হৃদয়ের জন্য কামনা করি আপনাকে, পূজা করি। আপনি আমার বধূ—" হঠাৎ তাঁর কবিত্ব সপ্তমে চড়ে' গেল— "আমার মানসবধূ, আমার ইন্দ্রিয়লোকের ইন্দ্রাণী আপনি। করুণা করুন, গ্রহণ করুন আমার ভালবাসা।"

সুরূপিণী বিস্মিত হ'য়ে শুনছিলেন। তারপর তাঁর রাগ হ'ল,

পরিশেষে ঘৃণা, নিদারুণ ঘৃণা। তাঁর কথাগুলো তাকে যেন মারতে লাগল, অপমানে আত্মহারা হ'য়ে গেলেন তিনি। হুমড়ি খেয়ে যে প্রকাণ্ড জানোয়ারটা তাঁর পায়ের কাছে পড়ে' আছে তাঁকে দেখে হেসে উঠলেন তিনি, দুঃস্বপ্ন দেখে লোকে যেমন হাসে।

"কি লজ্জা, কি লজ্জা। এ কি অসম্ভব ঘৃণ্য আচরণ আপনার। এ দেখলে আপনার রঞ্জাবতী কি বলবেন?"

সেই মহামহিম প্রধানমন্ত্রী, সেই তুখোড় রাজনৈতিক নেতা—ওই অবস্থায় হাটু গেড়েই আরও কিছুক্ষণ রইলেন। তাঁর মনের যে অবস্থা হ'ল তাকে সকরুণ বা শোচনীয় বললেও অত্যুক্তি হবে না কিছু। বিরাট বক্ষের লৌহপিঞ্জরে তাঁর অহঙ্কার যেন মাথা কুটে রক্তাক্ত হ'য়ে ছটফট করতে লাগল। তিনি যদি সমস্ত মুছে দিতে পারতেন, অংশতঃও যদি পারতেন, ওই 'বধূ' শব্দটা যদি উচ্চারণ না করতেন—তাঁর কানের কাছে কে যেন আর্তনাদ করছিল—নিজের মূঢ় আচরণে ক্ষুব্ধ লজ্জিত হ'য়ে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালেন তিনি অবশেষে। নির্বাক যন্ত্রণা যখন ভাষা পায় তখন রসনা যা প্রকাশ করে তাতে মানুষের প্রচ্ছন্ন নিকৃষ্ট রূপ উদঘাটিত হয় সহসা। কপিঞ্জলের মুখ দিয়ে যা বেরুল তার জন্যে এরপর ছয় সপ্তাহ ধরে' তাঁকে অনুতাপ করতে হয়েছিল।

"ও, রঞ্জাবতী?"—তিনি বললেন—"এইবার বুঝতে পারছি কেন মহারাণীর এ অস্বস্তি—"

অসভ্য চাষার মতো অশ্লীল ভঙ্গীতে কথাগুলো বললেন তিনি। আগুন ধরে' গেল সুরূপিণীর মনে। যে বজ্রগর্ভ কালো মেঘটা তাঁর যুক্তিকে এতক্ষণ আচ্ছন্ন করে' রেখেছিল সেটা থেকে এবার বজ্রপাত হ'ল। তিনি চীৎকার করে' উঠলেন, তারপর মেঘটা যখন সরে' গেল, রক্তাক্ত ছোরাটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন মেজের উপর। ক্ষতটাকে চেপে ধরে' কপিঞ্জল ব্যায়ত আননে এগিয়ে এলেন টলতে টলতে। পরমুহূর্তে যে ভাষা উচ্চারণ করতে করতে তিনি বন্য

মহিষের মতো সুরূপিণীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন সে ভাষা সুরূপিণী কখনও শোনেন নি। খামচে ধরলেন তিনি সুরূপিণীর পোশাকের খানিকটা, সুরূপিণী আতঙ্কে পেছিয়ে গেলেন তাঁকে ধাক্কা দিয়ে। হোঁচট খেলেন কপিঞ্জল, তারপর তাঁর মাথাটা ঝুলে পড়ল। সুরূপিণী তাঁর সাংঘাতিক উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করবার আগেই কিন্তু তিনি পড়ে' গেলেন তাঁর পায়ের কাছে।

তারপর তিনি একটা কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে উঠলেন, সুরূপিণী নিষ্পলকদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ভয়ে বিবর্ণ হ'য়ে।

"রনজু"—কপিঞ্জল চীৎকার করে' বললেন—"রনজু, বাঁচাও—" এরপর আর কিছু বলতে পারলেন না, ধপাস্ করে' পড়ে' গেলেন আবার। মনে হ'ল শেষ হ'য়ে গেল বুঝি সব।

সুরূপিণী ঘরের মধ্যে ছুটোছুটি করে' বেড়াতে লাগলেন, অস্থিরভাবে মোচড়াতে লাগলেন নিজের হাত দুটো, চীৎকার করতে লাগলেন। তাঁর অন্তর্লোকে তখন যেন তুমুল ঝটিকা আর ভয়ঙ্কর কোলাহল, সচেতন মনে কেবল একটি মাত্র বাসনা এ দুঃস্বপ্ন শেষ হোক্, আমি জেগে উঠি।

দ্বারে কে যেন করাঘাত করতে লাগল। তিনি ছুটে চলে' গেলেন দ্বারের কাছে, প্রাণপণে চেপে ধরলেন দরজাটা যেন কেউ ঢুকে না পড়ে। হাঁপাতে লাগলেন, তারপর প্রাণপণ শক্তিতে প্রকাণ্ড খিলটা এঁটে দিলেন ভিতর থেকে। এটা ক'রে নিশ্চিন্ত হলেন একটু, উত্তেজনা একটু কমল। তারপর তিনি ফিরে এলেন নিস্পন্দ কপিঞ্জলের কাছে। দরজার উপর করাঘাত আরও জোরে জোরে পড়তে লাগল। হ্যাঁ, লোকটা মরেই গেছে। তিনিই হত্যা করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি রঞ্জাবতীর নাম শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারণ করলেন! এমন করে' সুরূপিণীর নাম কেউ কি উচ্চারণ করবে? তিনিই হত্যা করেছেন ওকে। তিনি—যিনি একটু আগে ছোরার ডগার সামান্য খোঁচায় বিহ্বল হ'য়ে পড়েছিলেন—তিনিই

এই বিরাট দৈত্যকে ছোরার এক আঘাতে ভূপাতিত করবার শক্তি সংগ্রহ করতে পেরেছেন।

বাইরের দরজায় করাঘাত আর কোলাহল ক্রমশঃ উদ্দাম হ'য়ে উঠতে লাগল। প্রাসাদের শান্ত নির্বিঘ্ন জীবনে এ রকম হয় না। কুৎসা নিন্দা অখ্যাতি কলঙ্ক এবার দ্বারে এসে হানা দিচ্ছে, সঙ্গে কত লোক আছে কে জানে। ভেবে শিউরে উঠলেন সুরূপিণী। অনেকে তাঁর নাম ধরে' ডাকছে। মহাধ্যক্ষ কুজ্‌ঝটিকুমারের গলাটা তিনি চিনতে পারলেন।

"মহাধ্যক্ষ কুজ্‌ঝটিকুমার এসেছেন না কি?"—ভিতর থেকে প্রশ্ন করলেন তিনি।

"হ্যাঁ, মহারাণী আমি। আমরা আপনার ঘরে চীৎকার শুনলাম, তারপর কি একটা ভারী জিনিস যে পড়ে' গেল। কি হয়েছে?"

"বিশেষ কিছু হয় নি। আমি কেবল আপনার সঙ্গে কথা বলব। আর যাঁরা আছেন তাঁদের চলে' যেতে বলুন।"

থেমে থেমে হাঁপাতে হাঁপাতে কথাগুলি বললেন তিনি। তাঁর বুদ্ধি কিন্তু সজাগ ছিল। খিল খোলবার আগে দরজার দুধারে যে গোটানো পরদা ছিল সেগুলো তিনি ফেলে দিলেন, যাতে বাইরের কোন লোক হঠাৎ কিছু দেখতে না পায়। বশংবদ কুজ্‌ঝটিকুমার ভিতরে ঢুকতেই আবার খিল বন্ধ করে' দিলেন তিনি। কুজ্‌ঝটি-কুমার বিরাট পরদার ভাঁজে একটু জড়িয়ে পড়েছিলেন। সুরূপিণী তাড়াতাড়ি দরজার কাছ থেকে সরে' এলেন।

"এ কি!" —সভয়ে বলে' উঠলেন তিনি— "মহামান্য কপিঞ্জলদেও!"

"আমি ওঁকে খুন করেছি। হ্যাঁ, হত্যা করেছি—"

"বলেন কি! এ রকম তো আগে কখনও হয় নি।"—তারপর বললেন—"প্রণয় কলহের এ রকম সম্পূর্ণীকরণ"—বলেই থেমে গেলেন একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে।

তারপর আবার বললেন, “কিন্তু এখন কি করা যায়! আমরা কি করব? এ যে ভয়ানক ব্যাপার, ধর্মের দিক দিয়ে নীতির দিক দিয়ে, যে দিক দিয়েই দেখুন—এ যে ভয়াবহ। মহারাণী, মাপ করবেন, যদিও আপনি প্রভু তবু আপনি আমার মেয়ের মতো, সেইভাবেই আমি কথা বলছি—এ যা কাণ্ড করেছেন আইনের চোখে তা—ওঃ তারপর এই মড়া আপনার ঘরে—”

সুরূপিণী ভ্রূকুঞ্চিত করে’ শুনছিলেন তাঁর কথা, ঘৃণা হ’ল লোকটার উপর। এই অপদার্থ লোকটার কাছে সাহায্যের কোন আশা নেই। নিজেই রাশ ধরতে হবে, ঠিক করে’ ফেললেন।

“ভাল করে’ দেখুন না সত্যিই উনি মারা গেছেন কি না!”

নিজের আচরণের কোনও কৈফিয়ত দেওয়া তিনি প্রয়োজন মনে করলেন না। অতিশয় ভয়ে ভয়ে কুজ্ঝটিকুমার এগিয়ে গেলেন। এগিয়ে যাওয়া মাত্রই আহত কপিঞ্জলের চোখের পাতা নড়ে’ উঠল।

“বেঁচে আছেন”—চেঁচিয়ে উঠলেন বৃদ্ধ কুজ্ঝটিকুমার—“মহারাণী, উনি বেঁচে আছেন।”

“ওঁকে সাহায্য করুন তাহলে”—সুরূপিণী না নড়েই আদেশ দিলেন—“ওঁর ক্ষতটা কাপড় দিয়ে বেঁধে দিন।”

“বাঁধব? কি করে’ বাঁধব বলুন—”

“আপনার রুমালটা বার করুন না, যা হোক কিছু একটা দিয়ে বাঁধুন ওটাকে”—এই বলে’ তিনি তাঁর মসলিনের শাড়ির ঝালর দেওয়া আঁচলটা ছিঁড়ে ফেললেন। সেটা তাঁর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন—“নিন, এইটে দিয়ে বাঁধুন”—তারপর সেই প্রথম তাঁর কাছে এসে মুখোমুখি দাঁড়ালেন। এতক্ষণ দূরে ছিলেন।

কিন্তু কুজ্ঝটিকুমার দুহাত উপরে তুলে যন্ত্রণায় যেন আর্তনাদ করে’ উঠলেন। কপিঞ্জল যখন সুরূপিণীকে খামচে ধরেছিলেন তখন তাঁর মূল্যবান কাঁচুলির খানিকটা ছিঁড়ে গিয়েছিল।

"মহারাণী, আপনার কাঁচুলির এ কি ভয়ানক অবস্থা। আপনার বেশবাস যে বিস্রস্ত—"

"আপনি কাপড়টা তুলে নিয়ে ওঁর ক্ষতটা বাঁধুন আগে। তা না হ'লে উনি এখনি মারা যেতে পারেন।"

কুজ্‌ঝটিকুমার থতমত খেয়ে কপিঞ্জলের দিকে ফিরে অসহায়ভাবে তাই করবার চেষ্টা করতে লাগলেন, যা না করলেও চলত।

"এখনও আশা আছে মহারাণী। উনি নিঃশ্বাস নিচ্ছেন, নিঃশ্বাস নিচ্ছেন।"

"আপনি এর বেশী যদি কিছু করতে না পারেন তাহলে যান, কয়েকজন লোক ডেকে আনুন। ওঁকে ওঁর নিজের বাড়িতে নিয়ে যান।"

"মহারাণী এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য যদি শহরের লোকের চোখে পড়ে, তাহলে তো সর্বনাশ, রাজ্য এখনি রসাতলে যাবে।"

"প্রাসাদে একটা পালকি আছে"—সুরূপিণী বললেন—"সেইটেতে করে' ওঁকে বাড়ি পৌঁছে দিন। আপনার উপর এ দায়িত্ব দিচ্ছি। যদি পালন না করেন আপনার প্রাণদণ্ড হবে। যান, এখনি যান—"

"বুঝতে পেরেছি, মহারাণী, স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি এবার। কিন্তু নিয়ে যাব কি করে'? কারা নিয়ে যাবে? মহারাজের চাকররা? তারা মহারাজকে ভালবাসে। হ্যাঁ, তাদের ডাকলে হয়, তারা বিশ্বাসী।"

"না, তাদের ডাকতে হবে না। আপনি সাপ্রাকে, আমার নিজের বিশ্বাসী চাকরকে ডাকুন—সে খুব কাজের লোক—"

"সাপ্রাকে! সে তো বিদ্রোহীদের দলের লোক। সে খবর পেলে তো আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়বে খবরটা। সবাই এখুনি এসে আমাদের কচু-কাটা করবে!"

তাঁর আদেশ যে পালিত হ'চ্ছে না, তিনি যে ধীরে ধীরে নেবে যাচ্ছেন তা সুরূপিণী অনুভব করলেন।

"বেশ, যাকে খুশি ডেকে আমুন। পালকিটা এখানে নিয়ে আসুক।"

কুজ্ঝটিকুমার চলে' যেতেই সুরূপিণী কপিঞ্জলের কাছে ছুটে গেলেন এবং চেষ্টা করতে লাগলেন রক্তপাত বন্ধ করতে পারেন কি না—কিন্তু তাঁর গা ঘিনঘিন করতে লাগল। ওই পশুটার অঙ্গ স্পর্শ করবামাত্র তাঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে উঠল। তাঁর মনে হ'ল ক্ষতটা সাংঘাতিক, ক্রমাগত রক্ত পড়ছে। মনটাকে শক্ত করে' তিনি কাপড়ের টুকরোটা দিয়ে রক্তটা মুছে মুছে নিতে লাগলেন, কুজ্ঝটিকুমার এটুকুও পারে নি। মূর্ছিত কপিঞ্জলকে দেখে কোনও নিরপেক্ষ দর্শক মুগ্ধ হ'য়ে যেতেন। তাঁর সুগঠিত বিশাল দেহ দেখে মনে হচ্ছিল একটা বিরাট যন্ত্র যেন হঠাৎ বিকল হ'য়ে গেছে। ক্রোধ বা ভণ্ডামির লেশমাত্র আভাস তাঁর মুখমণ্ডলে ছিল না। মনে হচ্ছিল যেন ওটা কোন শিল্পীর সৃষ্টি, যেন পাথরে কোঁদা। সুন্দর শক্তিব্যঞ্জক অপূর্ব। কিন্তু সুরূপিণীর এ সব মনে হচ্ছিল না। কপিঞ্জলের প্রসারিত বিশাল বপু (মাঝে মাঝে থরথর করে' কাঁপছিল সেটা), তাঁর উন্মুক্ত বিরাট বক্ষ, একটা ঘৃণ্য কদর্যতায় পূর্ণ করে' তুলছিল তাঁর মনকে। ক্ষণে ক্ষণে গন্ধরাজের কথা মনে পড়ছিল তাঁর।

প্রাসাদের বাইরে কিন্তু গুজব ছড়াচ্ছিল। একাধিক লোকের ছুটোছুটির শব্দ আর গলার আওয়াজ থেকে বোঝা যাচ্ছিল তা। প্রকাণ্ড সিঁড়িটার উপর সহসা অনেক লোকের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শোনা গেল, দালান দিয়ে কারা যেন আসছে দ্রুতপদে। কুজ্ঝটি-কুমার গন্ধরাজের চারজন চাকরের সাহায্যে পালকিটা নিয়ে আসছিলেন। চাকররা ঘরে ঢুকে বিস্রস্তবাসা সুরূপিণী আর আহত কপিঞ্জলের দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে রইল। কথা বলবার অধিকার তাদের ছিল না, কিন্তু এ দৃশ্য দেখে তাদের মনে যে কথা জাগল তা অপবিত্র, তা অশুচি। কপিঞ্জলকে পালকির ভিতর ঢুকিয়ে পালকির

পরদা ফেলে দেওয়া হ'ল। বেয়ারারা পালকি তুলে নীরবে বাইরে নিয়ে গেল, কুজ ঝটিকুমার তাদের অনুসরণ করলেন বিবর্ণ মুখে।

সুরূপিণী জানলার কাছে ছুটে গেলেন। জানলার কাচ দিয়ে বাইরের উঁচু ছাদটা দেখা যায়। সেখানে আলোর সারি। তারপর দেখা যায় যে বীথি-ঢাকা রাস্তাটা প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে শহরের দিকে চলে' গেছে, তারও দুধারে আলোর সারি। আর দেখা যায় মাথার উপর অন্ধকার আকাশ আর নক্ষত্র। বড় বড় নক্ষত্রগুলো দপ্‌দপ্ করে' জ্বলছে। জানলার কাচে চোখ লাগিয়ে নিস্পন্দ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সুরূপিণী। একটু পরেই দেখা গেল পালকিটা প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে, বাগান পার হ'য়ে আলোক-সজ্জিত রাস্তায় পড়ল। পালকিটা দুলছে, চিন্তিতমুখে বিব্রত কুজ ঝটিকুমার চলেছেন পিছু পিছু। আস্তে আস্তে তারা দূরে মিলিয়ে গেল। বাইরে তিনি চোখের সামনে এই দৃশ্য দেখলেন, আর মনের ভিতর দেখলেন তাঁর জীবনের, তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষার চূর্ণ-বিচূর্ণ বিধ্বস্ত রূপ, সম্পূর্ণ ধ্বংসের, সম্পূর্ণ পরাজয়ের প্রতিচ্ছবি। তাঁর জীবনে এখন এমন আর কেউ নেই যাকে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন, এমন কোন বন্ধু নেই যে হাত বাড়িয়ে দেবে, এমন একজনও নেই যার আনুগত্যের উপর তিনি আস্থা স্থাপন করতে পারেন। কপিঞ্জলের পতনের সঙ্গে সঙ্গে, তাঁর দলের, তাঁর ক্ষণিক জনপ্রিয়তারও পতন হ'ল। তিনি জানলার কাছে বসে' শীতল কাচের উপর তাঁর কপালটা রেখে চুপ করে' বসে' রইলেন। বেশবাস ছিন্ন, সম্পূর্ণ লজ্জানিবারণও হচ্ছিল না তাতে, মনে দুর্ভাবনার তুফান, চোখে শঙ্কার ছায়া। এই কি মহারাণী সুরূপিণী?

ব্যাপার কিন্তু ক্রমশঃ ঘনীভূত হচ্ছিল; অন্ধকারের অন্তরালে ধ্বংস এবং বিদ্রোহের রক্তশিখা লেলিহান হ'য়ে উঠছিল নেপথ্যে। পালকি সিংহদরজা পার হয়ে শহরের রাস্তায় প্রবেশ করল। কোন মন্ত্রবলে কোন ঝড়ের মুখে আতঙ্কের খবরটা ছড়িয়ে পড়ল শহরে?

কিন্তু পড়েছিল। প্রাসাদে যে চাঞ্চল্য, সাড়া জেগেছিল তার ঝাপটা শহরে গিয়েও পৌঁছেছিল। তা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল সকলের ঘরে ঘরে। গুজব সাপের মতো ফণা তুলে বেড়াচ্ছিল রাস্তায় রাস্তায়। সবাই যন্ত্রচালিতবৎ বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে জটলা হ'তে লাগল, জম্বীর বীথিতে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল, শহরের প্রান্তে আলোর তলায়, হাটে, বাজারে সর্বত্র লোক। সবার মুখে কুটিল কালো ছায়া।

এই অপেক্ষমান জনতার ভিতর পরদা-ঢাকা পালকিটা আবির্ভূত হ'ল অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের মতো। পালকির পিছনে পিছনে ধাবমান স্বয়ং কুজ্‌ঝটিকুমার! নীরবে দেখতে লাগল সবাই, তারপর পালকিটা যখন পার হ'য়ে গেল, তখন একটা চাপা তর্জন ফুটন্ত জলের মতো যেন টগবগিয়ে ফুটে উঠল। উথলে পড়ল। জটলার লোকেরা জটলা থেকে বেরিয়ে এল একে একে, সমস্ত জনতা একের পিছনে আর একজন সারিবদ্ধ হ'য়ে চলতে লাগল পরদা-ঢাকা পালকিটাকে অনুসরণ করে'। তারপর তাদের মধ্যে যারা একটু সাহসী তারা এগিয়ে এসে প্রশ্ন করতে লাগল কুজ্‌ঝটিকুমারকে। যে মিথ্যাভাষণের কৌশল আয়ত্ত করে' তিনি সারাজীবন সুখে কাটিয়াছেন সে কৌশল কিন্তু এখন কাজে লাগল না। আমতা আমতা করতে লাগলেন তিনি। যে জৈবিক প্রেরণা এতকাল তাঁর জীবন নিয়ন্ত্রিত করে' এসেছে—সেই ভয় তাঁকে অভিভূত করে' ফেলল। তাঁকে চেপে ধরল সবাই: তিনি অসংলগ্নভাবে যা তা বলতে লাগলেন, ঠিক এই সময়ে পালকির ভিতর থেকে একটা আর্তনাদ শোনা গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে, সমবেত জনতার ক্ষুব্ধ কোলাহলে কুজ্‌ঝটিকুমার স্পষ্ট সেই সংকেত শুনলেন যা ঘড়ি বাজবার ঠিক আগে ছোট্ট 'খচ্‌' শব্দটিতে শোনা যায়। কম্পমান কুজ্‌ঝটিকুমার বুঝলেন আর উপায় নেই, আর গোপন করা যাবে না। কয়েক মুহূর্তের জন্যে আত্মবিস্মৃত হ'য়ে এরপর তিনি যা

করলেন তাতে তাঁর অনেক পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে। তিনি একজন বেয়ারাকে চুপি চুপি বললেন—"মহারাণীকে পালাতে বল। সর্বনাশ হ'য়ে গেছে। দৌড়ে চলে' যাও।" পরমুহূর্তেই তিনি আত্মসমর্পণ করলেন জনতার হাতে, অসংলগ্নভাবে বলতে লাগলেন তিনি দায়ী নন, তাঁর কোন দোষ নেই।

পাঁচ মিনিট পরে বেয়ারাটা ছুটতে ছুটতে এসে হুড়মুড় করে' ঢুকে পড়ল মহারাণীর ঘরে।

"সর্বনাশ হ'য়ে গেছে। মহাধ্যক্ষ মশাই আপনাকে পালাতে বললেন।"

সেই মুহূর্তেই স্বরূপিণী জানলা দিয়ে দেখতে পেলেন আলোকিত বীথি-পথ দিয়ে জনতার কৃষ্ণস্রোত প্রাসাদের দিকে ছুটে আসছে।

"ও তাই নাকি। ভগবান তোমাদের রক্ষা করুন। তুমি যাও।"

লোকটা তবু দাঁড়িয়ে রইল।

"দাঁড়িয়ে আছ কেন। তুমিও পালাও। বাঁচাও নিজেকে—"

যে গোপন পথ দিয়ে ঠিক দু'ঘণ্টা আগে গর্জনগাঁওয়ের শেষ মহারাজা গন্ধরাজ নির্বাসনে গিয়েছিলেন সেই গোপন পথ দিয়েই গর্জনগাঁওয়ের শেষ মহারাণী মহামান্যা স্বরূপিণীও অন্তর্ধান করলেন।

উনিশ

গোলমালের শব্দ পেয়ে প্রহরীটা পালিয়েছিল পিছনের ফাটক থেকে। উন্মুক্ত তোরণদ্বারের সামনে অপেক্ষা করছিল রাত্রির অন্ধকার। স্বরূপিণী বাগানের চাতালের উপর দিয়ে পালাতে পালাতে শুনতে পেলেন ক্ষিপ্ত জনতার কোলাহল আর পদধ্বনি প্রাসাদের দিকে এগুচ্ছে ; শব্দ থেকে মনে হ'চ্ছে একদল অশ্বারোহী যেন ছুটে আসছে, এর উপর শোনা যাচ্ছে বাতি ভাঙার ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ আর সবার উপরে শোনা যাচ্ছে তাঁর নিজের নামটা। ওরা যেন সেটা নিয়ে লোফালুফি করছে। রক্ষীদের ঘর থেকে তুরীধ্বনি হ'ল, একটা বন্দুকের আওয়াজও শোনা গেল, তারপর শত শত লোকের বিকট চীৎকারের কাছে আত্মসমর্পণ করল পার্বতীর রাজপ্রাসাদ। বিরাট বন্যাস্রোতে ডুবে গেল যেন সব।

এই সব ভয়াবহ শব্দে ভীতচকিত হ'য়ে স্বরূপিণী লম্বা বাগানটা ছুটতে ছুটতে পার হলেন, তারপর সিঁড়ি, এখানে নক্ষত্রের আলো ছাড়া অন্য আলো নেই। নিশাচরী পক্ষিণীর মতো উড়তে উড়তে সিঁড়িও তিনি অতিক্রম করলেন, এরপর ঢুকলেন এসে প্রমোদ-উদ্যানের অঙ্গনে। যেখানে এলেন সে জায়গাটা খুব বিস্তৃত নয়, নানারকম গাছের সারি আর ফুলের ঝোপ সেখানে। জঙ্গুলে জায়গা। তবু সেই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকেই তিনি নির্ভয় হলেন একটু। তারপরই দেওয়াল, দেওয়ালের পর আবার জঙ্গল, বেশ বেশী জঙ্গল। দূরে দূরে প্রাসাদের আলো জ্বলছে পিছন দিকে। স্বরূপিণী সে সব আলো আর মহারাণীর মানমর্যাদা সব পিছনে ফেলে দেওয়ালের উপর উঠে লাফিয়ে নেবে পড়লেন জঙ্গলে। সভ্যতা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন অরণ্যে।

বনের মধ্যেও সরু পথ পেলেন। সেইটে ধরেই সোজা চলতে

লাগলেন। আশেপাশে গুল্ম ঝোপ আর আকাশে তারার আলো। তারার আলোই পথ দেখাতে লাগল তাঁকে। একটু দূরেই থামের মতো কালো কালো দেওদার গাছের সারি, কোথাও কোথাও কুঞ্জবনের মতো, শাখা-প্রশাখা আকাশকে আড়াল করেছে। চারিদিক নিস্তব্ধ, একটু হাওয়া নেই, মনে হ'চ্ছে অন্ধকারের কারাগার যেন, একটা কি যেন ভয়ঙ্কর আবির্ভাব স্তব্ধ হ'য়ে আছে চারিদিকে; হাতড়ে হাতড়ে এগুতে লাগলেন সুরূপিণী, গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা লাগতে লাগল। উৎকর্ণ হয়ে রইলেন যদি কোনও শব্দ শুনতে পাওয়া যায় কিন্তু পাওয়া গেল না।

সহসা অনুভব করলেন একটা ঢালু জমি বেয়ে তিনি উপর দিকে উঠছেন। এতে একটু আশা জাগল, একটু পরেই দেখতে পেলেন পাহাড়টাকে, অরণ্যের সমুদ্রে মাথা উঁচু করে' দাঁড়িয়ে আছে। আশেপাশে আরও ছোট বড় পাহাড়। কালো কালো উপত্যকাগুলো দেখা যাচ্ছে, যেন মখমলে মোড়া। মাথার উপর আবার দেখা দিল আকাশ, কোটি কোটি নক্ষত্রখচিত আকাশ। পশ্চিম আকাশের দূর দিগন্তে আরও অনেক পাহাড়ের অস্পষ্ট ছবি। মহারাত্রির মহামহিমায় অভিভূত হলেন সুরূপিণী, তারার মতোই দীপ্ত হ'য়ে উঠল তাঁর চোখ : চোখের দৃষ্টি আকাশের শীতলতায় অবগাহন করল, মন আকাশের ভাস্বরতায় কৃতার্থ হ'ল, মনে হ'ল যেন অদ্ভুত একটা প্রশান্তির সাগরে ধীরে ধীরে তিনি বিলিয়ে দিচ্ছেন নিজেকে। একটু পরে সত্যিই মন শান্ত হ'ল। দিনের বেলা সূর্য মাথার উপরে আকাশে সোনার ফসল ছড়াতে ছড়াতে লক্ষ লক্ষ মানুষকে একই আহ্বান জানান। সে আহ্বান উদাত্ত, কিন্তু তা সকলের জন্য, ব্যক্তিবিশেষের জন্য নয়। চাঁদও জ্যোৎস্নার বীণায় যে সুর বাজান তাতেও ধ্বনিত হয় বহুলোকের আনন্দ, বহুলোকের বিরহ। তারারাই কেবল আলাদা আলাদা প্রতি মানুষের কানে কানে চুপি চুপি কথা বলেন বন্ধুর মতো। তাদের ওই উজ্জ্বল চিকিমিকি হাসিতে

সর্বজনীনতা নেই, তা যেন প্রতি মানুষের প্রতি আলাদা সম্ভাষণ। তারা মিটিমিটি ওই হাসি হেসে আমাদের দুঃখের কথা শোনে, অসীম ধৈর্যভরে বুড়ী দিদিমার মতো। ওরা দেখতে ছোট ছোট কিন্তু কল্পনায় কি বিরাট ওদের রূপ। এ দুই ভূমিকাতেই ওরা আমাদের মনে ছবি আঁকে—আমাদের প্রকৃতির, আমাদের নিয়তির।

পাহাড়ের উপর বসে ছিলেন সুরূপিণী, বসে' উপভোগ করছিলেন এই সৌন্দর্য, আকাশ-ভরা তারার সঙ্গিনী হ'য়ে। সন্ধ্যাবেলার ঘটনাগুলো উজ্জ্বল ছবির মতো ফুটে উঠছিল তাঁর মানসপটে, মুখর হ'য়ে বাজছিল তাঁর কানের কাছে। রঞ্জাবতী আর তার পাখার দোলন, নতজানু কপিঞ্জল, চকচকে মার্বেলের মেঝেতে রক্তের ধারা, দ্বারে ঘনঘন করাঘাত, আলোকিত বীথি-ঢাকা পথে দোদুল্যমান পালকি, উর্ধ্বশ্বাসে দূতের আগমন, উন্মত্ত জনতার চীৎকার। এখন কিন্তু সবই কত দূরে, যেন সত্য নয়, স্বপ্ন। এখন তাঁর চারিদিকে বর্ষিত হ'চ্ছে রাত্রির প্রসন্নতা আর মহিমা, শান্ত হ'য়ে আসছে মন, ক্ষতগুলো আর জ্বালা করছে না। পার্বতীর দিকে চেয়ে দেখলেন: পাহাড়ে ঢাকা পড়ে' গেছে, দেখা যাচ্ছে না: কিন্তু পাহাড়ের উপরে আকাশটা লাল, পার্বতী পুড়ছে বোধহয়। সেই ভালো, সেই ভালো, তাঁর পতনটাও নাটকীয় মহিমায় হৃদয়-বিদারক হ'য়ে উঠুক। শহর জ্বলছে, প্রাসাদ জ্বলছে—চমৎকার! গর্জনগাঁওয়ের জন্য একটুও দুঃখ হ'ল না তাঁর, কপিঞ্জলের জন্যও না! তাঁর জীবনের এ অধ্যায় চিরদিনের জন্য শেষ হ'য়ে গেল—যাক। আহত অভিমান, বিচূর্ণিত অহঙ্কার একটু দুঃখ দিচ্ছিল অবশ্য, কিন্তু তা-ও আর থাকবে না। একটি কথাই এখন সুস্পষ্টভাবে তাঁর মনে জাগছিল—পালাতে হবে এবং সম্ভব হ'লে—যদিও সেটা স্পষ্টভাবে তখনও তিনি স্বীকার করছিলেন না নিজের কাছে—পালাতে হবে শূলপাণির দিকে। তাঁর একটা কর্তব্য বাকী আছে—গন্ধরাজকে মুক্তি দিতে হবে। তাঁর যুক্তি অনাসক্তভাবে কথাটা

ভাবছিল, কিন্তু তাঁর মনে তাঁর হৃদয়ে যা জাগছিল তা অনাসক্ত নয়, তা উন্মুখ আগ্রহে কম্পমান। তিনি কামনা করছিলেন সেই স্পর্শ যা করুণায় ভরা, যা বন্ধুর স্পর্শ।

এ কথা মনে হওয়াতে উঠে পড়লেন তিনি, ঢালু জমি বেয়ে ঢুকে পড়লেন জঙ্গলের ঝোপ-ঝাড়ে। ঝোপের মধ্যে হারিয়ে গেলেন তিনি, অরণ্যের নিবিড়তা তাঁকে আশ্রয় দিল আবার। আবছা মূর্তির মতো আবার তিনি যাত্রা শুরু করলেন অজানা পথে, যে পথে রাজকীয় জয়ধ্বনি নেই, পথপ্রদর্শক অশ্বারোহী সৈন্য নেই। এখানে ওখানে বনের ফাঁকে ফাঁকে সামান্য আলোর ইশারা, সেই দিকেই চললেন তিনি, কোথাও কোন বিরাট বনস্পতির রূপ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে' সবাইকে ছাড়িয়ে উঠেছে যেন, কোথাও খসখস শব্দ, কোথাও খুব ঘন অন্ধকার, কোথাও একটু আলোর আভাস, আর সমস্ত পরিব্যাপ্ত করে' থমথম করছে নিশীথিনীর ঘনগাম্ভীর্য। সুরূপিণীর মনে হচ্ছিল গাম্ভীর্যসত্ত্বেও নিশীথিনী যেন তাঁর প্রতি পদক্ষেপ লক্ষ্য করছে। কখনও তিনি দাঁড়িয়ে পড়ছিলেন, রাত্রির গভীরতা ঘন থেকে ঘনতর হচ্ছিল, এই নিথর নীরবতায় তাঁর যেন দম বন্ধ হ'য়ে যাবে মনে হচ্ছিল। আবার চলতে শুরু করলেন, ছুটতে লাগলেন, হোঁচট খেলেন, পড়ে' গেলেন, তবু থামলেন না। উঠে আরও বেশী ছুটতে লাগলেন। মনে হ'ল, সমস্ত বন, সমস্ত গাছপালাও যেন তাঁর সঙ্গে ছুটছে। পাগলিনীর মতো তাঁর এই ঝড়ের বেগে যাত্রা সমস্ত বনকে সচকিত করে' তুলল, ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হ'য়ে মুখরিত করে' তুলল অন্ধকারকে, একটা আতঙ্ক যেন ঘনিয়ে এল চারিদিকে। আতঙ্ক, হ্যাঁ আতঙ্কই—আতঙ্ক যেন ছুটতে লাগল তাঁর পিছু পিছু; গাছেরা যেন শাখা বাড়িয়ে তাঁকে ধরতে আসছে; চারদিকে আবছা আবছা প্রেতমূর্তির মতো ওরা কারা! মনে হ'ল তাঁর দম বন্ধ হ'য়ে আসছে আবার, তিনি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলেন। তিনি ভয় পেয়েছিলেন খুব, কিন্তু বুদ্ধিহারা হন নি।

ভয়ের এইসব ঝড়ঝাপটে তাঁর মনের দুর্গে যুক্তির আলো একটু কাঁপছিল অবশ্যই, কিন্তু নিবে যায় নি। তিনি বুঝতে পারছিলেন, বুঝতে পারছিলেন এবার তাঁকে থামতে হবে, থামা উচিত, কিন্তু থামতে পারছিলেন না।

তিনি যখন প্রায় পাগল হ'য়ে যাওয়ার মতো হয়েছেন তখন হঠাৎ সরু একটা ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়ালেন। এই সময় একটা তুমুল শব্দও স্পষ্ট হয়ে উঠল, সামনে অস্পষ্ট নানা মূর্তি, আর কি একটা যেন শাদা মতন চোখে পড়ল, পরমুহূর্তেই তিনি প'ড়ে গেলেন, আবার অতিকষ্টে উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর সমস্ত চেতনা, সমস্ত অনুভূতি যেন তলিয়ে গেল।

যখন আত্মস্থ হলেন তখন দেখলেন তিনি জলে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর পায়ের গোছ পর্যন্ত বরফের মতো ঠাণ্ডা জল, একটা পাহাড়ী ঝরণা ঝরঝর করে' ঝরে' পড়ছে আর যে পাথরটা থেকে পড়ছে সেই পাথরটাকেই আঁকড়ে ধরে' আছেন তিনি। উৎক্ষিপ্ত জলধারায় তাঁর চুল ভিজে গেছে। শাদা ঝরণাটা তখন দেখতে পেলেন, তার জলে আকাশের তারারা আন্দোলিত হ'চ্ছে, ফেনা ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে, আর মাথার উপরে দুধারে নক্ষত্রের স্নিগ্ধ আলোকে তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা লম্বা দেওদার গাছের সারি। মনটা হঠাৎ আবার শান্ত হ'ল, তখন সানন্দে লক্ষ্য করলেন কি প্রচণ্ড বেগে ঝরণাটা লাফিয়ে পড়েছে ওই জলাশয়ের বুকে। জল থেকে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে এলেন, সর্বাঙ্গ থেকে জল ঝরছে। ক্লান্তির চরম সীমায় এসে পৌঁছেছিলেন তিনি, এখন এই অন্ধকারে আবার জঙ্গলের ভিতর ঢুকে পড়া আত্মহত্যারই নামান্তর হবে তাঁর মনে হ'ল। মনে হ'ল এই সংকীর্ণ স্থানে এই ছোট্ট নদীটির পাশে আকাশ-ভরা নক্ষত্রের সঙ্গে রাতটা তিনি কাটিয়ে দিতে পারবেন, একটু পরেই চাঁদও দেখা দিল পূর্বদিগন্তে।

দেওদার গাছের সারি পাহাড় বেয়ে নেমে গিয়েছিল দুধার দিয়ে।

মাঝখানে বেশ খানিকটা চওড়া জায়গা, ছোট্ট পাহাড়ী নদীটির অতটা জায়গার প্রয়োজন ছিল না। গাছের নীচে নীচে ফাঁকা জায়গা, মাঝে মাঝে ঝোপঝাড়, নক্ষত্রের মৃদু আলোয় সবাই যেন স্বপ্ন দেখছে। এই দিকেই সাহস ও ধৈর্যভরে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলেন তিনি। উপরে পাহাড়ের দিকে চেয়ে দেখতে পেলেন পাহাড় বেয়ে অনেক ছোট ছোট ঝরণা এসে নদীটিতে পড়ছে, অজস্র ধারা এসে প্রথমে পড়েছে বড় বড় ঘাসের বনে, সেখান থেকে ধীরে ধীরে মিশেছে নদীতে এসে মন্থর গতিতে। তারপর আকাশের দিকে মুখ তুলে আবার নক্ষত্রদের দিকে চাইলেন তিনি, চিরউজ্জ্বল, চিরনবীন, চিরসঙ্গীরা ওই যে রয়েছে চেয়ে। সন্ধ্যার প্রথম দিকটায় একটু শীত শীত করছিল, কিন্তু এখন যেন তত শীত নেই মনে হ'ল। অরণ্যের শাখা-প্রশাখার ভিতর থেকে বইছিল মৃদুমন্দ বাতাস, মনে হচ্ছিল কে যেন নিশ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছে। প্রচুর শিশির পড়েছে ঘাসে ঘাসে আর ঘাসের ফুলে ফুলে। সুরূপিণী জীবনে এই প্রথম উন্মুক্ত আকাশের তলায় একা এসে দাঁড়ালেন। আর তাঁর ভয় করছিল না। আকাশের স্নিগ্ধ নীরবতা-ভরা শান্তি তাঁর মর্মে গিয়ে পৌঁছল। মনে হ'ল বিরাট মহাকাশ এই পথহারা মহারাণীকে যেন স্নেহভরে নিরীক্ষণ করছেন, আর নদীটির কল্লোলে যে ভাষা ফুটছে তা-ও যেন উৎসাহের ভাষা। বলছে, ভয় কি।

অবশেষে তিনি অনুভব করলেন তাঁর চারদিকে যেন বিরাট একটা পরিবর্তন হচ্ছে, নীরবে যেন একটা বিপ্লব ঘটছে চারদিকে— যার কাছে পার্বতীর অগ্নিকাণ্ড অতি তুচ্ছ একটা পটকাবাজির মতো অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার। যে চেহারা নিয়ে দেওদার গাছের সারি তাঁকে প্রথমে দেখা দিয়েছিল, তাদের সে চেহারা ধীরে ধীরে বদলে গেল ; ছোট ছোট তৃণগুল্মদল, ওই পাহাড়ী নদীর ঘোরানে সিঁড়ির মতো ঊর্ধ্বগতি মনে হ'ল যেন লীলায়িত, গম্ভীর অথচ মধুর। নির্বাক বিস্ময়ে সুরূপিণী দেখতে লাগলেন। তাঁর মনের তন্ত্রীতে যে সুর

বেজে উঠল তা অনবদ্য, তা অপরূপ। মুগ্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। অনুভব করলেন সমস্ত প্রকৃতিও যেন তাঁর দিকে চেয়ে আছে, সে চাহনি অর্থভরা, যেন ঠোঁটের উপর একটি আঙ্গুল রেখে সে অপূর্ব ভঙ্গীতে সকৌতুকে প্রকাশ করছে অনির্বচনীয়কে। আকাশের দিকে আবার চেয়ে দেখলেন। তারারা কোথা গেল? যে দু'একটা আছে, তাদের আলোও যে ক্ষীণ হয়ে আসছে ক্রমশঃ। মিলিয়ে যাচ্ছে যেন। আকাশের রংও অদ্ভুত অপরূপ হয়ে গেল। রাত্রির ঘন-নীল যেন কিসের স্পর্শে কোমল হয়ে যাচ্ছে, গলে' যাচ্ছে, উজ্জ্বল হ'য়ে উঠছে; যে রং ফুটে উঠেছে তার কোন নাম নেই, প্রভাতের বার্তাবহ হয়েই সে রং আকাশে ফোটে। "ও—" সানন্দে বলে' উঠলেন সুরূপিণী—"ওই যে ঊষা!"

তাড়াতাড়ি তিনি নদী পার হয়ে গেলেন, গাছ-কোমর করে' পরে' নিলেন শাড়িটা, স্বল্পালোকিত সঙ্কীর্ণ পথ ধরে' আবার ছুটতে লাগলেন। ছুটতে ছুটতে শুনতে পেলেন পাখিদের কাকলী, যা গানের চেয়েও সুন্দর; বড় বড় গাছের ডালে ডালে ছোট ছোট বাসায় বসে'—যে বাসায় প্রণয়িনীর পাশে প্রণয়ী, ঘেঁষাঘেঁষি বসে' সারারাত কাটিয়েছে—সেই বাসায় বসে' ওই পাখির দল, ওই স্বচ্ছ-চক্ষু প্রাণোদ্বল বিহঙ্গমেরা শুরু করেছে জাগরণী গান, ভৈরোঁতে নয়, ভৈরবীতে নয়, হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাসে, প্রাণের অকুণ্ঠিত উচ্ছ্বাসে। সুরূপিণী ছুটছিলেন তবু তাঁর হৃদয় সাড়া দিল তাদের গানের ডাকে। তারাও যেন সু-উচ্চ মন্দিরের বাতায়ন থেকে সবিস্ময়ে দেখতে লাগল এই পলাতকা ছিন্নবসনা মহারাণীকে। একটুও না থেমে ছুটছিলেন তিনি ঘাস আর শ্যাওলায় ঢাকা গিরিপথে দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হ'য়ে।

একটু পরেই অতিকষ্টে একটা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে পড়লেন। দেখতে পেলেন অনেক নীচে পূর্বদিগন্তে দূরাগত আলোকবন্যার মতো প্রভাতের আবির্ভাব হচ্ছে। তরঙ্গের পর তরঙ্গে স্বচ্ছ উজ্জ্বল

হ'য়ে উঠছে দশদিক। অন্ধকার যেন কাঁপতে কাঁপতে আলো হ'য়ে যাচ্ছে। তারারা নিবে গেছে, মানুষের তৈরী শহরের রাস্তায় প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে যেমন রাস্তার আলো নিবিয়ে দেওয়া হয়, তেমনি এদেরও কে যেন নিবিয়ে দিয়েছে। স্বচ্ছ আলো প্রথমে মনে হল রজত-সন্নিভ, তারপর উত্তপ্ত হ'য়ে তা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল স্বর্ণ-কান্তিতে, স্বর্ণ রূপান্তরিত হ'ল অগ্নিতে, তারপর পাবক জীবন্ত শিখা মূর্ত হ'ল আকাশেঃ বড় বড় রক্তরেখায় রঞ্জিত হ'য়ে গেল পূর্বদিগন্ত। শীতল বাতাসের প্রথম নিশ্বাস নিয়ে নবজাতক যেন স্তব্ধ হ'য়ে রইল কয়েক মুহূর্ত, তারপর আন্দোলিত হ'য়ে উঠল জীবনাবেগ বন-বনান্তে প্রভাত সমীরণের চাঞ্চল্যে। হঠাৎ সূর্য দেখা দিলেন, অকস্মাৎ যেন আবির্ভূত হলেন দিনেন্দ্র, আলোকের তুর্যধ্বনি নীরবে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হল মেঘমালায়, বৃক্ষপল্লবে, পর্বতচূড়ায়, উপত্যকার লতা-গুল্ম-তৃণদলে। এই প্রোজ্জ্বল মহিমাময় দৃশ্যে সচকিত হ'য়ে উঠলেন সুরূপিণী, আশপাশের ঝোপঝাড় থেকে অন্ধকারগুলো যেন লাফিয়ে বেরিয়ে এল এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করল এই বিজয়ী বীরকে। প্রদীপ্ত গৌরবে দিবসের আবির্ভাব হল চতুর্দিকে, পূর্বদিগন্তে ধীরে ধীরে আরোহণ করতে লাগলেন সূর্যদেব তাঁর হিরণ্ময় রথে রাজকীয় প্রতাপে।

সুরূপিণী একটা দেওদার গাছে ঠেস দিয়ে বসেছিলেন, একটু ঢুলুনি এল। তাঁর ঢুলুনি দেখে সদ্য জাগরিত প্রফুল্ল বনভূমি উচ্চকণ্ঠে যেন ব্যঙ্গের হাসি হাসতে লাগল নানা সুরে। রাত্রির অন্ধকারের ভয়, প্রভাতের অপূর্ব আবির্ভাবের শিহরণ আর মনে সাড়া জাগাচ্ছিল না। তপ্ত দিবসের নিরাবরণ রৌদ্রে এখন সুরূপিণী চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন। দূরে নীচের বনভূমির একপ্রান্তে দেখতে পেলেন ধোঁয়া উঠছে, একটা কালো থাম যেন উপরে উঠে বিলিয়ে দিচ্ছে নিজেকে আকাশের নীলে আর সূর্যের সোনায়। নিশ্চয়ই লোক আছে

ওখানে, আগুনের ধারে বসে' আছে ওরা। মানুষেরই হাত শুকনো ডালাপালা কুড়িয়ে আগুন জ্বেলেছে, ফুঁ দিয়ে দিয়ে সঞ্জীবিত করেছে সে আগুনকে। এখন সে আগুনের আলো আর উত্তাপ চোখে মুখে সর্বাঙ্গে পড়েছে ওদের। ছবিটা জীবন্ত হয়ে উঠল মনে, মনে হল একটু যেন শীত শীত করছে, মনে পড়ল তিনি গৃহহারা। রোদের তাপ বাড়তে লাগল, বনের সৌন্দর্য আর ভাল লাগল না, মানুষের সঙ্গ পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠল মন। গৃহের আশ্রয়, ছোট ছোট ঘরের গোপনতা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অগ্নি-বেদির পবিত্রতা—এরাই যেন আকর্ষণ করতে লাগল তাঁকে। ধোঁয়ার থামটা হাওয়ায় বেঁকে নদীর মতো হ'য়ে গেল, তারপর একটা ছোট ধ্বজার মতো উড়তে লাগল তাঁর দিকে ফিরে। তাঁর মনে হল ও তো আমায় ডাকছে। উঠে পড়লেন সুরূপিণী, আবার প্রবেশ করলেন পাহাড়ের জঙ্গলে।

নীচে নেমেই মনে হল, দিন তো এখনও পাহাড়ের উপরেই আছে, এখানে তো নামে নি, এখানে এখনও প্রদোষের কুহেলী আর শিশিরের খেলা চলছে। কিন্তু এখানে ওখানে, ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশকে ছাড়িয়ে যে বড় বড় দেওদার গাছেরা আকাশে তাদের জটিল শাখা-প্রশাখা বিস্তারিত করেছে সেখানে এসে পৌঁছে গেছে সূর্যালোক, ঝলমল করছে তরু-চূড়ারা প্রভাতকিরণে। দূরে দূরে পাহাড়গুলোর ফাঁকে ফাঁকেও দেখা যাচ্ছে দিবসের দীপ্তি। সুরূপিণী বন্যপথ ধরে' দ্রুতবেগে চলতে লাগলেন। ধোঁয়ার ধ্বজাটা আর দেখতে পেলেন না, ঢাকা পড়ে' গিয়েছিল সেটা। কিংবা হাওয়ায় উড়ে গিয়েছিল। কিন্তু কাছাকছি যে মানুষ আছে এর চিহ্ন আরও নানাভাবে পাওয়া গেল। কোথাও কাটা গাছের গুঁড়ি পড়ে' আছে, কোথাও এক বোঝা ঘাস, কোথাও শুকনো কাঠের গাদা। এই সবই পথ দেখাতে লাগল তাঁকে, কিছুদূর গিয়ে তিনি একটা ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়ালেন, কাছেই একটি ছোট্ট কুটির, এইখান থেকেই ধোঁয়া বেরুচ্ছিল। কাছেই একটি পাহাড়ী নদী পাহাড়ের ধাপে ধাপে যেন

নেচে নেচে চলেছে। কুটিরের ঠিক সামনে তামাটে রঙের রুক্ষ-মূর্তি এক কাঠুরে দাঁড়িয়ে ছিল। পিছনে দুহাত দিয়ে আকাশে মুখ তুলে কি দেখছিল যেন।

সুরূপিণী সোজা তার কাছে গেলেন। সুরূপিণী হয়তো বুঝতে পারছিলেন না, কি রকম অদ্ভুত দেখাচ্ছে তাঁকে। উজ্জ্বল-নয়না রূপসী, কিন্তু শীর্ণা ভিখারিণীর মতো; পোশাক-পরিচ্ছদ মূল্যবান কিন্তু ছেঁড়া, কানে তখনও হীরের দুল চকমক করে' দুলছে, কিন্তু যখন হাঁটছেন তখন বুকের ছেঁড়া কাপড়ের ফাঁক দিয়ে ছোট্ট একটি স্তন দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। রাত্রি প্রভাতের স্বপ্নময় সন্ধিক্ষণে, ঘন বনের রহস্য থেকে বেরিয়ে এল এ কে—মানবী না পরী—এই কথা মনে হ'ল লোকটির, ভয়ে একটু পিছিয়ে গেল সে।

"আমার বড় শীত করছে। বড় ক্লান্ত হয়েছি, তোমার উনুনের পাশে আমাকে একটু বিশ্রাম করতে দাও"—এই বলে' আর একটু এগিয়ে গেলেন সুরূপিণী।

বোঝা গেল কাঠুরেটি বিচলিত হয়েছে একটু। কিন্তু কোনও উত্তর দিল না সে।

"আমি এর দাম দেব"—সুরূপিণীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, কিন্তু বলেই তিনি অনুতপ্ত হলেন যখন দেখলেন এ কথা শুনে লোকটির চোখে ভয়ের আভাস ফুটে উঠল। কিন্তু এতে তিনি দমলেন না, বরং যেমন তাঁর স্বভাব, বাধা পেয়ে তাঁর সাহস আরও যেন বেড়ে গেল। তিনি লোকটিকে দ্বার থেকে সরিয়ে দিয়ে সোজা ভিতরে ঢুকে গেলেন। লোকটি সভয়ে সবিস্ময়ে অনুসরণ করল তাঁর।

ভিতরে গিয়ে সুরূপিণী দেখলেন ঘরটি অন্ধকার, মেজে এবড়ো-খেবড়ো। ঘরের এককোণে শান-বাঁধানো জায়গায় উনুনটি রয়েছে, শুকনো ডালপালা জ্বলছে, গনগনে আঁচটি চমৎকার। দেখেই যেন আরাম পেলেন সুরূপিণী। উনুনেন ধারে ঘেঁষে বসলেন গিয়ে।

তখনও শীতে কাঁপছেন, তবু আগুনের রূপ দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন। কাঠুরেটি তখনও নির্নিমেষে তাঁর দিকে চেয়ে ছিল ; তাঁর ছিন্নভিন্ন দামী পোশাকের দিকে, তাঁর উন্মুক্ত বাহুর দিকে, তাঁর বিপর্যস্ত জরি আর জহরতের দিকে চেয়ে নির্বাক্ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল সে। কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না।

"আমাকে কিছু খেতে দাও"—স্বরূপিণী বললেন—"এইখানে, এই উনুনের পাশেই দাও।"

লোকটি একটা ভাঁড়ে খানিকটা দেশী মদ, শালপাতায় কয়েকখানা শুকনো রুটি, একটা খুরিতে খানিকটা বাসী দই, আর কয়েকটা পেঁয়াজ এগিয়ে দিল। রুটিগুলো চামড়ার মতো শক্ত, দইটা খুব টক। পেঁয়াজ যদিও ভুঁই-ফোড় ফলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে' গণ্য, তবু কাঁচা পেঁয়াজ মহারাণীর পক্ষে সুখাদ্য নয়। কিন্তু তবু তিনি খেলেন, ভাল লাগছিল না, তবু সাহস করে' চেটেপুটে খেয়ে ফেললেন সব। মদের ভাঁড়টাকেও অবহেলা করলেন না। তিনি জীবনে এ রকম খাবার খান নি, এ রকম মদও খান নি। মেয়েরা সব অবস্থার সঙ্গেই সাহসের সঙ্গে যতটা খাপ খাইয়ে নিতে পারে, পুরুষরা ততটা পারে না। কাঠুরেটা একটি কথা বলে নি, আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছিল কেবল। তার মনে যে ভাব জাগছিল তা মোটেই উচ্চভাব নয়। লোভ, ভয় এবং আরও যেন কিছু সেখানে যে দ্বন্দ্ব শুরু করেছিল তার আভাস ফুটে উঠেছিল তার চোখের দৃষ্টিতে। স্বরূপিণী অনুভব করলেন এখানে থেকে এখনই চলে' যেতে হবে।

তিনি উঠে পড়লেন এবং দুটো টাকা দিলেন তাকে।

"এতেই হবে তো?"

এইবার লোকটার মুখে কথা ফুটল।

"ওতে হবে না, আরও চাই।"

"আর তো আমার কাছে নেই"—বলেই গম্ভীরভাবে গটগট

করে’ তার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। তাঁর বুকটা কেঁপে উঠল যখন তিনি দেখলেন লোকটা হাত বাড়িয়ে তাঁকে ধরবার চেষ্টা করছে। কুড়ুলটা ঘরের কোণে ছিল, সেদিকেও চাইছে সে। ছুটে বেরিয়ে গেলেন স্বরূপিণী। পশ্চিম দিকে যে পায়ে-চলা পথটা চলে’ গিয়েছিল সেইটে ধরেই ছুটতে লাগলেন তিনি পিছু দিকে না চেয়ে। রাস্তার বাঁক থেকেই আবার বন শুরু হয়েছিল, তার ভিতর ঢুকে পড়লেন তিনি, আর বড় বড় গাছের নীচে দিয়ে ছুটতে লাগলেন। অনেকক্ষণ ছুটলেন। যখন মনে হল আর ভয় নেই তখন থেমে হাঁপাতে লাগলেন।

মাথার উপর দেওদার গাছের শাখা-প্রশাখার আচ্ছাদন। স্বরূপিণী দেখলেন প্রখর দিবালোক হাজার হাজার জায়গায় সে আচ্ছাদনকে ভেদ করে’ বনের ভিতর প্রবেশ করেছে, গাছের গুঁড়িগুলো সে আলোয় লালে লাল হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে যেন আগুন লেগেছে। সে আলো প্রবেশ করেছে ঝোপঝাড়ের অন্ধি-সন্ধিতে, বিচিত্র সাজে সাজিয়েছে তাদের। সে আলো মরকতের মতো জ্বলছে ঘাসে ঘাসে। দেওদার গাছের গঁদের সৌরভে চতুর্দিক আমোদিত। তপ্ত রৌদ্রে দেওদাররা কি ধূপ জ্বেলেছে? মৃদুমন্দ হাওয়া বইছে, গাছের ডালপালা নড়ছে, তার সঙ্গে নড়ছে আলো ছায়া, নড়ছে ঘাসের উপর বিছানো মরকত-দ্যুতি, যেন একপাল রঙীন দুরন্ত পাখি কিংবা একঝাঁক মত্ত মধুকর পাগলের মতো উড়ে বেড়াচ্ছে, একটা অদ্ভুত মর্মরে কি যেন জাগছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে।

স্বরূপিণী চলছিলেন, ক্রমাগত চলছিলেন, চড়াই উতরাই ভেঙে, রৌদ্রে ছায়ায় অবিরাম চলছিলেন তিনি। কখনও রুক্ষ পাহাড়ের উপর দিয়ে, কখনও বন্য গিরগিটি আর সাপের কবল থেকে আত্মরক্ষা করে’, মেঘের সঙ্গে, সূর্যের সঙ্গে, গহন বনের অন্ধকারের নিবিড়তায় চলেই ছিলেন তিনি দ্রুতপদে। কোথায় যাচ্ছেন?

উপত্যকার গোলকধাঁধায় বন্য রাস্তা দিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবেই চলছিলেন তিনি। কখনও পাহাড়ের চূড়া থেকে দেখতে পাচ্ছিলেন আরও দূরের পর্বতমালা, দেখছিলেন বিরাট বিরাট পাখিরা আকাশে চক্রাকারে ঘুরছে, কখনও দূরে পাহাড়ের গায়ে ছোট পল্লী, পল্লী কিন্তু এড়িয়ে চলছিলেন তিনি। নীচে দেখতে পাচ্ছিলেন খরস্রোতা ফেনায়িতা পাহাড়ী নদীদের লীলা-নর্তন। কাছে ছোট ছোট উৎস, নিঃশব্দে মাটির ভিতর থেকে বেরুচ্ছে, শ্যাওলা আর কচি কচি ঘাসের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে যেন। কোথাও আবার একদল শিশু-নদী একত্রিত হয়ে বেরিয়েছে কোন গহ্বর থেকে আর পাথরের নুড়িতে ঠুনঠুন বাজনা বাজিয়ে ছোট ছোট জলাশয় সৃষ্টি করছে চড়ুই পাখিদের স্নানের জন্য, কোথাও বা আবার উঁচু পাহাড় থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তারা নীচের উপত্যকায় স্ফটিকস্বচ্ছ ধারায়। চলতে চলতেই এসব দেখছিলেন তিনি উজ্জ্বল দিবালোকে আনন্দে বিস্ময়ে আত্মহারা হ'য়ে। এমন অনন্য, এমন মর্মস্পর্শী, রঙে রসে গন্ধে ভরা এমন অপূর্ব অনুভূতি তাঁর ইতিপূর্বে আর হয় নি কখনও। নীল-আকাশঘেরা রূপকথালোকের ভিতর দিয়ে তিনি চলেছিলেন।

অবশেষে যখন খুব ক্লান্ত হ'য়ে পড়লেন তখন এসে পৌঁছলেন এক অগভীর জলাশয়ের ধারে। অগভীর কিন্তু বেশ প্রশস্ত। তার মধ্যে ছোট ছোট দ্বীপের মতো কালো কালো পাথর মাথা উঁচু করে' আছে, জলের ধারে ধারে বড় বড় ঘাস, নলখাগড়ার মতো। তীরে অসংখ্য দেওদারগাছ, জলের তলাতেও অসংখ্য দেওদারের ফল। দেওদার গাছের শিকড়ও এসে প্রবেশ করেছে সেই জলাশয়ের ভিতর, মনে হচ্ছে ছোট ছোট অন্তরীপ যেন, গাছগুলো ঈষৎ ঝুঁকে দেখছে তাদের। সুরূপিণী হামাগুড়ি দিয়ে জলের ধারে এসে বসলেন, স্বচ্ছ জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে অবাক হ'য়ে গেলেন। এ কে! এই কি মহারাণী সুরূপিণী? চোখের কোলে কালি, কাপড় জামা

ছিন্নভিন্ন, খোঁপা খুলে পড়ছে। একটু হাওয়া বইল, নড়ে উঠল প্রতিবিম্ব, তারপর এক ঝাঁক পোকা উড়তে লাগল সেটার উপর। স্বরূপিণী হাসলেন একটু, প্রতিবিম্বও হাসল, সে হাসিতে অনুকম্পার ছটাও দেখতে পেলেন তিনি। অনেকক্ষণ তিনি রোদে বসে' রইলেন। দেখলেন তাঁর হাত পা সব ছড়ে' গেছে, কতবার যে আছাড় খেয়েছেন তিনি। কি নোংরা হয়ে গেছে কাপড়চোপড়, হাত পা মুখ চোখ সবই নোংরা, আশ্চর্য হলেন এই বেশে তিনি এতক্ষণ আছেন কি করে'।

তারপর তিনি উঠলেন। ঠিক করলেন ওই আরণ্য আয়নার সাহায্যেই একটু ঠিকঠাক করে' নিতে হবে নিজেকে, একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হবেন, গা-হাত-পা-মুখে জল দিয়ে ময়লাগুলো ধুয়ে ফেলবেন। প্রথমেই তাঁর দামী গয়নাগুলো খুলে একটা পুঁটুলিতে বাঁধলেন, তারপর ছিন্নভিন্ন শাড়ি কাঁচুলি ওড়নাটাকে গুছিয়ে পরলেন আবার, কুন্তল আলুলায়িত করে' চূড়ার মতো করে বেঁধে নিলেন সেটা। বাঁধতে বাঁধতে একটা কথা মনে পড়ল। গন্ধরাজ বলতেন তোমার চুলে সুবাস আছে। আছে না কি? শুঁকে দেখলেন, কই না। হাসলেন একটু। তাঁর সেই ছোট্ট হাসিরও প্রতিধ্বনি ফিরে এল। তারপর উপরের দিকে চেয়ে দেখলেন একটি ছোট মেয়ে আর তার চেয়েও ছোট একটি ছেলে, জলাশয়ের ওপারে একটা দেওদার গাছের নীচে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে তাঁকে দেখছে। যেন দুটি পুতুল। স্বরূপিণী ছোট ছেলেদের তত পছন্দ করেন না, ওদের দেখে তাঁর ভয় হ'ল একটু।

"কে তোমরা"—একটু রুক্ষকণ্ঠেই প্রশ্ন করলেন।

ওরা দু'জনই ভয় পেয়ে পেছিয়ে গেল। তখন তাঁর মনে হ'ল ছি, ছি, ওদের সঙ্গে এমনভাবে কথা কওয়া ঠিক হয় নি। ভয় পেয়ে গেছে বেচারারা। কি সুন্দর দেখতে, চোখের দৃষ্টিতে কি স্বচ্ছতা। বনের ছোট ছোট পাখিদেরই সগোত্র ওরা। পাখির চেয়ে একটু

বড়, কিন্তু পাখির চেয়ে ঢের বেশী সরল। ইচ্ছে হ'ল ওদের সঙ্গে ভাব করি।

"এস না, এখানে এস, ভয় কি।"

তাদের দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে ছুটে পালাল তারা, অদৃশ্য হ'য়ে গেল বনের ভিতর। নিদারুণ ব্যথা পেলেন এতে। একটা শাণিত সত্য যেন বুকে এসে বিঁধল। তাঁর বাইশ বছর বয়স হ'ল—শীঘ্রই তেইশ হবে—কিন্তু কেউ তাঁকে ভালবাসে না। কেউ না। গন্ধরাজ হয়তো বাসতো। কিন্তু সে কি তাঁকে ক্ষমা করবে? তাঁর দু'চোখ জলে ভরে' এল। তখনি মনে হল এখন যদি এখানে কাঁদতে বসি তাহলে সে কান্না তো শেষ হবে না। আমরণ বসে' কাঁদতে হবে। পাগলও হ'য়ে যেতে পারি। না, এখানে বসে' থাকলে চলবে না। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। জ্বলন্ত কাগজকে লোকে যেমন পায়ে চেপে নিবিয়ে দেয় তাঁর এই চিন্তাগুলোকে তেমনি দুপায়ে মাড়িয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। চুলটা ঠিক করে' নিলেন—এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলেন একবার—নিশ্চয়ই কাছে বস্তি আছে—ভয় হ'ল, তাড়াতাড়ি আবার চলতে শুরু করলেন।

দুপুরের কাছাকাছি সময়ে তিনি রাজপথে এসে পৌঁছলেন। রৌদ্রালোকিত পথটা দুটো বড় বড় ঝোপের মাঝে দিয়ে পাহাড়ের উপর উঠে গেছে। মনে হচ্ছে পথ নয়, যেন আলোর নদী। প্রকাণ্ড চড়াই। কিন্তু তিনি আর পারছিলেন না। ক্লান্তিতে সমস্ত শরীর ভেঙে পড়ছিল। যা হবার হোক এই ভেবে রাস্তার ধারে একটা গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়লেন তিনি, সভ্যতার প্রতীক এই রাজপথের সান্নিধ্যে এসে অজ্ঞাতসারে একটু নির্ভয়ও হলেন হয়তো। সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে এল, মনে হ'তে লাগল ক্লান্তিতে বোধহয় মূর্ছাই গেলেন, কিন্তু মূর্ছা নয়, ঘুমই। যখনই তিনি আত্মসমর্পণ করলেন তখনই নিদ্রা যেন তাঁকে কোলে তুলে নিল। সমস্ত দুঃখ, সমস্ত কষ্ট

অতিক্রম করে' নিমেষে তিনি বাড়িতে ফিরে গেলেন মায়ের বুকে। রাজপথের ধারে বে-পরদা হ'য়ে শুয়ে রইলেন মহারাণী, তাঁর ছিন্ন-ভিন্ন বিপর্যস্ত বিলাসবসন ধুলোয় লুটোতে লাগল। পাখিরা উড়তে লাগল আশেপাশে আর পাখিদের ভাষায় পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল—এ কে, এ কে।

সূর্য আরও উপরে উঠলেন। মহারাণীর পায়ের কাছ থেকে ছায়া সরে' গেল, ক্রমশঃ আরও সরতে লাগল। একেবারে যখন সরে' যাচ্ছে তখন দূরে একটা গাড়ির চাকার শব্দে চাঞ্চল্য জাগল পাখিদের মধ্যে। ওই অঞ্চলে রাস্তাটা খুব খাড়া, চাকার আর্তনাদ থেকেই বোঝা যাচ্ছিল সেটা। একটু পরেই একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক হাঁটতে হাঁটতে এসে হাজির হলেন সেখানে। মাঝে মাঝে তিনি পেন্সিল দিয়ে একটি নোটবুকে কি যেন লিখে নিচ্ছিলেন, আর মাঝে মাঝে আপনমনে কথাও বলছিলেন নিজের সঙ্গে, মনে হচ্ছিল কোনও কবি বুঝি কবিতা লিখে মৃদুকণ্ঠে সেটা পড়ে' দেখে নিচ্ছেন ছন্দটা ঠিক হয়েছে কি না। গাড়ির চাকার শব্দ তখনও অনেক দূরে। বোঝা গেল গাড়িকে ছাড়িয়ে তিনি অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছেন।

সুরূপিণী যেখানে শুয়েছিলেন তার খুব কাছাকাছি এসেও তাঁকে প্রথমে দেখতে পান নি তিনি। তারপর হঠাৎ পেলেন। দেখেই চমকে উঠলেন তিনি, খাতা-পেন্সিল পকেটে পুরে, আরও কাছে এলেন। কাছেই পাথর ছিল একটা। তার উপর বাগিয়ে বসে' ভ্রূকুঞ্চিত করে' দেখতে লাগলেন তিনি সুরূপিণীকে। অনেকক্ষণ দেখলেন। পা গুটিয়ে হাত গুটিয়ে পাশ ফিরে শুয়েছিলেন তিনি নিটোল বাহুর উপর মাথা রেখে। মনে হচ্ছিল প্রাণহীন নিস্পন্দ। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসেও তাঁর বুক উঠছিল পড়ছিল না। জীবনের কোনও লক্ষণই নেই, একটা মড়াকে কারা যেন রাস্তায় ফেলে দিয়েছে। প্রগাঢ় ক্লান্তির ভাষা সর্বাঙ্গে পরিস্ফুট। ভদ্রলোক

মুখ টিপে হাসলেন একটু। একটা মর্মরমূর্তি দেখলে তিনি যা করতেন তাই করলেন। অনিচ্ছাসহকারে হ'লেও মহারাণীর মুখের চোখের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের, তাঁর রূপের, প্রসাধনের একটা তালিকা প্রস্তুত করতে লাগলেন মনে মনে। ওই তন্বী দেহের অনাবৃত ঘুমন্ত মহিমায় বিস্মিত হলেন তিনি। মনে হ'ল এই নিরাবরণ নিরাভরণ নিদ্রা অপরূপ মানিয়েছে তাঁকে, নূতন রূপে অলংকৃত করেছে তাঁর সর্বাঙ্গ।

"কি আপদ"—ভাবলেন তিনি—"মেয়েটা যে এত সুন্দরী তা তো ভাবি নি। আর এক আপদ, একথা আমি ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করতে পারব না কোথাও—"

তাঁর হাতে একটা ছড়ি ছিল। সেইটে দিয়ে সুরূপিণীর পায়ে ঈষৎ খোঁচা দিলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে সুরূপিণী চীৎকার করে' উঠে বসলেন ধড়মড়িয়ে এবং তাঁকে দেখে চেয়ে রইলেন বিস্ফারিত চক্ষে।

"মহারাণীর আশা করি সুনিদ্রা হ'য়েছে"—মাথা নেড়ে প্রশ্ন করলেন তিনি। কিন্তু মহারাণীর মুখ দিয়ে অসংলগ্ন শব্দ বেরুতে লাগল শুধু।

"আপনি ভয় পাবেন না, স্থির হোন। আমার গাড়ি পিছনে আসছে, আশা করি মহারাণীর সহযাত্রী হবার পরম সৌভাগ্য আমার হবে।"

"পণ্ডিত ভগীরথ শর্মা!"—সুরূপিণী তাঁকে চিনতে পারলেন অবশেষে।

"মহারাণীর আদেশ পালন করতে সর্বদাই প্রস্তুত।"

সুরূপিণী দাঁড়িয়ে উঠলেন।

"ও, আপনি পার্বতী থেকে আসছেন কি?"

"আজ সকালেই আমি পার্বতী ত্যাগ করেছি। আর ফিরব না সেখানে। আপনি ছাড়া সেখানে না ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা যদি আর কারো থাকে তাহলে সে ব্যক্তি আমি।"

"প্রধানমন্ত্রী কপিঞ্জল—"

বলেই থেমে গেলেন সুরূপিণী।

"আপনি সৎকার্যই করেছিলেন, আপনি দ্রৌপদীর চেয়ে বড় বীরাঙ্গনা, ভীমের সাহায্য না নিয়েই কীচক বধ করতে উদ্যত হয়েছিলেন, কীচক কিন্তু মরে নি। কয়েকঘণ্টা কেটে গেছে। শুনেছি তিনি ভাল আছেন। সকালে বেরুবার আগে আমি খবর নিয়েছিলাম, ওঁরা বললেন, ভাল আছেন, কিন্তু যন্ত্রণা আছে খুব। অ্যাঁ? হ্যাঁ খুব। পাশের ঘর থেকে তাঁর কাতরানি শোনা যাচ্ছে না কি—"

"আর মহারাজা? তাঁর কোনও খবর পেয়েছেন?"

ভগীরথ শর্মা প্রশ্নটা শুনে একটু আমোদ অনুভব করলেন এবং একটু থেমে বললেন—"লোকে বলছে এর সঠিক খবর একমাত্র আপনিই দিতে পারেন না কি।"

সুরূপিণী এ কথার জবাব না দিয়ে একবার চোখ তুলে চাইলেন তাঁর মুখের দিকে। তারপর অন্য প্রসঙ্গ পাড়লেন—"আপনার গাড়ি আছে? আপনি কি দয়া করে' আমাকে শূলপাণি দুর্গে পৌঁছে দিতে পারবেন? সেখানে আমার খুব জরুরী দরকার আছে একটা—"

"নিশ্চয় পারব। আপনার অনুরোধ অগ্রাহ্য করতে পারি কি?" —ভগীরথ শর্মা গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন—"আমার ক্ষমতায় যতটুকু কুলুবে তা আমি সানন্দে করব। আমার গাড়ি এখনি এসে পড়বে। আপনি সেটা যেখানে খুশি নিয়ে যান। কিন্তু"—আবার তাঁর কণ্ঠে ব্যঙ্গের সুর ফুটল—"আপনি তো রাজপ্রাসাদের কথা কিছু জানতে চাইলেন না?"

"ওর জন্যে আমার একটুও মাথা-ব্যথা নেই। মনে হচ্ছে কাল আমি ওটা পুড়তে দেখেছি—"

"অদ্ভুত তো! মনে হচ্ছে আপনার? এতগুলো প্রসাধনসামগ্রী

পুড়ে গেল, অথচ আপনি নির্বিকার। প্রশংসা করছি আপনার মনের জোরের! রাজ্য সম্বন্ধেও আপনার মাথা-ব্যথা নেই না কি? আমি যখন এলাম তখন নূতন শাসন-তন্ত্রের বৈঠক বসেছে—নূতন শাসনতন্ত্রের দু'জনের নাম নিশ্চয়ই আপনার পরিচিত। একজন সাপ্রা, যে আপনার ভৃত্য হবার সৌভাগ্যলাভ করেছিল—ফাইফরমাশ খাটবার চাকর ছিল কি?—আর দ্বিতীয় লোকটি হচ্ছেন কুজ্ঝটি-কুমার, তিনি এখন অবশ্য আর মহাধ্যক্ষ নন, নিম্নপদস্থ কর্মচারী। এই রকমই হয়, রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় নীচুরা উপরে উঠে যায়, আর উপরের লোকেরা নীচে নেমে আসে।"

"মহামান্য শর্মাজি, আপনি নিশ্চয়ই এসব কথা আমার ভালোর জন্যেই বলছেন, কিন্তু আমি বলছি ওসব জানবার আমার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই।"

ভগীরথ শর্মা একথা শুনে বেশ একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়লেন। গাড়িটা দূরে দেখা যেতেই বেঁচে গেলেন যেন, কিছু একটা বলবার জন্যেই যেন বললেন, "চলুন আমরা হেঁটে গিয়েই চড়ি ওটাতে।"

তাই হ'ল। তিনি সসম্ভ্রমে সুরূপিণীকে আগে গাড়িতে চড়িয়ে দিয়ে তারপর নিজে চড়লেন। গাড়ির ভিতর নানারকম টুকিটাকি জিনিসে ভরতি ছিল। তিনি কিছু ফল বার করলেন, কয়েক টুকরো মেটে-ভাজা, চমৎকার রুটি আর এক বোতল গৌড়ী সুরা। বোতলটা পাথরের। এসব বার করে তিনি সুরূপিণীকে খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, মনে হল বাবা যেন অবাধ্য মেয়েকে সাধছেন। এ সময় আতিথ্যের রীতিবিরুদ্ধ কোনও অভদ্র আচরণ তাঁর ব্যবহারে প্রকাশ পেল না, কণ্ঠে ধ্বনিত হল না কোনও ব্যঙ্গের সুর। তাঁর আন্তরিকতায় মুগ্ধ হলেন সুরূপিণী। কৃতজ্ঞও হলেন।

বললেন, "শর্মাজি, আমি জানি আপনি আমাকে ঘৃণা করেন, আজ এত সদয় কেন?"

এ কথার কোন প্রতিবাদ না করে তিনি বললেন—"ও, কেন? আপনার স্বামীর বন্ধুত্বলাভের সৌভাগ্য হয়েছে যে আমার। তাঁকে খানিকটা ভালও লেগেছে।"

"পছন্দ হয়েছে! কিন্তু শুনেছি আমাদের দুজনের সম্বন্ধেই অনেক নিষ্ঠুর কটুবাক্য লিখেছেন আপনি।"

"হ্যাঁ, ওই অদ্ভুত পথ দিয়েই আমরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। বিশেষ করে' আপনার সম্বন্ধে আমার সমালোচনা বিশেষ রকম নিষ্ঠুর এবং কটু হয়েছিল—ওই দুটো শব্দই তো আপনি ব্যবহার করলেন। আপনার স্বামী আমার বন্দীত্ববন্ধন মোচন করে' আমাকে স্বাধীন করে' দিলেন, রাজ্য ত্যাগ করবার ছাড়পত্র লিখে দিলেন, আমার জন্যে একটা গাড়ি ঠিক করে' দিলেন। তারপর ছেলেমানুষের মতো বললেন, আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করব। তাঁর দাম্পত্যজীবনের খবর আমি জানতাম, তাই তাঁর এই সাহস আর আপনার সম্মান রক্ষা করবার জন্যে তাঁর আগ্রহ দেখে ভারী মজা লাগল আমার। তিনি কি বলেছিলেন শুনবেন? বলেছিলেন—'আপনি আমাকে যদি মেরে ফেলেন কেউ আমার অভাব অনুভব করবে না, কেউ আমার জন্যে কাঁদবে না।' বোধহয় আপনিও পরে এই ধরনের কিছু একটা ভেবেছিলেন। অন্য কথায় এসে পড়ছি। আমি তাঁকে বললাম—'আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করা অসম্ভব আমার পক্ষে।' তিনি উত্তর দিলেন—'আমি যদি আপনাকে আঘাত করি, তাহলেও অসম্ভব?' কি অদ্ভুত কাণ্ড দেখুন! আমার ইচ্ছে ছিল এ ঘটনাটাও আমার রোজনামচায় লিখে রাখব। কিন্তু আমি হেরে গেলাম, ভদ্রতা আর আন্তরিকতার কাছে পরাজয় ঘটল আমার, গন্ধরাজকে ভালবেসে ফেললাম। আপনাদের সম্বন্ধে যা যা লিখেছিলাম অনেক কলঙ্কের কথা ছিল তাতে—তা ছিঁড়ে ফেলতে হ'ল তাঁর সামনে। আমি আপনার সঙ্গে এখন যে ব্যবহার করছি তার জন্যে আপনি আপনার স্বামীর কাছে ঋণী মহারাণী।"

সুরূপিণী চুপ করে' বসে' রইলেন খানিকক্ষণ। তিনি যাদের ঘৃণা করেন তাদের কাছ থেকে নিজের সম্বন্ধে সুবিচার তিনি প্রত্যাশা করেন না। গন্ধরাজের মতো সকলকে খুশী করার ক্ষমতা তাঁর নেই, প্রবৃত্তি নেই। নিজের মতে নিজের পথে মাথা উঁচু করে সোজা গিয়ে লক্ষ্যস্থলে পৌছনই তাঁর স্বভাব। কিন্তু ভগীরথ শর্মার কথা শুনে, বিশেষ করে' তিনি তাঁর স্বামীর বন্ধু এ খবর পেয়ে, তিনি নিজেকে অবনত করলেন একটু।

"আমার সম্বন্ধে কি ধারণা আপনার?"—হঠাৎ জিগ্যেস করলেন তিনি।

"সে তো আগেই বলেছি। আমার ধারণা আপনার আর এক পাত্র গৌড়ী পান করা উচিত।"

"কথাটা আপনি এড়িয়ে যাচ্ছেন। এটা তো আপনার স্বভাব নয়। আপনি তো সত্য কথা বলতে ভয় পান না। আপনি বললেন আপনি আমার স্বামীকে পছন্দ করেন। আমার সম্বন্ধেও সত্য কথাটা বলুন—"

"আপনার সাহসকে আমি প্রশংসা করছি। কিন্তু তার বেশী আর কি বলব। আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন, মুখ ফুটে বলেওছেন, আমাদের রুচির পার্থক্য আছে।"

"আপনি যে কেলেঙ্কারি আর কলঙ্কের কথা লিখেছিলেন সত্যিই কি তা খুব বেশী শুনেছিলেন আপনি?"

"বেশ বেশী—প্রচুর।"

"আপনি সে সবে বিশ্বাস করেছেন?"

"মহারাণী—এ কি প্রশ্ন!"

"আপনার উত্তরের জন্য ধন্যবাদ",—উষ্মাভরে বললেন সুরূপিণী—"কিন্তু আপনার মুখের উপরই আমি বলছি, আমার ধর্ম, আমার ভগবান, আমার আত্মা, আমার সম্মান সাক্ষী—শত কেলেঙ্কারি শত কুৎসা সত্ত্বেও সত্য কথা হচ্ছে আমি অকলঙ্কিতা, আমি সতী।"

"এরকম ব্যাখ্যায় বোধহয় আমি সায় দিতে পারব না।"

"আমি জানি, আমি আমার স্বামীর সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেছি। কিন্তু সে কথা বলছি না। আপনি যদি আমার স্বামীকে ভালবাসেন, তাহলে আমি দাবি করছি আপনি আমার কথাটাও বুঝুন। আমি নির্ভয়ে আমার স্বামীর মুখের দিকে চাইতে পারি, আমার চোখের দৃষ্টি একবারও কাঁপবে না—"

"হতে পারে। কাঁপবে একথা তো আমি বলছি না।"

"তাহলে আপনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন না? আপনার ধারণা আমি তাহলে অসতী? ওই লোকটা আমার প্রণয়ী?"

"মহারাণী, আমি যখন ওই কাগজগুলো ছিঁড়ে ফেলেছিলাম তখনই আমি আপনার স্বামীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি আপনার ব্যাপার নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাব না। আমি আবার বলছি আপনার ভালো-মন্দর বিচার করবার আমার একটুও ইচ্ছে নেই।"

"কিন্তু আমি যে নির্দোষ একথা আপনি মানবেন না? কিন্তু সে মানবে, সে আমাকে ভাল করে চেনে।"

ভগীরথ শর্মা হাসলেন।

"আপনি আমার দুঃখ দেখে হাসছেন?"

"দুঃখ দেখে নয়, আপনার সাহস দেখে। কোনও পুরুষ এরকমভাবে নিজের সাফাই গাইবার সাহস পেত কি না সন্দেহ। আপনি যা করছেন তা হয়তো খুবই স্বাভাবিক, যা বললেন তাও হয়তো সত্যি। তাহলে শুনুন, আপনি যখন আমার মতামত শুনতে এত উৎসুক—আপনি যা আপনার দুঃখকষ্ট বলে' বর্ণনা করছেন তা শুনে আমার বিন্দুমাত্র করুণা হচ্ছে না। আপনি অত্যন্ত স্বার্থপর, আপনি যে বীজ বপন করেছিলেন তারই ফসল ফলেছে। আপনি যদি কেবল নিজের কথা না ভেবে আপনার স্বামীর কথা একবারও ভাবতেন, তাহলে আপনি এমন একা পড়ে' যেতেন না, এমনভাবে আপনাকে পালাতে হ'ত না, ঘাতকের মতো

আপনার হাতে রক্তের ছাপ লাগত না, আর একজন বৃদ্ধ বিমর্ষ গৌড়বাসীর মুখে আপনার সম্বন্ধে এইসব সত্য কথাও শুনতে হ'ত না, যা কুৎসার চেয়েও বেশী তিক্ত।"

"আপনাকে ধন্যবাদ"—সুরূপিণীর কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল—"যা বললেন তা সত্যি, খুব সত্যি। এখন আপনার গাড়িটা থামাবেন?"

"না, যতক্ষণ না আপনি দেহে-মনে সুস্থ হচ্ছেন ততক্ষণ থামাব না।"

গাড়ি চলতে লাগল। একটা পাহাড় একটা প্রকাণ্ড বনভূমি পার হ'য়ে গেল।

"এইবার আমি সুস্থ হয়েছি। আবার আপনাকে অনুরোধ করছি, আমাকে নাবিয়ে দিন।"

"এটা তো অবুঝের মতো কথা। থাকুন না গাড়িতে—চারদিকে পাহাড়—"

"মহামান্য শর্মাজি, ওই পাহাড়ে যদি স্বয়ং মৃত্যুও আমার অপেক্ষায় বসে' থাকে তবু আমি নাবব। আমি আপনাকে দোষ দিচ্ছি না, ধন্যবাদ দিচ্ছি। অপরের চোখে আমি যে কি তা আমি এখন বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমার সম্বন্ধে যাঁর ওই রকম ধারণা তাঁর সঙ্গে আমি এক গাড়িতে বসে' যাব?—না, না, কিছুতেই না, আপনি গাড়ি থামান—"

ঘণ্টা বাজিয়ে গাড়ি থামালেন ভগীরথ শর্মা। তারপর নিজে নেবে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন যাতে মহারাণী নির্বিঘ্নে নামতে পারেন। কিন্তু মহারাণী সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলেন না, নিজেই লাফিয়ে নেমে পড়লেন।

রাস্তাটা এতক্ষণ ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের উপরে উঠছিল, এইবার সেটা উপত্যকা থেকে বেরিয়ে গর্জনগাঁওয়ের উত্তরে আর একটা উঁচু পাহাড়ের উপর দিয়ে ঠিক যেন কার্নিসের মতো হ'য়ে চলে' গিয়েছিল আরও উপরে। তাঁরা যেখানে নেবেছিলেন সেখানে

প্রকাণ্ড একটা বাঁক। মাথার উপরে প্রকাণ্ড একটা পাথরের চাঙড় আর ঝঞ্ঝাহত কয়েকটা দেওদার গাছ ঝুলছিল, নীচে অনেক নীচে, দেখা যাচ্ছিল উপত্যকার নীল সমতলভূমি সবুজ দিগন্তের সঙ্গে কোলাকুলি করছে—আর সামনে রাস্তাটা এঁকেবেঁকে বিরাট একটা সাপের মতো উঠে গিয়েছিল আরও উপরে। সেখানে একটা উচ্চ গিরিচূড়ার উপর একটা তুর্গ দাঁড়িয়েছিল দৃষ্টিরোধ করে'।

ভগীরথ শর্মা অঙ্গুলিনির্দেশে জানালেন—"ওই হচ্ছে শূলপাণি, আপনার গন্তব্যস্থান। কামনা করি আপনার যাত্রা শুভ হোক। আপনাকে আর একটু সাহায্য করতে পারলে আমি সত্যিই খুশী হতাম, কিন্তু তাতো আর হ'ল না।"

তিনি গাড়িতে চড়ে' ইঙ্গিত করতেই গাড়ি চলতে শুরু করল। স্বরূপিণী রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে রইলেন সামনের দিকে চেয়ে, মনে হ'তে লাগল কিছু দেখতে পাচ্ছেন না, চোখ তুটো যেন অন্ধ হ'য়ে গেছে। ভগীরথ শর্মার কথা আর ভাবছিলেন না তিনি, যাদের তিনি ঘৃণা করেন মুহূর্তের জন্যও মনে স্থান দেন না তাদের, তারা ক্রমশঃ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হ'য়ে অবশেষে বিলীন হ'য়ে যায় তাঁর মন থেকে। এখন তিনি ভাবছিলেন অন্য কথা। গন্ধরাজের সঙ্গে তাঁর শেষ সাক্ষাৎকারের কথা তিনি ভোলেন নি, এজন্য গন্ধরাজকে ক্ষমাও করেন নি। কিন্তু এখন ব্যাপারটা নূতন আলোকে নূতন রূপে প্রতিভাত হয়েছে তাঁর মনে। তিনি অপমানিত হ'য়ে তাঁর কাছে গিয়েছিলেন, তবু এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথা ঘুণাক্ষরে বলেন নি। তাঁর সম্মান রক্ষা করবার জন্যই তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন ভগীরথ শর্মার মতো বীরকে। হ্যাঁ তাঁর জন্যই। অথচ—। দেখতে দেখতে সমস্ত ছবিটারই মানে বদলে গেল। তিনি যে তাঁকে ভালবাসেন, তাতে সন্দেহ রইল না। এ সামান্য তুর্বলতামাত্র নয়, এ পৌরুষের বীরত্ব। কিন্তু তিনি? তাঁর কি ভালবাসার ক্ষমতাই নেই? আপাতদৃষ্টিতে তাই তো মনে হয়।

সহসা তাঁর দুই চোখ জলে ভরে' এল, গন্ধরাজকে দেখবার জন্যে, তাঁকে সব কথা খুলে বলবার জন্যে আকুল হ'য়ে উঠলেন। তাঁর অপরাধের জন্য হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চাইবেন তিনি। আর সমস্ত আশা ভরসা যদি চিরতরে নির্বাপিত হ'য়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তাঁর যে স্বাধীনতা তিনি অপহরণ করেছেন সেটা অন্ততঃ ফিরিয়ে দেবেন তাঁকে।

আবার দ্রুতপদে যাত্রা শুরু করলেন। ঘোরানে সিঁড়ির মতো রাস্তা দিয়ে তিনি পর্বত-সমীরণ-স্নাত রৌদ্রোজ্জ্বল শূলপাণিকে লক্ষ্য করেই চলতে লাগলেন। মাঝে মাঝে অনেক উঁচুতে, কখনও তাকে দেখতে পেলেন, আবার কখনও পাহাড়ের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে সে যেন লুকিয়ে পড়ল। আবার দেখা দিল একটু পরে।

কুড়ি

গন্ধরাজ যখন তাঁর চলন্ত কারাগারে উঠলেন তখন দেখলেন আর একজন কে যেন সামনের আসনে কোণের দিকে বসে' আছে। মাথা নীচু করে' বসে' ছিল লোকটি, গাড়ির আলো বাইরের দিকে পড়ছিল, তাই গন্ধরাজ শুধু একটি লোককেই দেখলেন। সেনাপতি ধূর্জটিপ্রসাদ সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে গাড়ির কপাট বন্ধ করে' দিতেই গাড়ির চারটি ঘোড়াই অবিলম্বে কদমচালে চলতে শুরু করল।

"দেখুন"—একটু পরে গলা খাঁকারি দিয়ে ধূর্জটি সিং বললেন—"মানে এমন চুপচাপ করে' না গিয়ে একটু ঘরোয়াভাবে গেলে কেমন হয়। আপনাদের চোখে আমি অবশ্য ঘৃণ্য লোক, কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি অসভ্য নই। আমি বই পড়তে ভালবাসি, বিদ্যাপতি কালিদাস ভবভূতি আমার কণ্ঠস্থ, বিদগ্ধ লোকের সঙ্গে আড্ডা দেবার সুযোগ পেলে হাতে স্বর্গ পাই। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে আমাকে বিদেশে এসে প্রহরীর চাকরি নিতে হয়েছে। আজ কিন্তু মহা সুযোগ পেয়ে গেছি, অনুরোধ করছি, আমাকে হতাশ করবেন না। ছাত্রসভার বাছাইকরা দুটি অমূল্য রত্নকে আজ পেয়েছি—অবশ্য রূপসী সদস্যাদের কথা বাদ দিয়ে—একজন সুপ্রসিদ্ধ স্বনামধন্য গ্রন্থকার পণ্ডিত এবং—"

"এ কি, ইন্দীবর না কি"—সবিস্ময়ে বলে' উঠলেন গন্ধরাজ।

"মনে হচ্ছে আমাদের দুজনকে এক গাড়িতে একসঙ্গেই যেতে হবে। মহারাজ বোধহয় এটা প্রত্যাশা করেন নি।"

"মানে? তুমি কি ভেবেছ আমি তোমাকে বন্দী করেছি?"

"এ সিদ্ধান্তে আসা খুব দুরূহ তো নয়।"

"সেনাপতি ধূর্জটি সিং"—গন্ধরাজ বললেন—"আপনার তো কিছুই অবিদিত নেই। ব্যাপারটা পরিষ্কার করে' বুঝিয়ে দিন ইন্দীবরকে।"

"দিচ্ছি। আপনারা দুজনেই মহারাণী সুরূপিণীর আদেশে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হ'য়ে শূলপাণি দুর্গে চলেছেন। আদেশপত্রে মহারাণীর স্বাক্ষরের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী কপিঞ্জলের স্বাক্ষর আছে। পরশু দিন আদেশপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। যা বলছি সেটা গোপনীয় কথা।"

"গন্ধরাজ"—ইন্দীবর বললেন—"অকারণে তোমাকে সন্দেহ করেছিলাম বলে' ক্ষমা চাইছি।"

"ইন্দীবর, যা চাইছ তা কিন্তু তোমাকে দিতে পারব কি না জানি না।"

"মহারাজ"—একটু ইতস্ততঃ করে' ধূর্জটিপ্রসাদ বললেন—"আমি জানি আপনি উদার দিলদরিয়া লোক। আমি যা করতে যাচ্ছি আশা করি তাতে আপনি আপত্তি করবেন না। আমাদের দেশে ঠাকুর ঘরে আলো জ্বেলে দেওয়া নিয়ম। এখানেও আমি একটা আলো জ্বেলে দিতে চাই। সঙ্গে এনেছি—"

সত্যিই তিনি একটা উজ্জ্বল বাতিদান লাগিয়ে দিলেন গাড়ির ভিতরে। ভিতরটা বেশ আলোকিত হ'য়ে উঠল। তারপর তিনি বললেন, "আমাদের দেশে আর একটা নিয়ম আছে। কোনও গাছে ফুল না ফুটলে আমরা পৈঠী সুরা দিয়ে তার অর্চনা করি। সে সুরাও এনেছি কিছু।" তিনি গাড়ির আসনের নীচে থেকে একটা ঝুড়ি টেনে বার করলেন, দেখা গেল অনেকগুলি বোতলের গলা বেরিয়ে আছে তার ভিতর থেকে।

"অধ্যাপক মশাই, আপনি রাগ করবেন না তো। আপনারা আমার অতিথি এখন, আমাকে আপনাদের সেবা করবার সুযোগ দিন, বিশেষতঃ আমার এই চাকরিটার জন্যে একটু বিব্রতবোধ

করছি, আপনারা যদি আমার অনুরোধ না রাখেন তাহলে আরও বিব্রত হব। শ্রীমান মহারাজা গন্ধকুমারের মঙ্গল হোক।"

এই বলে' ধূর্জটিপ্রসাদ একপাত্র পৈঠী সুরা পান করে' ফেললেন।

গন্ধরাজ হেসে বললেন—"আমাদের সেনাপতি মশায় রসিক লোক দেখছি। দিন তাহলে আমাকেও একপাত্র। আপনার মঙ্গল কামনা করে' আমিও পান করে' ফেলি সেটা—"

এরপর আর আড়ষ্টতা রইল না। তিনজনেই মহানন্দে মদ্যপান করতে লাগলেন। একটা ঝাঁকানি দিয়ে গাড়িটা মোড় পার হ'ল, তারপর আরও দ্রুতবেগে চলতে লাগল রাজপথ ধরে'।

গাড়ির ভিতরটা আলোকিত ছিল বলে' দেখা গেল ইন্দীবর ভারতীর গাল দুটো লাল হ'য়ে উঠেছে। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল অস্পষ্ট গাছের সারি আসছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে, আকাশে নক্ষত্রের সারিও চলছে সঙ্গে সঙ্গে, কখনও কখনও ঢাকা পড়ে' যাচ্ছে পাহাড়ের আড়ালে, আবার দেখা দিচ্ছে। বিরাট আকাশ মাঝে মাঝে একফালি মণিমুক্তাখচিত কালো ওড়নার মতোও মনে হচ্ছে, মাঝে মাঝে হু হু করে' হাওয়া ঢুকছে নিশীথ রাত্রির রহস্যময় স্বাদ বহন করে'। চাকার শব্দ, ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ মুখরিত করে' তুলেছে পার্বত্য বন্যপথকে। তিনজনে ক্রমাগত মদ খেয়ে চলেছেন, পাত্রের পর পাত্র হাতে করে' পরস্পর পরস্পরকে অভিবাদন করে' গলায় ঢেলে দিচ্ছেন তীব্র পৈঠী আসব। দেখতে দেখতে একটা আনন্দময় পরিবেশ ঘনিয়ে উঠল তিনজনকে ঘিরে, মৃদু হাসির গুঞ্জন কেবল ব্যাহত করতে লাগল তাকে মাঝে মাঝে।

নীরবতা ভঙ্গ করে ইন্দীবর বললেন—"গন্ধরাজ, আমি তোমাকে আর ক্ষমা করতে অনুরোধ করব না। ভেবে দেখলাম আমি যদি গন্ধরাজ হতাম আর তুমি যদি ইন্দীবর হ'তে আমি তোমাকে ক্ষমা করতে পারতাম না।"

"কথাটা বেশ কায়দা করে' বললে তো!"—গন্ধরাজ উত্তর

দিলেন—"আমি কিন্তু তোমাকে ক্ষমা করে' ফেলেছি, যদিও তোমার কথাগুলো আর আমার প্রতি তোমার সন্দেহ মনে খচখচ করছে এখনও। শুধু তোমার কথাগুলোই নয়। সেনাপতি ধূর্জটিপ্রসাদ, আপনার কাছে তো আদেশপত্রটা আছেই, সুতরাং আপনার কাছে আর গোপন করবার কিছু নেই। আমার পারিবারিক অশান্তি আর মনান্তরের কাহিনী তো এখন সকলের সাধারণ সম্পত্তি হয়ে গেছে। সুতরাং আমি তা নিয়ে অসংকোচে এখন আলোচনা করতে পারি। আচ্ছা, আমি কি আমার স্ত্রীকে ক্ষমা করতে পারি? অবশ্যই পারি এবং করেওছি। কিন্তু কি ভাবে? আমি নিশ্চয়ই প্রতিশোধ নেবার জন্য নিজেকে অবনত করব না, আর এও ঠিক যে এখন যদি তার কথা ভাবি তাহলে এমনভাবে ভাবতে হবে যেন সে অপরিচিতা, কোনও দিন যেন তাকে চিনতাম না—"

"একটা কথা বলছি, মাপ করবেন"—ধূর্জটিপ্রসাদ বললেন—"একটা কথা গোড়াতেই ঠিক করে' নিন। আমরা কি সবাই হিন্দু নই? আমরা কি সকলেই নিয়তির অমোঘ তাড়নায় বিপর্যস্ত নই? সকলেই কি আমরা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির? সকলেই কি নিষ্পাপ কলঙ্কহীন?"

"আমি ওসব বিশ্বাস করি না"— হঠাৎ বলে' উঠলেন ইন্দীবর ভারতী—"আপনার এই উৎকৃষ্ট সুরা পান করে' আমি হৃদয়ঙ্গম করছি কর্মফলটল বাজে কথা, পাপপুণ্য সব ধাপ্পাবাজি। আপনার ও যুক্তি অচল।"

"অচল? আপনি কি কখনও মন্দ কাজ করেন নি? একটু আগেই তো আপনি ক্ষমা চাইছিলেন, ভগবানের কাছেও নয়, আপনারই মতো আর একজন সাধারণ লোকের কাছে।"

"ঘায়েল হ'য়ে গেলুম স্বীকার করছি। দেখছি আপনি শুধু অস্ত্রবিশারদই নন, যুক্তিবিশারদও।"

"ভগবান সাক্ষী, এ কথা শুনে গর্বে আমার বুক ফুলে উঠছে"—ধূর্জটিপ্রসাদ সিংহের মুখ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল—"আমি মিথিলায় সংস্কৃত টোলে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি। দেখুন, আমার মতে এইসব ক্ষমা চাওয়াটাওয়ার ব্যাপার তাঁদের সাজে যাঁদের জীবনের নীতি শিথিল এবং তা সত্ত্বেও যাঁরা সমাজের বাইরে পা বাড়াতে ভরসা পান না। তাঁরাই এইসব ক্ষমা চাওয়াচাওয়ি করেন মাঝে মাঝে। যাঁরা আসল জ্ঞানী তাঁদের নিজের জীবনের নীতি নির্দিষ্ট সমাজের নীতির বাইরে তাঁরা পা বাড়াতে ইতস্ততঃ করেন না। আপনারা দুজনেই জ্ঞানী, আপনারা কেউ কারোর ক্ষমা চাইবেন কেন? কেউ কারুকে ক্ষমা করবেনই বা কেন।"

"এই আপাত-বিরুদ্ধ কথাটা কিন্তু খুব লাগসই মনে হচ্ছে না" —হেসে উত্তর দিলেন ইন্দীবর।

"ক্ষমা করবেন সেনাপতি মশাই, আমি আপনার মনে আঘাত দিতে চাই না, কিন্তু আপনার কথাগুলো যেন ব্যঙ্গের মতো দংশন করল আমাকে। আপনি আমাকে জ্ঞানী বলছেন? যে অবস্থায় পড়েছি সে অবস্থায় আমাকে জ্ঞানী বলা কি সংগত? আমি কি আমার অজ্ঞানের প্রায়শ্চিত্ত করছি না? সুদীর্ঘ অজ্ঞতার ফলে এই অপমানের পঙ্কে ডুবছি না?"

"ক্ষমা করবেন মহারাজ"—বললেন ধূর্জটিপ্রসাদ—"আপনি কি কখনও মন্দির থেকে বিতাড়িত হয়েছেন, আপনি কি কখনও সর্বস্বান্ত হয়েছেন? আমি হয়েছি। সামরিক কর্তব্যচ্যুতির জন্য হয়েছি। খুলেই বলছি তাহলে—এত বেশী মদ খেতাম, এমন মাতলামি করতাম যে সর্বনাশ হ'য়ে গেল আমার। এখন অবশ্য আর অতটা করি না"—এই বলে, তিনি আর এক পাত্র সুরা ঢাললেন—"দেখুন মহারাজা, যে লোক তার নিজের চরিত্রের সমস্ত দোষের কথা সম্পূর্ণরূপে জেনেছে, যেমন আমি জেনেছি, যে লোকটাকে অন্ধ লাটিমের মতো জীবনের অঙ্গনে নেচে নেচে

বেড়াতে হয়েছে, তার কাছে ক্ষমার অর্থ একটু আলাদা। আমি যতক্ষণ না নিজেকে সম্পূর্ণ ক্ষমা করতে পারছি ততক্ষণ ক্ষমার মহত্ত্ব নিয়ে আস্ফালন করা আমার অন্ততঃ সাজে না। হয়তো আমি জীবনে কোনও দিন কাউকে ক্ষমা করবার মতো শক্তি সংগ্রহ করতে পারবই না। আমার পিতা সচ্চরিত্র নিষ্ঠাবান মন্দিররক্ষক ছিলেন, খুব কড়ালোক ছিলেন তিনি। তিনি কারো দোষক্রুটি ক্ষমা করতেন না। আমি সচ্চরিত্র নই নিষ্ঠাবানও নই এবং ওইখানেই তফাত। যে লোক দুর্বল মানুষকে ক্ষমা করতে পারে না আমার মতে সে শিশু, জীবনের কোনও সত্য অভিজ্ঞতাই তার নেই।"

ইন্দীবর বললেন, "শুনেছি, আপনি একজন বড় মল্লযোদ্ধা—"

"ওটা অন্য জিনিস। পেশা মাত্র, তবে একেবারে পাশবিক নয়।"

একটু পরেই সেনাপতি মশাই ঘুমিয়ে পড়লেন। অগাধ ঘুম! নাক ডাকতে লাগল। তাঁর দিকে চেয়ে হাসলেন ওঁরা।

"আজব চিড়িয়া"—ইন্দীবর বললেন।

"আর অদ্ভুত অভিভাবকও"—গন্ধরাজ উত্তর দিলেন—"তবে উনি যা বললেন তা নেহাত বাজে কথা নয়।"

"হ্যাঁ ঠিকভাবে বিচার করলে"—ইন্দীবর বললেন—"আমরা যখন বন্ধুকে ক্ষমা করতে অস্বীকার করি, আসলে তখন আমরা নিজেদেরই ক্ষমা করতে পারি না। প্রত্যেক কলহের সঙ্গে আমাদের নিজেদেরই দুষ্কৃতি জড়িয়ে থাকে খানিকটা, তাতেই আরও জট পাকিয়ে যায়।"

"যারা ক্ষমা করে তাদের চরিত্রও কি দোষমুক্ত? আত্মসম্মানের কি কোনও সীমা নেই?"—গন্ধরাজ প্রশ্ন করলেন।

"দেখ, গন্ধরাজ, আত্মসম্মানের কথা তুললে যখন তখন জিগ্যেস করছি কোনও লোক কি সত্যিসত্যি নিজেকে সম্মান করে? এই পাহারাওলার চোখে আমরা মস্ত লোক। কিন্তু সত্যি আমরা কি!

বাইরের নানারকম ভড়ং দিয়ে অন্তরের আবর্জনাকে ঢেকে রেখেছি। মুখোশ ছাড়া লোককে দেখাবার মতো আমাদের কিই বা আছে!"

"যা বললে, তা আমার সম্বন্ধে ঠিক খাটে। কিন্তু তুমি? তোমার অক্লান্ত পরিশ্রম, তোমার বিরাট প্রতিভা, তোমার অমর গ্রন্থাবলী, তোমার সাধনা, তোমার ব্রহ্মচর্য—তুমি জান না ইন্দীবর তোমাকে আমি কত হিংসা করি—"

ইন্দীবর মৃদু হাসলেন একথা শুনে।

"গন্ধরাজ, সত্যি কথাটা শুনবে তাহলে? এক কথায় বলছি, যদিও কথাটা ভালো শোনাবে না। আমি মাতাল, লুকিয়ে লুকিয়ে মদ খাই। খুব বেশী খাই। সুরা প্রেতিনীর মতো আমার উপর ভর করেছে। আমার যে অমর গ্রন্থাবলীর প্রশংসায় তুমি এখনি গদগদ হলে সে গ্রন্থাবলী যত ভালো হ'তে পারত তত ভালো হয় নি, ওই প্রেতিনী তা করতে দেয় নি। পলে পলে ও আমার মনুষ্যত্ব চুষে চুষে খেয়ে ফেলছে, আমার প্রতিভাকে নিষ্প্রভ করে' দিচ্ছে, আমার মেজাজকে সঙ্কীর্ণ করে' আনছে। সেদিন যে তোমাকে ওই ওজস্বিনী তিরস্কারটা করলুম, তার ওজস্ কোথা থেকে এল? মদ থেকে, রাত্রে খুব মদ খেয়েছিলাম। ওই যে মাতালটা নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে, তার কথার যদিও প্রতিবাদ করলাম সাড়ম্বরে, কিন্তু ও ঠিক কথাই বলেছে। আমরা সবাই পাপী, কিছুক্ষণের জন্য এই রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে ঠিক করছি এটা ভালো, ওটা মন্দ, কিন্তু ভগবানের চক্ষে আমার সবাই উলঙ্গ পাপী, ভাবলে লজ্জায় মাথা কাটা যায়। কথাটা কিন্তু সত্যি—"

"সত্যি? কি আমরা তাহলে? যা উৎকৃষ্ট—"

"মানুষের মধ্যে উৎকৃষ্ট বলে' কিছু নেই। আমি তোমার চেয়ে কিংবা ওই ধূর্জটিপ্রসাদের চেয়ে কোন অংশে ভালো নই, হয়তো মন্দও নই। আমি রঙ্গমঞ্চের একজন অভিনেতা, আমার সাজপোশাক, আমার কথবার্তা আমার নয়, সব মেকী। এবার

আশা করি আমাকে চিনেছ, যদি চিনে থাক তাহলেই আমি খুশী—"

"কিন্তু এসব শুনেও তোমার প্রতি আমার ভালবাসা তো কমছে না"—মৃদুকণ্ঠে বললেন গন্ধরাজ—"আমাদের দুষ্কৃতি আমাদের বদলায় না। ইন্দীবর, আবার সুরা ঢাল। এই চরম দুর্গতির মধ্যেও যে ধ্রুবতারাটা এখনও ডোবে নি, এস তারই স্মরণে, আমাদের সেই পুরাতন প্রেমকে স্মরণ করে' আর এক পাত্র করে' পান করি। তারপর যে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত কারণে তুমি আমাকে তিরস্কার করেছিলে তার অপমান বিস্মৃতির তমসায় ছুঁড়ে ফেলে দি। এস সুরূপিণীকে স্মরণ করেও পান কর আর এক পাত্র, যে সুরূপিণীর সঙ্গে আমি দুর্ব্যবহার করেছি, যে সুরূপিণী আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে, যাকে আমি ছেড়ে চলে' এসেছি, হয়তো খুব বিপদের মুখেই ফেলে এসেছি, এস, তাকে স্মরণ করেই আর এক পাত্র পান করি আবার। আমরা কত মন্দ তা বিচার করে' লাভ কি, কি তাতে যায় আসে যদি তা সত্ত্বেও লোকে আমাদের ভালবাসে আর আমরাও তাদের ভালবাসতে পারি—"

"ঠিক বলেছ"—ইন্দীবর বললেন—"খুব ভাল বলেছ। যারা দুঃখবাদী বিশ্বনিন্দুক এই তাদের মুখের মতন জবাব। এইটেই মনুষ্যজাতির ইতিহাসে চিরন্তন অত্যাশ্চর্য ঘটনা। তাহলে তুমি এখনও আমাকে ভালবাস? তুমি এখনও তাহলে তোমার স্ত্রীকে ক্ষমা করতে পার? বাস, তাহলে তো হয়ে গেল। আমরা এখন অনায়াসে আমাদের বিবেকরূপী কুকুরটাকে ধমক দিয়ে বলতে পারি—থাম বেটা, ছায়া দেখে ঘেউ ঘেউ করে' মরছিস কেন।"

দুজনেই নীরব হয়ে গেলেন। ইন্দীবর খালি পানপাত্রটায় অন্যমনস্কভাবে আঙুল দিয়ে টোকা দিতে লাগলেন।

গাড়ি উপত্যকা অতিক্রম করে সেই রাস্তাটায় এসে হাজির হল যেটা গর্জনগাঁওয়ের সামনে দিয়ে চলে গেছে ভৈরঙ্গীর কান

ঘেঁষে। অনেক নীচে নক্ষত্রালোকে আলোকিত একটা জলপ্রপাত দেখা যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল বনলক্ষ্মীর অঞ্চলপ্রান্ত লুটিয়ে পড়েছে। উপরের পর্বতশ্রেণী নিকষকৃষ্ণ, নগ্ন এবং ভয়ঙ্কর। গাড়ির বাতি পাহাড়ের গায়ে আলোর ছাপ ফেলে ফেলে চলেছিল, দেখা যাচ্ছিল ছোট ছোট দেওদারগাছদের সেই চকিত আলোকে। পাথরের রাস্তাটা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল গাড়ির চাকা আর ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে। মাঝে মাঝে গন্ধরাজ অশ্বারোহী প্রহরীদেরও দেখতে পাচ্ছিলেন, একটা নদীর ধার দিয়ে দলবদ্ধ হয়ে চলেছিল তারা। একটু পরেই শূলপাণির বলিষ্ঠ রূপ ফুটে উঠল, পর্বতের উচ্চ শিখরে দাঁড়িয়ে আছে নক্ষত্রখচিত আকাশের পটভূমিকায় বিরাট দৈত্যের মতো।

"ইন্দীবর, আমরা এসে পড়েছি—"

ইন্দীবর স্বপ্নাচ্ছন্ন হ'য়ে বসে ছিলেন, জেগে উঠলেন।

"আমি ভাবছিলাম। তুমি বললে সুরূপিণীকে বিপদের মুখে ফেলে এসেছ। এলে কেন? তোমার রুখে দাঁড়ান উচিত ছিল। শুনলাম তুমি স্বেচ্ছায় এসেছ, সুরূপীণীর কথাটা একবার ভাবলে না? তাকে বাঁচাবার জন্যে তোমার কি সেখানে থাকা উচিত ছিল না?"

গন্ধরাজের মুখ বিবর্ণ হ'য়ে গেল।

একুশ

স্বরূপিণীর সঙ্গে দেখা সেরে রাজপ্রাসাদ থেকে শ্রীমতী রঞ্জাবতী যখন বেরিয়ে এলেন তখন ভয়ে তাঁর বুক কাঁপছে। তিনি লম্বা বারান্দায় দাঁড়িয়ে মনে মনে হিসাবনিকাশ করতে লাগলেন, তিনি যা করে' ফেললেন কপিঞ্জলের উপর তার কি রকম প্রতিক্রিয়া হবে। পাখাটা খুলে নিজেকে হাওয়া করলেন একটু, কিন্তু পাখার হাওয়া তাঁকে নিশ্চিন্ত করতে পারল না।

"মেয়েটার মাথা একদম খারাপ হয়ে গেছে"—ভাবলেন তিনি ; তারপর মনে হ'ল, "আমিও একটু বেশী বাড়াবাড়ি করে' ফেলেছি।" অবিলম্বে ঠিক করে' ফেললেন গা ঢাকা দিতে হবে। রঞ্জাবতীর গা-ঢাকা দেওয়ার একটা জায়গাও ছিল। শহর থেকে দূরে বনের মধ্যে একটি ছোট বাগান-বাড়িগোছের। তিনি যদিও কবিত্ব করে' এটার নামকরণ করেছিলেন—"অরণ্যনীড়"—সাধারণ লোকে কিন্তু এটাকে বলত—"বনদরগা।"

এ কথা মনে হওয়ামাত্র তিনি গাড়ি হাঁকিয়ে দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় দেখলেন বীথিপথ ধরে' কপিঞ্জল প্রাসাদের দিকে যাচ্ছেন। ভান করলেন যেন তাঁকে দেখতে পান নি। বনদরগা পার্বতী থেকে সাত মাইল দূরে, একটি সঙ্কীর্ণ উপত্যকার মধ্যে। সেইখানেই রাতটা কাটালেন তিনি। শহরের গোলমালের খবর তাঁর কানে এল না। জায়গাটা উপত্যকার মধ্যে, চারদিকে পাহাড়, তাই অগ্নিকাণ্ডের আলোও দেখতে পেলেন না তিনি। রাত্রে ঘুম হ'ল না ভালো। কি হবে কি হবে এই চিন্তায় অস্থির হয়ে রইলেন, কাল সন্ধ্যাটা বেশ মনোরমভাবেই কেটেছে কিন্তু তার ফল শেষপর্যন্ত কি দাঁড়াবে কে জানে! তাঁরও শেষপর্যন্ত নির্বাসন লেখা আছে না কি কপালে! চিঠিপত্রের মাধ্যমে নিজের অনেক

সাফাই গাইবার পর তবে কি তিনি কপিঞ্জলের নাগাল পাবেন? কে জানে অদৃষ্টে কি আছে! তারপর তাঁর কৌতূহল হ'ল গন্ধরাজ কাল তাঁকে যে দলিলগুলো দিয়েছিল তাতে কি আছে? দেখা যাক। দেখে কিন্তু তিনি হতাশ হলেন। এই ডামাডোলের বাজারে জমি আর খামার নিয়ে কি করবেন তিনি! এও তাঁর মনে হল গন্ধরাজ খুব বেশী টাকা দিয়েছে। একটা খামারের অত দাম? পরিশেষে গন্ধরাজের মুক্তির জন্যে স্বরূপিণী যে আদেশটা দিয়েছিলেন সেটা খুলে পড়লেন। আঙুলগুলোয় ছ্যাঁকা লাগল যেন! মুড়ে রেখে দিলেন সেটা। ভাবলেন একটু। তারপর ঠিক করে' ফেললেন কি করবেন।

পরদিন সকালে দেখা গেল একটি রূপসী রমণী অশ্বারোহণে এসে শূলপাণির সিংহদরজার সামনে ঘোড়ার লাগাম টেনে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর পরনের কাপড় আঁটসাঁট করে' পরা। চোখের দৃষ্টিতে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। পরিণাম কি হতে পারে তা না ভেবেই দুঃসাহসিনী রঞ্জাবতী বেরিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর মনের ভাবটা— দেখা যাক না কি দাঁড়ায়! চিরকালই এই তাঁর মনের ভাব। খেয়ালের হাওয়াতেই চিরকাল তিনি তরী ভাসিয়েছেন। প্রহরীকে আদেশ করলেন—সেনাপতিকে খবর দাও। ধূর্জটিপ্রসাদ বেরিয়ে এসে স্বাগত-সম্ভাষণ জানালেন তাঁকে, নবীন যুবক কোনও তরুণীকে দেখে যেভাবে উচ্ছ্বসিত হতেন তেমনই উচ্ছ্বসিত হলেন, যদিও, আশ্চর্যের বিষয়, দিবালোকে তাঁকে বেশ প্রবীণ বলেই মনে হচ্ছিল। রঞ্জাবতীর চোখমুখ রহস্যময় হ'য়ে উঠল।

"সেনাপতি মশাই, আপনাকে তাক লাগিয়ে দিতে এসেছি" —বলে' একটি অর্থপূর্ণ কটাক্ষ হানলেন তিনি।

"আমার আসামী দুটিকে যেন ভুলিয়ে নিয়ে যাবেন না। বরং আপনি এসে যদি তাদের দলে যোগ দেন আমার আনন্দ সীমা ছাড়িয়ে যাবে।"

"তার মানে আমাকে নষ্ট করতে চান।"

"পারব কি? চেষ্টা নিশ্চয়ই করব।"

এই বলে তিনি হেসে হাত বাড়িয়ে দিলেন। রঙ্গাবতী তাঁর বাহুলগ্না হ'য়ে ঘেঁষে দাঁড়ালেন ঘনিষ্ঠ হয়ে।

"আমি মহারাজার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। অবিশ্বাস করছেন তো? হ্যাঁ, এখুনি দেখা করতে হবে। ওই হতভাগা কপিঞ্জল, আমাকে দূতের মতো দৌড় করাচ্ছে খালি। আচ্ছা, আমাকে দূতের মতো দেখাচ্ছে কি?"

এই বলে তিনি তাঁর চোখের উপর চোখ রাখলেন।

"আপনাকে পরীর মতো দেখাচ্ছে"—ধূর্জটিপ্রসাদ কবিত্ব করবার প্রয়াস পেলেন। রঙ্গাবতী হেসে উঠলেন এ কথায়।

"পরীর মতো? পরীরা কখনও ঘোড়ায় চড়ে' আসে? আপনার কল্পনাটা একটু বেসামাল হয়ে পড়ল বোধহয় তাড়াতাড়িতে।"

"হতে পারে। আপনি এলেন, দেখলেন এবং জয় করলেন, সময় দিলেন কই! আসবার সময় আপনাকে স্মরণ করে' আমরা পৈঠী পান করেছি, বার বার করেছি—সুন্দরী সুনয়নীকে ভুলি নি আমরা। সত্যি বলছি, আপনার চোখের মতো চোখ আমি একটিবার মাত্র দেখেছি কেবল আমাদের গ্রামে, তখন আমি টোলে পড়তাম। মেয়েটির নাম ছিল বৈদেহী। আপনার সঙ্গে তার অদ্ভুত মিল—"

"গাড়িতে আপনারা তাহলে বেশ ফুর্তি করতে করতে এসেছেন?" —রঙ্গাবতী মুখে হাতটা রেখে ছোট্ট হাই তুললেন।

"এসেছি। আড্ডা চমৎকার জমেছিল। কিন্তু মনে হয় কাল আমাদের মাত্রাটা একটু ছাড়িয়ে গিয়েছিল, মহারাজ মনে হয় একটু বেশী খেয়ে ফেলেছিলেন। আজ সকালে সেইজন্যেই বোধহয় মেজাজটা ঠিক নেই। তবে সন্ধ্যে নাগাদ ঠিক হয়ে যাবে। এই যে এইটে দরজা--"

"দাঁড়ান—রঞ্জাবতী চুপি চুপি বললেন—"একটু দম নিয়ে নি। না, না থামুন, এখন কপাটটা খুলবেন না, আমার কিছু করার আছে।"

এই বলে' তিনি যা করলেন তা অপ্রত্যাশিত। গান গেয়ে উঠলেন মিষ্টি গলায়। রোমাঞ্চিত হয়ে গেলেন ধূর্জটিপ্রসাদ, তাঁর মনে হল যেন একটা বীণা বাজছে। গানের প্রথম কলি—আকাশ আবার ডাক দিয়েছে পাখিকে। গান শেষ করে' তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন একবার। তারপর বললেন—"এইবার খুলুন।" কপাট খুলে গেল। হরিণীর মতো চটুল দ্রুতগতিতে এগিয়ে গেলেন তিনি গন্ধরাজের কাছে, তাঁর চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠল অপরূপ জ্যোতি, মুখের ভাবে মূর্ত হল সদ্য-গাওয়া সংগীতের মধুর মূর্ছনা। নাটকীয় ভঙ্গীতে প্রবেশ করলেন তিনি। কারারুদ্ধ বিমর্ষ গন্ধরাজের মনে হল মূর্তিমতী আলো এল যেন।

"এ কি! রঞ্জাবতী! তুমি এখানে!"

রঞ্জাবতী সেনাপতির দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন। ভাবটা—আপনি একটু আড়ালে যান। সেনাপতি চলে যেতেই রঞ্জাবতী ছুটে গিয়ে কণ্ঠলগ্ন হলেন গন্ধরাজের।

"তোমাকে দেখতে এসেছি।"

কান্না ফুটে উঠল রঞ্জাবতীর কণ্ঠস্বরে। আরও জড়িয়ে ধরলেন তিনি গন্ধরাজকে।

কিন্তু গন্ধরাজ বিচলিত হলেন না। দৃঢ়পদেই দাঁড়িয়ে রইলেন। সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জাবতীও সামলে নিলেন নিজেকে।

"আহা বেচারী, বেচারী। বস, এইখানে আমার পাশে এসে বস। সব বল আমাকে। আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। কেমন লাগছে এখানে?"

রঞ্জাবতী কাল পর্যন্ত গন্ধরাজকে 'আপনি' বলে' সম্বোধন করেছেন। আজ হঠাৎ 'তুমি' বলতে তাঁর বাধছিল একটু।

আড়চোখে গন্ধরাজের দিকে চেয়ে দেখলেন একবার। না, গন্ধরাজ এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না। গন্ধরাজ তাঁর পাশে বসলেন। তাঁর বিমর্ষ ভাবটাও কেটে গেল।

"রঞ্জাবতী, তুমি যতক্ষণ আছ ততক্ষণ ভালই লাগবে। কিন্তু তুমি তো এখনি চলে' যাবে। ওখানকার খবর কি বল্ আগে। মনে হচ্ছে কাল তোমার পরামর্শ শোনাই উচিত ছিল আমার। শুনি নি বলে' অনুতাপ হচ্ছে। আমার প্রতিরোধ করাই কর্তব্য ছিল। তুমি বার বার বলেছিলে। সত্যি তুমি বুদ্ধিমতী, সত্যি তুমি মহৎ, তোমার মতো হিতৈষী—"

"গন্ধরাজ আমার কথা বাদ দাও। আমার পক্ষে ওভাবে তোমাকে উৎসাহিত করা উচিত হয়েছিল কি? আমারও তো কর্তব্য আছে একটা। কিন্তু তোমাকে দেখলেই আমি সব কথা ভুলে যাই, সব কর্তব্য যেন উপে যায়।"

"আর আমার কর্তব্যবুদ্ধি পরে জাগে, তখন আর কিছু করবার থাকে না। এখন বুঝছি সত্যি, আমার প্রতিরোধ করা উচিত ছিল। এখন মনে হচ্ছে স্বাধীনতা ফিরে পাবার জন্যে আমি কি না দিতে পারি?"

"বল, কি দেবে তুমি?"—রঞ্জাবতী হেসে প্রশ্ন করলেন, তাঁর লাল পাখাটা আবার খুলে গেল মুখের সামনে, মনে হল তিনি যেন একটা দেওয়ালের ওপাশ থেকে উজ্জ্বল হাসি-ভরা দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছেন গন্ধরাজের দিকে।

"কি দেব? মানে? মনে হচ্ছে কোন খবর এনেছ তুমি—"

"খবর? হ্যাঁ তা খবর বলতে পার—"

গন্ধরাজ দাঁড়িয়ে উঠলেন।

"ছলনা কোরো না রঞ্জাবতী। বল, কি খবর এনেছ। তুমি তো নিষ্ঠুর নও, আমি তোমাকে চিনি। কি দেব বলছিলে? কিছুই

দেব না, এখন তো আমার কিছুই নেই, আমি এখন তোমার করুণা ভিক্ষা করতে পারি। আর কোনও ক্ষমতা নেই আমার।"

"ছি, ছি, ও কি কথা বলছ। না না এটা ঠিক হচ্ছে না। তুমি তো আমার দুর্বলতা জান। ও কথা বোলো না, তুমি মহারাজা, তোমার মহত্ত্ব বিসর্জন দিও না।"

"আমি আর মহারাজা নই রঞ্জাবতী, আমার মহত্ত্বও আর নেই। তুমি চিরকালই মহৎ, চিরকালই করুণাময়ী। তোমার সিংহাসন থেকে তোমাকে কেউ নাবাতে পারে নি। তুমিই কৃপা কর আমাকে—"

তিনি রঞ্জাবতীর হাত দুটি ধরে' সাগ্রহে চেয়ে রইলেন তাঁর চোখের দিকে। তারপর পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন, দু'একটা বিস্রস্ত অলক ঠিক করে' দিলেন। রঞ্জাবতী খুব উপভোগ করতে লাগলেন এটা মনে মনে যদিও বাইরে ভান করতে লাগলেন যেন গন্ধরাজের এই মনোযোগে তিনি বিব্রত বোধ করছেন, শত্রু যেন দুর্গ আক্রমণ করেছে। অবশেষে হৃদয় বিগলিত হ'ল তাঁর। তড়াক করে' লাফিয়ে উঠে পটপট জামার বোতাম খুলে ফেলে বুকের ভিতর থেকে আদেশপত্রটা বার করে' ছুঁড়ে দিলেন সেটা মেজের উপর।

"এই নাও। আমি জোর করে' ওটা লিখিয়ে এনেছি। তোমার মুক্তির আদেশ। তুমি ওটা ব্যবহার করলে কিন্তু আমার ধ্বংস অনিবার্য। কপিঞ্জল আমাকে ক্ষমা করবে না। তাকে তো চেনো—"

মুখ ঘুরিয়ে নিলেন তিনি, যেন উদ্গত অশ্রু গোপন করবার জন্যে।

গন্ধরাজ লাফিয়ে কাগজটা তুলে নিলেন। পড়লেন। তারপর বলে' উঠলেন—"ও লিখে দিয়েছে? সত্যি? বিশ্বাস হচ্ছে না—"

আবেগভরে চুম্বন করতে লাগলেন কাগজটাকে।

রঞ্জাবতীর মনটা সত্যিই উদার, সত্যিই কোমল। কিন্তু এ দৃশ্য দেখে তিনি থাকতে পারলেন না। তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল—"অকৃতজ্ঞ! আমি জোর করে' তাকে দিয়ে লিখিয়ে এনেছি ওটা, এর জন্যে কপিঞ্জলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে হয়েছে আমাকে। আর তুমি তার জন্যে পাগল হয়ে উঠলে!"

"আমাকে দোষ দিও না রঞ্জাবতী। আমি তাকে ভালবাসি।"

"সে তো দেখতেই পাচ্ছি। আর আমি?"

"তুমি? তুমি আমার প্রিয়তমা, উদার-হৃদয়া, করুণাময়ী বান্ধবী।"

গন্ধরাজ এগিয়ে এলেন তাঁর দিকে। তারপর বললেন—"তুমি যদি এমন রূপসী, এমন মনোরমা না হতে তাহলে তুমি আদর্শ বান্ধবী হতে পারতে। তোমার রসবোধ আছে, তোমার মোহিনী-শক্তির ক্ষমতা যে কত তা তুমি জানো, যখন তোমার মরজি হয় তখন তুমি আমার দুর্বলতা নিয়ে খেলা করতেও ভালবাস, আমিও কখনও কখনও সে খেলায় যোগ দিয়েছি। কিন্তু আজ সে নাটক হবে না। আজ আমাকে বিশ্বাসী শক্তসমর্থ পুরুষ বন্ধুর ভূমিকা নিতে হবে, আজ যদি আমি ভুলে যাই যে তুমি রূপসী আর আমি দুর্বল তাহলে তুমি রাগ করতে পাবে না। আজ তোমাকে সম্পূর্ণ-রূপে প্রকৃত বন্ধুর মতো পেতে চাই রঞ্জাবতী, আমার এ অনুরোধ রাখ আজ—"

হাত বাড়িয়ে হেসে এগিয়ে গেলেন গন্ধরাজ। রঞ্জাবতীও সে হাতে নিজের হাত মেলালেন বেশ সপ্রতিভ হাসি হেসে।

বললেন, "তুমি আমাকে জাদু করেছ গন্ধরাজ"—তারপর একটু হেসে—"আমি আমার অস্ত্র সংবরণ করছি এবং আমাকে এতে রাজী করতে পেরেছ বলে' তোমাকে বাহবাও দিচ্ছি। কি চমৎকার করে' গুছিয়ে তুমি কথাগুলো বললে! আমি যেমন রূপসী, তুমিও তেমনি নিপুণ—"

বলে' অপরূপ ভঙ্গীভরে অভিবাদন করলেন তিনি।

গন্ধরাজও অভিবাদন করে' বললেন—"আবার যদি তুমি অমন লোভনীয় হ'য়ে ওঠ তাহলে আমাদের চুক্তি টিকবে কি?"

"এই আমার শেষ তীর। এবার আমি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। খালি টোটা। গন্ধরাজ তুমি যদি এই কারাগার ছেড়ে চলে' যাও—যেতে পার,—কিন্তু আমার সর্বনাশ হ'য়ে যাবে। কি করবে বল—"

ঠিক করে' ফেলেছি, যাব। যদিও আমি গোবরগণেশ, তবু আমাকেই কর্তব্যের অনুরোধে যেতে হবে। একটা কর্তব্য করা হয় নি এখনও। কিন্তু ভয় নেই, তোমার সর্বনাশ হবে না। তুমিই আমাকে নিয়ে চল। ভালুকওলারা যেমন ভালুকের নাকে দড়ি পরিয়ে গলায় শিকল দিয়ে নিয়ে যায়—তেমনি করে' তুমিও আমাকে নিয়ে চল কপিঞ্জলের কাছে। আমি সব হীনতা সহ্য করব আমার স্ত্রীকে বাঁচাবার জন্য। আমাকে সে যা করতে বলবে তাই করব। তার সব দাবি মানব আমি, মহারাক্ষসের সব ক্ষুধা মেটাব। আর এর বাহাতুরি এবং গৌরব তুমি পাবে।"

"বেশ, রাজী! আর তুমি প্রিয়দর্শী গন্ধরাজ নও, তুমি এখন কর্তব্যপরায়ণ শ্রীরামচন্দ্রের মহিমায় পরমপূজ্য মহাপুরুষ। চল এক্ষুনি তাহলে আমরা বেরিয়ে পড়ি। হ্যাঁ একটা কথা। ওই দলিল-গুলো আমি তোমাকে ফেরত দিয়ে দিতে চাই। ওই খামার বাড়ি তুমিই পছন্দ করেছিলে, আমি তো দেখিও নি। তুমিই কীর্তিভূষণের উপকার করতে চেয়েছিলে, আমি তাকে চিনিও না। আর তাছাড়া" —একটু নিম্নকণ্ঠে হেসে বললেন—"আমি ভূমি-লক্ষ্মীর পূজোর মন্ত্র জানি না, আমি চিরকাল নগদ লক্ষ্মীরই উপাসিকা—"

তুজনেই জোরে হেসে উঠলেন।

"বেশ, আবার তাহলে আমি কৃষক হয়ে গেলাম"—দলিলগুলো হাত বাড়িয়ে নিলেন গন্ধরাজ—"কিন্তু ঋণে যে আমার মাথার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে রইল।"

রঞ্জাবতী ঘণ্টা বাজাতেই ধূর্জটিপ্রসাদ এসে হাজির হলেন।

"সেনাপতি মশাই, আমি আপনার একজন কয়েদীকে নিয়ে উধাও হচ্ছি। আমাদের দুজনের মধ্যে কথাবার্তা হ'য়ে গেছে। এই দেখুন, মহারাণীর আদেশপত্র—"

যদিও প্রয়োজন ছিল না তবু ধূর্জটিপ্রসাদ একটি শৌখিন বিদেশী চশমা ব্যবহার করতেন। সেটি কায়দা করে' নাকের উপর লাগিয়ে তিনি আদেশপত্রটি পড়লেন।

"মহারাণীর আদেশপত্র। ঠিক আছে। কিন্তু আগেকার আদেশপত্রে প্রধানমন্ত্রী কপিঞ্জল দেওয়েরও স্বাক্ষর ছিল—"

"তাঁরই জীবন্ত স্বাক্ষর হ'য়ে তো আমি এসেছি। তিনিই তো আমাকে পাঠিয়েছেন।"

"ও বেশ, বেশ। আপনি সৌভাগ্যবতী, আমি হতভাগ্য এমন একজন লোকের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হলাম। এখন আপসোস করা ছাড়া আর উপায় কি? ইন্দীবর ভারতী অবশ্য রইলেন, তিনি বিরাট পণ্ডিত, নিজে ইচ্ছে করে' যদি আমার নাগালের মধ্যে ধরা না দেন তাহলে আমি তাঁর পাত্তা পাব না।"

"হ্যাঁ, ইন্দীবরের সম্বন্ধে তো কোন আদেশ নেই—"

"ভালই তো। সেনাপতি মশাইকে একা থাকতে হবে না।"

"মহারাজ"—ধূর্জটিপ্রসাদ সাড়ম্বরে বললেন—"আশা করি আপনার এই স্বল্প কারাবাসের সময় আমি যথোচিত শ্রদ্ধাসহকারে আপনার মর্যাদা রক্ষা করতে পেরেছি। ইচ্ছে করেই আমি একটা আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করবার প্রয়াস পেয়েছিলাম। আমার মতে আনন্দময় পরিবেশ আর সুরা সব সময়েই সব দুঃখকষ্ট লাঘব করে' দেয়।"

"সেনাপতি মশাই"—গন্ধরাজ হাত বাড়িয়ে দিলেন—"আপনার মধুর সঙ্গই যথেষ্ট ছিল, আর কিছুর প্রয়োজন ছিল না। আপনার চমৎকার স্বভাব, আর আপনার জীবনদর্শন মুগ্ধ করেছে আমাকে। শিক্ষাও দিয়েছে। আশা করি আবার আমাদের দেখা হবে।

আপনাকে একটা উপহার দিতে চাই, সামান্য স্মৃতি-চিহ্ন। এখানে বসে' এই কারাগারের জানলার গরাদের দিকে চেয়ে চেয়ে আমি এইগুলো লিখেছি। আমি কবি নই, কারাগার কবিত্বের প্রেরণাও যোগায় না, তবু বসে' বসে' কবিতাই লিখেছি। আপনি রাখুন এগুলো, আপনার কৌতূহলের খোরাক যোগাবে অন্ততঃ—"

কাগজগুলো হাতে করে' ধূর্জটিপ্রসাদের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি আবার শৌখিন চশমাটি নাকে লাগিয়ে পড়তে লাগলেন।

"বাঃ, চমৎকার ছন্দ তো! মালিনী কি? না, তা তো নয়। এ যে অনন্য একেবারে। 'আকাশ তোমার আলোর দূতের রামধনু-রাঙা পোশাক হেরি হয়েছি মুগ্ধ আত্মহারা, কি বারতা তুমি পাঠায়েছ তাহা পশে কি কানে, তারপর এলো আলো-ঝলমল-লক্ষ তারা'—বাঃ, বাঃ, চমৎকার! শিরোধার্য করে' নিলাম এই অমূল্য উপহার।"

"সেনাপতি মশাই কবিতাগুলো পরে পড়বেন"—বাধা দিলেন রঞ্জাবতী—"আগে কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত করে' দিন।"

"নিশ্চয় নিশ্চয়। ক্ষমা করবেন, কিন্তু এ কথা আমি বলতে বাধ্য আমি যে ধরনের লোক তাতে এই কবিতাগুলো, এদের অপূর্ব জন্মকথা, আমাকে সত্যিই বিচলিত করেছে। আপনাদের সঙ্গে কি কোনও লোক দেব?"

"না, দরকার নেই"—রঞ্জাবতীই উত্তর দিলেন—"আমরা হইচই করতে চাই না, ছদ্মবেশে যাব, যেমন এসেছিলাম। আমরা একসঙ্গে ঘোড়ায় যাব। গন্ধরাজ আমার চাকরের ঘোড়াটা নেবেন। আমরা তাড়াতাড়ি গোপনে সরে' পড়তে চাই, এর বেশী আর কিছু দরকার নেই।"

তিনি দ্বারের দিকে অগ্রসর হ'য়ে গেলেন।

কিন্তু গন্ধরাজ ইন্দীবর ভারতীর কাছে বিদায় না নিয়ে যেতে

পারলেন না। ধূর্জটিপ্রসাদ নাকে চশমা দিয়ে কবিতাগুলো পড়তে পড়তে তাঁর অনুসরণ করলেন, আর যাকে সামনে পেলেন তাকেই পড়ে' শোনাতে লাগলেন সেগুলো। তাঁর উত্তেজনা ক্রমশঃ যেন বাড়তে লাগল। শেষে তিনি বললেন—"এগুলো পড়তে পড়তে আমার কালিদাসকে মনে পড়ছে। মেঘদূতের আকুলতা ফুটেছে কবিতাগুলোর ছত্রে ছত্রে।"

সব শেষ হল অবশেষে। গন্ধরাজ আর রঞ্জাবতী পাশাপাশি হাঁটতে লাগলেন পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে। রঞ্জাবতীর চাকর দুটো ঘোড়া নিয়ে পিছু পিছু আসছিল। রৌদ্র আর সমীরণ, উড়ন্ত পাখির দল, সুদূরবিস্তৃত দিগন্ত তাঁদের ঘিরে যে পটভূমিকা সৃজন করছিল তা অবর্ণনীয়। চারিদিকের বনভূমি, পর্বতশিখরের গম্ভীর মহিমা, ঝরণা আর নদীর কলরোল তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে চলছিল যেন। অনেক নীচে দেখা যাচ্ছিল বিরাট সবুজ যেন দিগ্বলয়ের বিরাট নীলে গিয়ে মিশছে।

তাঁরা কিছুক্ষণ নীরবেই হাঁটলেন। গন্ধরাজ তাঁর অপ্রত্যাশিত মুক্তির কথা ভেবে আর প্রকৃতির অনবদ্য রূপ দেখে আনন্দে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন, মাঝে মাঝে ভাবছিলেন কপিঞ্জলের সঙ্গে দেখা হ'লে তাকে কি বলবেন। কিন্তু যখন উঁচু নীচু অমসৃণ রাস্তাটা শেষ হল, পাহাড়ের আড়ালে শূলপাণি যখন ঢাকা পড়ে' গেল তখন রঞ্জাবতী দাঁড়ালেন।

"এখানে আমার চাকরটা ঘোড়া থেকে নেমে পড়ুক। তুমি ওর ঘোড়াটা নাও। এস দুজনে মিলে উদ্দামগতিতে ঝড়ের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে যাই। মনোমত সঙ্গী পেলে ঘোড়া চড়তে এত ভালো লাগে!"

তাঁর কথা শেষ হ'তে না হ'তে দেখা গেল নীচে ঢালু রাস্তাটার মোড়ে একটা গাড়ি ক্যাঁচ ক্যোঁচ করতে করতে অতিকষ্টে চড়াই ভাঙছে। আর তার সামনে খাতা-হাতে একটি গম্ভীর প্রৌঢ় ভদ্রলোক হাঁটতে হাঁটতে আসছেন।

"এ কি, ভগীরথ শর্মা দেখছি—"

গন্ধরাজ ডাকলেন তাঁকে। ভদ্রলোক খাতাটি পকেটে পুরে ফেলে খানিকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে' চেয়ে রইলেন উপরের দিকে। তারপর ছড়ি নাড়লেন। গন্ধরাজ আর রঞ্জাবতী এগুতে লাগলেন তাঁর দিকে, তিনিও এঁদের কাছে আসবেন বলে' চড়াই ভাঙতে লাগলেন লাঠিতে ভর দিয়ে দিয়ে। তাঁরা যেখানে মিলিত হলেন সে জায়গাটা একটা কোণের মতো। সেখানে একটা ঝরণার ধারা মস্ত একটা পাথরকে ঘিরে ঘিরে নৃত্য করে' ঝাঁপিয়ে পড়েছে পাশের ঝোপে। ভগীরথ শর্মা গন্ধরাজকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করলেন। রঞ্জাবতীর দিকে চেয়ে তিনি মাথাটা একবার নোয়ালেন বটে, কিন্তু তাঁর নাকটা একটু কুঁচকে গেল, আর চোখের দৃষ্টিতে ফুটল একটু বিস্ময়।

রঞ্জাবতীকে সম্বোধন করেই প্রথমে কথা বললেন তিনি।

"আপনি কি খবরটা শোনেন নি তাহলে ?"

"কি খবর ?"

"মস্ত খবর। গর্জনগাঁওয়ে রাষ্ট্রবিপ্লব হয়ে গণতন্ত্র স্থাপিত হয়েছে। রাজপ্রাসাদ ভস্মীভূত, মহারাণী পালিয়েছেন আর কপিঞ্জল আহত—"

"কপিঞ্জল আহত ?"

"খুব। অত্যন্ত যন্ত্রণা পাচ্ছেন। তাঁর আর্তনাদ—"

রঞ্জাবতীর মুখ দিয়ে এমন একটা শপথবাক্য নির্গত হল যে অন্যসময়ে হলে এঁরা চমকে যেতেন তা শুনে। পরমুহূর্তেই তিনি ছুটে গেলেন তাঁর ঘোড়াটার কাছে, একলম্ফে তার পিঠে চড়ে' আর কোন দিকে না চেয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। চাকরটা সবিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইল কয়েকমুহূর্ত, তারপর সেও অনুসরণ করল তাঁর। রঞ্জাবতীর এই ঝঞ্ঝাবৎ অন্তর্ধানের দাপটে ভগীরথ শর্মার গাড়ির ঘোড়াগুলো একটু ভড়কে গেল। রঞ্জাবতী কিন্তু থামলেন না—

খটাখট্ খটাখট্ খটাখট্—তাঁর দ্রুতধাবমান অশ্বের ক্ষুরধ্বনি সচকিত করে' তুলল গিরিপর্বত অরণ্যভূমিকে। তাঁর চাকর বৃথাই তার অশ্বকে বারংবার কশাঘাত করতে লাগল তাঁর নাগাল পাওয়ার জন্য। আর একটু নীচে আর একটি মেয়ে অতিকষ্টে চড়াই ভেঙে উপরে উঠছিল, সহসা রঞ্জাবতীর ঘোড়ার সামনে পড়ে' চীৎকার করে' সরে' গেল সে। আর একটু হলে হয়তো মারা যেত। রঞ্জাবতী কিন্তু সেদিকে ফিরেও চাইলেন না। চড়াই উতরাই ভেঙে, পাহাড় বনজঙ্গল অতিক্রম করে' তিনি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছিলেন ঘোড়ার রাশ ছেড়ে দিয়ে।

"অদ্ভুত মেয়ে! কে বলবে ও একদিন লোকটাকে ভালবাসত—"

গন্ধরাজ তাঁকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছিলেন আবেগভরে।

"আমার স্ত্রী! মহারাণী? তার খবর কি।"

"তিনি আসছেন। ওই বাঁকটার নীচেই আছেন। চড়াই ভাঙছেন। এই একটু আগে আমি তাঁকে ছেড়ে এসেছি।"

পরমুহূর্তেই বিস্মিত ভগীরথ একা দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে কারণ রঞ্জাবতীর মতো গন্ধরাজও ছুটতে ছুটতে চলে' গেলেন নীচের দিকে।

বাইশ

গন্ধরাজ দ্রুতবেগে ছুটছিলেন, তাঁর পা দুটো এগোচ্ছিল সবেগে,—কিন্তু তাঁর হৃদয়, যদিও তা প্রথমটা আরও দ্রুতবেগে এগিয়ে গিয়েছিল, ক্রমশঃ যেন পিছিয়ে পড়তে লাগল। সুরূপিণীর দুর্ভাগ্যে তাঁর বুক ভেঙে যাচ্ছিল, সুরূপিণীকে দেখবার জন্যেও তিনি আকুল হয়ে উঠছিলেন, কিন্তু তবু অতীতের কথা স্মরণ করে', সুরূপিণীর কঠোর অবজ্ঞার কথা ভেবে তিনি যেন মনে জোর পাচ্ছিলেন না। তাঁর আত্মপ্রত্যয় কখনই সুদৃঢ় ছিল না, এখন তা যেন আরও শিথিল হ'তে লাগল। ভগীরথ শর্মার সব কথা যদি তিনি শেষ পর্যন্ত শুনতেন, অন্ততঃ এটুকু যদি শুনতেন যে সুরূপিণী তাঁকে দেখবার জন্যেই শূলপাণির দিকে আসছেন পায়ে হেঁটে, তাহলে হয়তো তাঁর বুক ভরে' উঠত। কিন্তু এখন তাঁর আবার মনে হল হয়তো তিনি তাঁর অবাঞ্ছিত মনোযোগ দিয়ে বিব্রত করে' ফেলবেন তাকে, হয়তো এও তার মনে হবে যে তার দুর্ভাগ্যের সুযোগ নিয়ে তাকে অনুকম্পা করতে এসেছেন তিনি, তার দুর্দশার সময় সেই সোহাগের পসরা নিয়ে এসেছেন যা সে তার মহিমার দিনে পদাঘাত করে' সরিয়ে দিতে ইতস্ততঃ করে নি। তাঁর আহত অহমিকার ক্ষতগুলো জ্বালা করে' উঠল, রাগে তাঁর উদারতার রংও যেন লাল হ'য়ে গেল। তিনি ক্ষমা করবেন নিশ্চয়ই, সাহায্যও করবেন, বাঁচাবার চেষ্টা করবেন, সান্ত্বনাও দেবেন সেই স্ত্রীকে যে তাঁকে ভালবাসে না। সবই তিনি করবেন একটু দূর থেকে, স্ত্রীর ঔদাসীন্যকেও ক্ষমা করবেন তিনি, লোকে অবুঝ শিশুর সরলতাকে যেমন করে। তিনি যখন বাঁকটা ঘুরে সুরূপিণীকে দেখতে পেলেন তখন প্রথমেই তাঁর মনে হল তিনি প্রথমেই তাকে বুঝিয়ে বলবেন যে জোর করে' নিজেকে তার উপর চাপিয়ে দিতে আসেন নি।

হঠাৎ তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। সুরূপিণী ছুটতে লাগল তাঁকে অপ্রত্যাশিতভাবে এখানে দেখে। কিন্তু গন্ধরাজ দাঁড়িয়ে পড়তেই তিনিও দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে উঠে এলেন উপরে। গন্ধরাজের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

"গন্ধ, আমি সব নষ্ট করে' ফেলেছি। সর্বনাশ হয়ে গেছে।"

"সুরূপিণী"—গন্ধরাজের গলার কাছটা ব্যথা করতে লাগল, তিনি আর নড়তে পারলেন না, সুরূপিণীর বিস্রস্ত মলিন বেশবাশ দেখে, তার ক্লান্ত মুখের দিকে চেয়ে হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। সুরূপিণী যদি চুপ করে' থাকতেন তাহলে হয়তো পরমুহূর্তেই আলিঙ্গনবদ্ধ হতেন তাঁরা। কিন্তু সুরূপিণী চুপ করে' রইলেন না। দেখা হ'লে কি বলবেন তা তিনিও ভেবে এসেছিলেন। তিনি কথা ক'য়ে উঠলেন। মিলনের মুহূর্তটি হারিয়ে গেল।

"আর কিছু নেই"—সুরূপিণী বলতে লাগলেন—"সব নষ্ট করে' ফেলেছি। গন্ধ দয়া করে' তুমি আমার কথা শোন—আমি নিজের দোষ ঢাকব না, সব স্বীকর করব। শোন তুমি। আমাকে ওরা কি নিষ্ঠুর পথে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এখন আমি ভেবে দেখছি, ভাববার অনেক সময় পেয়েছি এখন। বুঝতে পারছি আমাকে অন্ধ করে' দিয়েছিল ওরা, চোখে ঠুলি পরিয়ে দিয়েছিল। এখন বুঝতে পারছি সব। ভালোকে ত্যাগ করে' আলোকে ফেলে আমি অন্ধকারে বাস করেছি এতদিন। কিন্তু স্বপ্ন যখন ভেঙে গেল, যখন বুঝতে পারলাম আমি তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, যখন ভাবলাম আমি কপিঞ্জলকে"—একটু সামলে আবার বললেন—"যখন আমি ভাবলাম কপিঞ্জলকে মেরে ফেলেছি, তখন—তুমি যা লিখেছিলে তাই হ'ল। আমার আর কেউ রইল না, আমি একা হয়ে পড়লাম।"

কপিঞ্জলের নাম শুনেই গন্ধরাজের মহানুভবতা উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠল।

"এসব যদি ঘটেই থাকে, তাহলে কার দোষ সেটা? আমার। তুমি আমাকে ভালবাস আর না বাস আমার কি উচিত ছিল না তোমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা? কিন্তু আমি মন গুমরে বরাবর দূরে দূরে কাটিয়েছি, তোমাকে বোঝাবার চেষ্টা না করে' পালিয়ে যাওয়াটাই শ্রেয়ঃ মনে করেছি। ভালবাসার যেটা আসল জিনিস—যুদ্ধ করে' ঝগড়া করে' নিজের দাবি সাব্যস্ত করা—সেটা আমি শিখি নি। আমি কেবল পালিয়ে বেড়িয়েছি। কিন্তু এইবার তো রাজত্বের প্রহসন শেষ হ'য়ে গেল, ভেঙে গেল রঙীন পুতুলটা, হয়তো আমার অক্ষমতার জন্যে, কিংবা তোমার ছেলেমানুষির জন্যে—যে জন্যেই হোক, শেষ হ'য়ে গেছে সব—এখন আমরা দু'জনে পথে দাঁড়িয়েছি—স্ত্রী আর পুরুষ এই এখন আমাদের সত্য পরিচয়। আমি তোমাকে মিনতি করছি সুরূপিণী তুমি আমার দুর্বলতাকে ক্ষমা কর, নির্ভর কর আমার ভালবাসার উপর। আমাকে ভুল বুঝো না"—সুরূপিণী কথা কইতে যাচ্ছিলেন হাত তুলে থামিয়ে দিলেন তিনি তাঁকে—"শোন আগে সবটা। আমার ভালবাসার চেহারা বদলে গেছে। দাম্পত্যের কোনও প্রসাধন আর তার অঙ্গে নেই। এ ভালবাসা এখন আর কিছু প্রত্যাশা করে না, কোনও দাবি করে না, প্রতিদানে কিছু চায় না। এতদিন আমার মধ্যে যা তোমার এতো খারাপ লেগেছে তা আর থাকবে না, সে কথা ভুলে যাও তুমি—আজ তোমাকে যা দিচ্ছি তাতে কোনও খাদ নেই, তা ভাইয়ের ভালবাসা, স্বামীর নয়।"

"গন্ধ, আমি জানি তুমি মহৎ। এও জানি তোমার ভালবাসার আমি উপযুক্ত নই। কিন্তু তুমি যা দিচ্ছ তা আমি নিতে পারব না। তার চেয়ে আমাকে ত্যাগ কর তুমি, আমার কপালে যা হবার তাই হোক। তুমি যাও, আমাকে ছেড়ে চলে' যাও তুমি—"

"না। আগে আমাদের ওই ভীমরুলের চাকের কাছ থেকে পালাতে হবে। ওখানে আমিই তোমাকে নিয়ে গিয়েছিলাম।

তোমাকে আমি ছেড়ে যেতে পারি না, তোমাকে চিরকাল রক্ষা করব এ অঙ্গীকারের কথা আমি ভুলব কি করে'! আমরা গরীব হ'য়ে গেছি ঠিক, কিন্তু মাথা গোঁজবার একটা জায়গা এখনও আমাদের আছে। এখান থেকে কিছুদূরে গর্জনগাঁওয়ের সীমার বাইরে আমার নিজের একটা বাড়ি আছে। চল সেইখানে নিয়ে যাই তোমাকে। মহারাজা গন্ধরাজের পতন হয়েছে, দেখা যাক শিকারী গন্ধরাজ এবার কি করতে পারে। এস। অতীতকে ভুলে যাও, আমার দোষের কথা আর মনে রেখো না। আমাদের নূতন ঘরে নূতন হাসি ফুটিয়ে তোল এবার। তুমি তো কতবার বলেছ মহারাজা আর স্বামী হিসেবে আমি তোমার মনোমত না হলেও মানুষ হিসেবে আমি খুব খারাপ লোক নই। মহারাজা আর স্বামীর রাজত্ব তো শেষ হয়ে গেল। এখন আমি মহারাজাও নই, স্বামীও নই, এবার হয়তো আমাকে তোমার ভাল লাগবে। চল যাই। গর্জনগাঁওয়ের এলাকায় থাকলে ওরা হয়তো আবার আমাদের বন্দী করে' ফেলবে। তার চেয়ে চল নিজের ঘরে চলে' যাই। তুমি হাঁটতে পারবে কি? পারবে? তাহলে চল—"

গন্ধরাজ পথ দেখিয়ে আগে আগে চললেন।

তাঁরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন তার একটু নীচেই একটি পাহাড়ী নদী বইছিল রাস্তার নীচে দিয়ে। রাস্তাটা সেতুর মতো তার উপর দিয়ে চলে' গিয়েছিল। এই কলস্বরা নদীর তীর থেকে একটি ছোট পায়ে-চলা পথ নেমে গিয়েছিল নীচের সবুজ উপত্যকায়। পথটা এবড়ো-খাবড়ো, পাথরে ঢাকা, আর বড্ড বেশী ঢালু, তার উপর কাঁটাগাছে ভরতি। খানিকটা পথ অবশ্য সমতল। চারিদিকে পাহাড়ের গা বেয়ে জল ঝরছিল আর সে জল নদীটিতে এসে পড়ছিল বলে' নদীটি ক্রমশঃ স্ফীতকায়া আর বেগবতী হ'য়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নীচে নেমে একটা বড় জলাশয়ে পড়ছিল অবশেষে। সেখান থেকে বেরিয়েও নানা বিচিত্র গতিতে নানা আশ্চর্য ছবি সৃষ্টি

করতে করতে এগিয়ে চলেছিল সে। পাহাড়ের খানায় খন্দে, পাথরে, কাঁকরে, গহ্বরে গুহায় প্রবেশ করে' লুকোচুরি খেলতে খেলতে চলেছিল যেন। দুই তীরে নানা ভঙ্গীতে নানারকম গাছের শোভা, অসংখ্য ফুলের, অসংখ্য লতার, অসংখ্য পতঙ্গ পক্ষীর বিচিত্র দৃশ্য। এরই মধ্যে দিয়ে তীর্থযাত্রীর মতো তাঁরা নীচে নামছিলেন—আগে গন্ধরাজ, আর তাঁর পিছু পিছু সুরূপিণী। যেখানে রাস্তাটা বেশী ঢালু, সেখানে গন্ধরাজ দাঁড়াচ্ছিলেন সুরূপিণীকে হাত ধরে' আস্তে আস্তে নামিয়ে দেবার জন্য। লক্ষ্য করছিলেন সুরূপিণীর চোখে নূতন আলো জ্বলছে, যে দৃষ্টি দিয়ে তিনি তাঁকে দেখছেন তা যেন আরতির প্রদীপ। তিনি লক্ষ্য করছিলেন কিন্তু সাহস করে' তার মর্মটা উপলব্ধি করতে পারছিলেন না। মনে মনে বলছিলেন —"ও তো আমাকে ভালবাসে না। এটা হয়তো দুঃখের পরে কৃতজ্ঞতা। আমি যদি ভদ্রলোক হই, সাধারণ মনুষ্যত্ব যদি আমার থাকে তাহলে এ অবস্থায় অন্য কোন চিন্তাই আমার করা উচিত নয়।"

আরও কিছুদূর নেমে দেখা গেল নদীটি আরও বড় হয়েছে, কিন্তু তার গতিকে রোধ করেছে একটি বাঁধ। নদীর স্রোতকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলা হয়েছে একটা কাঠের তৈরী খালে। সেই খালের ভিতর দিয়েই মহানন্দে বয়ে' চলেছে নদী, সেই খালের দুপাশও সবুজ হ'য়ে উঠেছে তার স্নিগ্ধ স্পর্শে। এই খালের ধার দিয়ে দিয়ে পথটিও চলছিল ঝোপঝাড়ের পাশে পাশে। একটু পরেই বাদামী রঙের জল-চালিত কলটি দেখা গেল। তারপরই কলের বড় বড় চাকা আর চাকাকে কেন্দ্র করে' মথিত জলরাশির অপূর্ব দৃশ্য। চারিদিকে হীরে ছিটকে পড়ছে যেন। এখানে উপত্যকাটি সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। এরপরেই কাঠ চেরার শব্দ পাওয়া গেল। মনে হল করাতরা বুঝি গান গাইছে।

পায়ের শব্দ শুনে কলের মালিক কপাট খুলে বেরিয়ে এলেন।

তিনি এবং গন্ধরাজ দু'জনেই চমকে উঠলেন। টকটকে লাল মুখ, পুরু ঠোঁট লোকটার।

"নমস্কার"—গন্ধরাজ বললেন—"আপনার কথাই ঠিক, আমারই ভুল হয়েছিল। আপনাকে আমিই খবরটা দিচ্ছি, আপনি পার্বতীতে চলে' যান। আমি সিংহাসনচ্যুত হয়েছি—মহা হইচই হয়েছে এ নিয়ে—আপনার বন্ধুরাই এখন রাজত্ব করছেন সেখানে।"

আশ্চর্য হয়ে গেল কলের মালিক।

"আর মহারাজ আপনি—"

"মহারাজ এখন পালাচ্ছেন ভৈরঙ্গীর দিকে—"

"গর্জনগাঁও ছেড়ে? আপনি কি আপনার পিতার পুত্র নন? না, এ হ'তে পারে না।"

"আপনি কি তাহ'লে বন্দী করতে চান আমাদের?"

"আপনাকে বন্দী করব? আমি? আপনি আমাকে কি মনে করেন! গর্জনগাঁওয়ের একটি লোকও আপনার কেশাগ্র স্পর্শ করবে না। আপনাকে ভালবাসে না এমন লোক কেউ নেই।"

"অনেক আছে, অনেক আছে"—গন্ধরাজ হাসলেন—"আমি যখন মহারাজা ছিলাম তখন আপনি আমার মুখের উপর অনেক কড়া কড়া কথা শুনিয়েছিলেন। এখন চাকা ঘুরে গেছে, এখন আমার দুঃখের দিনে হয়তো আপনার কাছ থেকেই সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে আমাকে—"

কলের মলিকের মুখ আরও লাল হ'য়ে উঠল।

"আপনি যা খুশি বলতে পারেন! আপনারা দুজন আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিলে আমি কৃতার্থ হব। আসুন—"

"না, সময় নেই আমাদের। তবে আপনি আমাদের যদি এখানে একপাত্র করে' যাহোক কিছু খাওয়াতে পারেন তাহলে উপকৃত হব, খুশীও হব—"

আরও লাল হয়ে গেলেন ভদ্রলোক। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে

—একটা কলসীতে কিছু সুরা আর তিনটি স্ফটিকের পাত্র নিয়ে এলেন। পাত্রে মদ ঢালতে ঢালতে বললেন—"মহারাজ যেন মনে করবেন না, আমি রোজ মদ খাই। আপনার সঙ্গে সেবার যেদিন হঠাৎ দেখা হ'য়ে গিয়েছিল সেদিন অবশ্য মাত্রা একটু বেশী হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সাধারণতঃ আমি বেশী খাই না, বিশ্বাস করুন এটা। আপনাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবার জন্যেই এখন খাচ্ছি একটু—"

পাহাড়ী ভব্যতার রীতি অনুযায়ী সসম্ভ্রমে মদের পাত্রে চুমুক দিলেন তাঁরা। গন্ধরাজ আর থাকতে চাইলেন না। উপত্যকার ঢালু রাস্তা বেয়ে আবার নামতে শুরু করলেন তাঁরা। সংকীর্ণ উপত্যকা বিস্তৃত হ'ল ক্রমশঃ, দীর্ঘ তরুশ্রেণী আবার দেখা দিল।

"ভদ্রলোকের সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করেছিলাম আমি"—গন্ধরাজ বললেন—"ওঁর সঙ্গে কিছুদিন আগে যখন দেখা হয়েছিল তখন একটু অপমানই করেছিলাম ওঁকে। দোষটা আমারই ছিল হয়তো! কিন্তু মনে হচ্ছে নিজেকে নত করে' শেষ পর্যন্ত কোনও লাভ হয় কি ?"

সুরূপিণী উত্তর দিলেন—"কিন্তু সে শিক্ষাটা প্রয়োজন।"

"তা বটে তা বটে"—গন্ধরাজ একটু বিব্রত বোধ করলেন—"তা বটে। কিন্তু এখন আমাদের নিরাপদ হওয়া প্রয়োজন। ওই কলের মালিকটি ভদ্রলোক, কিন্তু ওঁর উপর ঠিক বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছি না, উনি গণতন্ত্রের পাণ্ডা একজন। এই নদীর ধার দিয়ে দিয়ে যদি আমরা আরও এগিয়ে যাই—নদীটা অবশ্য অনেক এঁকেবেঁকে গেছে—কিন্তু এর ধার দিয়ে দিয়ে গেলেই আমরা স্বস্থানে পৌঁছে যাব। এই উপত্যকার উপরের দিকে একটা লম্বালম্বি খালের মতো আছে। সেটা পার হলেই, বাস্—নিথর নির্জনতা। হরিণরা পর্যন্ত সেখানে যেতে ভয় পায়। তোমার ক্লান্ত লাগছে না তো, অতদূর যেতে পারবে এখন ?"

"পথটা দেখাও, আমি ঠিক পারব।"

কথাটি শুনে অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন গন্ধরাজ।

"না। আমি বলছিলাম পথটা বড্ড উঁচুনীচু, ওই ছোট ছোট উপত্যকার ভিতর দিয়ে দিয়ে। মাঝে মাঝে গর্তও আছে, গর্তের ভিতর কাঁটার জঙ্গল—"

"চল না তুমি। তুমি শিকারী না?"

ঝোপঝাড় পেরিয়ে আবার হাঁটতে লাগলেন তাঁরা। একটু পরেই একটি সবুজ নির্জন মাঠের মতো জায়গায় এসে পড়লেন। চমৎকার জায়গাটি। লম্বা লম্বা গাছ দিয়ে ঘেরা। গন্ধরাজ দাঁড়িয়ে পড়লেন, দেখতে লাগলেন চারিদিক চেয়ে চেয়ে, আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠল মনটা। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন সুরূপিণীও দাঁড়িয়ে পড়েছেন। তিনিও চেয়ে দেখছেন গন্ধরাজের দিকে। আরণ্য পটভূমিকায় কি যে চমৎকার দেখাচ্ছে, কি যে রহস্যময় ভাষা ফুটেছে চোখ দুটিতে। মানসিক এবং দৈহিক দুর্বলতায় সর্বাঙ্গ যেন অবশ হ'য়ে এল গন্ধরাজের, মনে হল এইখানেই হাত পা ছড়িয়ে বসলে কেমন হয়। নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন তিনি সুরূপিণীর দিকে।

"এস, এখানে একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক"—একটা ছোট্ট টিপির পাশে সুরূপিণীর হাত ধরে' জোর করে' বসিয়ে দিলেন। নিজেও বসলেন।

সুরূপিণীর চোখের দৃষ্টি আনত হ'ল, তিনি ঘাড় ফিরিয়ে ঘাস ছিঁড়তে লাগলেন, উৎকর্ণ হয়ে রইলেন প্রেমের ডাক এইবার আসবে কি? বনে ছুটোছুটি করে' বেড়াচ্ছিল বাতাস মাতালের মতো, কখনও কাছে আসছিল, কখনও দূরে সরে' যাচ্ছিল। কাছের একটা ঝোপ থেকে ভেসে এল একটা সচকিত পাখির ত্রস্ত ডাক। কি যেন একটা হবে, তারই প্রস্তুতি যেন চারিদিকে। গন্ধরাজের মনে হল তিনি এবার কি বলবেন তাই শোনবার জন্যে

সমস্ত প্রকৃতি যেন অপেক্ষা করছে। কিন্তু তবু আত্মসম্মান যেন তাঁর মুখ চেপে রইল। যতই তিনি সুরূপিণীকে—ছিন্নলতার মতো বিস্রস্তা বিবর্ণা ওই মেয়েটিকে দেখতে লাগলেন—ততই যেন তাঁর পক্ষে কথা বলা ক্রমশঃ শক্ত হ'য়ে উঠতে লাগল। তাঁর আত্মসম্মান, তাঁর অহঙ্কারের সঙ্গে মনের নেপথ্যে নীরবে লড়তে লাগল ওই অসহায় মেয়েটাই!

"সুরূপিণী—"অবশেষে কথা ফুটল গন্ধরাজের মুখে। একটু ইতস্ততঃ করে' ঢোঁক গিলে বললেন—"সুরূপিণী, আমি তোমাকে" —বলতে যাচ্ছিলেন, 'কখনও সন্দেহ করি নি'। কিন্তু সেটা কি সত্যি কথা? আর সত্যি হ'লেও সেটা কি এখন বলা উচিত? আবার নীরব হ'য়ে গেলেন।

"বল, কি বলছিলে। থেমে গেলে কেন।"

"বলছিলাম, আমি সব বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি তোমার কোনও দোষ নেই। বুঝতে পেরেছি আমার মতো দুর্বল লোকের প্রতি তোমার মতো সবলার আচরণ এই রকম হওয়াই স্বাভাবিক। কোন কোন ব্যাপারে তোমার হয়তো ভুল হয়েছিল, কিন্তু কেন হয়েছিল, তা-ও আমি বুঝতে চেষ্টা করেছি। বুঝেওছি। আমার আর ক্ষমা করবার কিছু নেই, আমি সব বুঝতে পেরেছি।"

"আমি জানি আমি কি করেছি"—সুরূপিণী উত্তর দিলেন— "আমি এত নির্বোধ নই যে কথায় আমি ভুলে যাব। আমি কি করেছি, কি ছিলাম তা আমি স্পষ্ট জানি। তোমার রাগের উপযুক্ত আমি নই, ক্ষমার তো নইই। এই পতন আর দুর্দশার অন্ধকারে আমি কেবল আমাকে দেখতে পাচ্ছি আর তোমাকে। তুমি চিরকাল যেমন ছিলে সেই তোমাকে, আর আমি যেমন ছিলাম সেই আমাকে। আমি আমাকেই দেখছি কেবল, আর কিছু ভাবতে পারছি না।"

"তাহলে এস আমাদের ভূমিকা বদলে ফেলি"—গন্ধরাজ

বললেন—"অপরকে যখন আমরা ক্ষমা করতে পারি না তখন আসলে আমরা নিজেদেরই ক্ষমা করতে পারি না—কাল রাত্রে একজন বন্ধু বলেছিলেন আমাকে। তাঁর কথা শুনে আমি নিজেকেও ক্ষমা করেছি আমার শতদোষ থাকা সত্ত্বেও। কিন্তু তুমি কি আমাকে ক্ষমা করবে না? তুমি নিজেকেও ক্ষমা কর, আমাকেও।"

সুরূপিণী কোন উত্তর দিলেন না, হাতটা বাড়িয়ে দিলেন কেবল।

গন্ধরাজের মুঠোর মধ্যে ভীরু আঙুলগুলো কাঁপতে লাগল। অদৃশ্য স্রোতে অনুভূতির ভাষাহীন আকুতি মূর্ত হয়ে উঠল দুজনের মধ্যে।

"সুরূপিণী, অতীতকে ভুলে যাও একেবারে। আমি তোমাকে এখন সেবা করি, সাহায্য করি। মীরা বলেছিলেন তাঁর প্রিয়তমকে—মঁয় নে চাকর রাখো জি। তুমিও আমাকে তোমার চাকর করে রাখ। তোমার কাছে থেকে তোমাকে সেবা করতে পেলেই আমি কৃতার্থ হ'য়ে যাব। আমাকে তাড়িয়ে দিও না। তোমার ভালবাসা আমি নাই বা পেলাম, আমার একার ভালবাসাই যথেষ্ট—"

"গন্ধ......"

সুরূপিণী আর কিছু বলতে পারলেন না। গন্ধরাজ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন—আনন্দে, ভালবাসায়, বেদনায় তা যেন বিগলিত হয়ে যাচ্ছে। তাঁর সর্বাঙ্গ, বিশেষ করে' চোখের দৃষ্টিতে যে মহিমা ফুটে উঠেছে তা প্রেমের মহিমা।

"সুরূপিণী"—হঠাৎ জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন গন্ধরাজ। তার পর অন্যস্বরে বললেন—"সুরূপিণী? সুরু—"

"চারিদিকে চেয়ে দেখ, প্রতিটি গাছে নতুন পাতা বেরিয়েছে, নতুন ফুল ফুটেছে। এইখানেই আমাদের দেখা হ'ল, প্রথম দেখা হ'ল, সব ভুলে গিয়ে নতুন জগতে জন্মালাম আমরা। পাপের

আবর্জনা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম বিস্মৃতির গহ্বরে, ভগবানের পদপ্রান্তে—"

"তাই হোক সুরূপিণী। দুঃস্বপ্নের মতো মিলিয়ে যাক বিগত জীবনটা। আবার নতুন করে' শুরু করি, অচেনার মতো। আমি এতকাল স্বপ্ন দেখেছি—দীর্ঘ একটা স্বপ্ন, যেন আমি এক রূপসী নিষ্ঠুরা মেয়েকে পূজো করছি, সে সব বিষয়ে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু বরফের মতো কঠিন আর ঠাণ্ডা সে। তারপরও আমি স্বপ্ন দেখেছি, তারপরও ভেবেছি—বরফ গলছে, সে বদলাচ্ছে, অরুণ কিরণ এসে পড়েছে তার উপর, সে তার উজ্জ্বল দৃষ্টি যেন আমার দিকে ফিরিয়েছে। কিন্তু আমি তো অযোগ্য—ভালবাসা ছাড়া আর তো আমার কিছু নেই—সাষ্টাঙ্গপ্রণত প্রেমই আমার একমাত্র সম্বল—তাই আমি ভয়ে নড়ি নি, পাছে স্বপ্নটা ভেঙে যায়—"

"আমার আরও কাছে ঘেঁষে এস—"

সুরূপিণীর কণ্ঠস্বরে কাঁপন লাগল, বীণার মূর্ছনার মতো শোনাল তা। বনভূমিতে বসন্তের সমারোহ শুরু হ'য়েছে।

পার্বতীতেও ঠিক সেই সময় নতুন গণতন্ত্রের প্রথম বৈঠক বসল।*

শেষ

* আর এল. ষ্টিভেন্‌সন্‌ প্রণীত 'প্রিন্স অটো' নামক উপন্যাসের ভাবানুবাদ